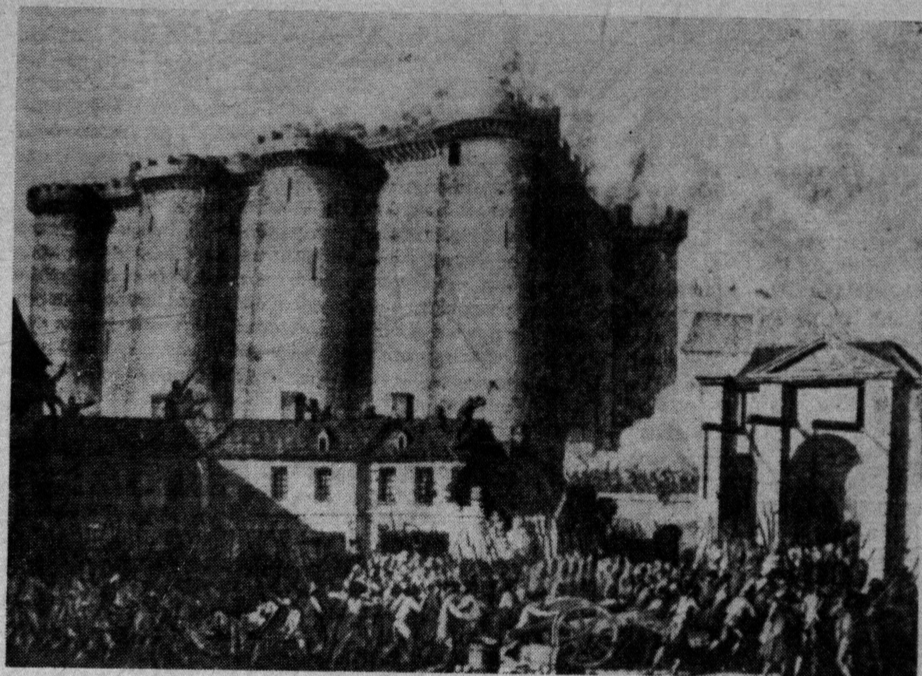
আন্দামান

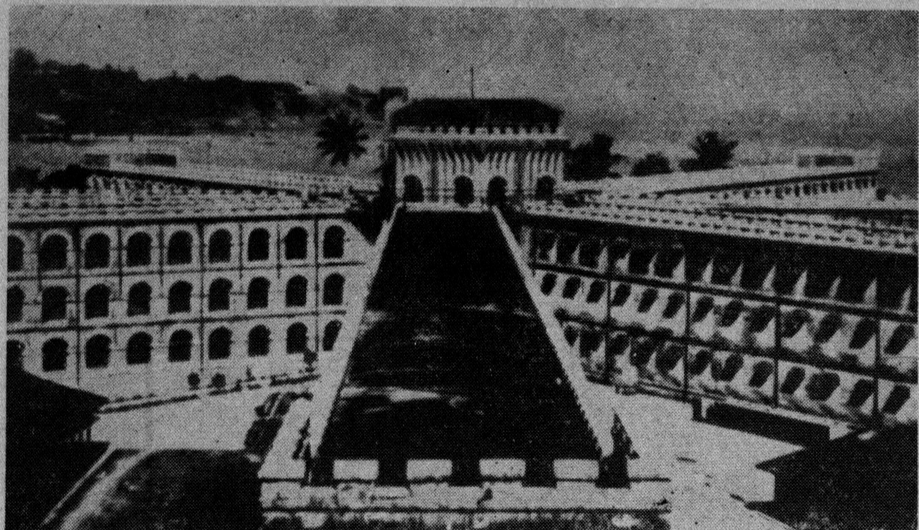
ব্রিটিশ-ভারতের বাস্তিল



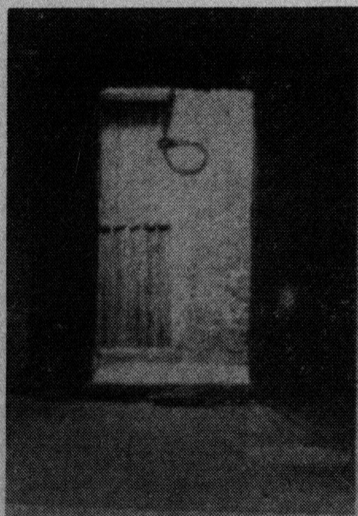
বাস্তিল দুর্গ

দ্র. পৃ ১৩২

"Taking the Bastille, July 14, 1789."
An engraving after a painting by
Prieure in the Louvre Museum, Paris.



আন্দামান সেলুলার জেল



ফাঁসির ঘর



বেত্রাঘাতের টিকটিকি

আন্দামান

ব্রিটিশ-ভারতের বাস্তিল

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

অনিলচন্দ্র নাগ

পরিবেশক

প্যাপিরাস ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

ANDAMAN : BRITISH-BHARATER BASTIL

By BISWANATH CHAKRABORTY

ANILCHANDRA NAG

প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৫৭

প্রচ্ছদ : শ্রীদেবব্রত ঘোষ

প্রকাশক : শ্রীশ্যামল দাস

৮ লেক ওয়েস্ট রোড । সন্তোষপুর । কলিকাতা ৭৫

মুদ্রক : শ্রীঅরিজিৎ কুমার

টেকনোপ্রিন্ট । ৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন । কলিকাতা ৬

চিত্র ও মলাট : ব্লক ও মুদ্রণ :

শ্রীবিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় । রাজা [illegible] । কলিকাতা ১২

উৎসর্গ

জানা, অজানা

আন্দামান-বন্দীগণের

উদ্দেশে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

"ফাঁসির মঞ্চে ঝুলাও তাদের পাঠাও নির্বাসনে,
হোক লাঞ্ছিত, আসন পাতে যে তারা মানবের মনে।
যায় তারা শুধু রেখা-পাত করি বটে,
কাল তা শোভিত করে মর্মর-মঠে,
নিঃস্ব তাহারা, ধনী হয়ে ওঠে বিশ্ব তাদেরি ধনে॥"

—কুমুদরঞ্জন মল্লিক

বিষয়সূচি

চিত্রসূচি

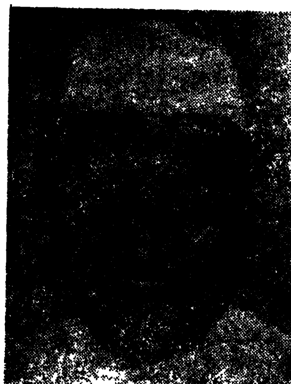
চিত্রপরিচয় : বাস্তিল

BASTILLE, a former fortress on the east side of Paris which became first a French state prison and then a place of detention for important persons charged with miscellaneous offenses. The storming of it by an armed mob of Parisians on July 14, 1789, owes its significance in the ideology of the French Revolution to the fact that the Bastille had become a symbol of despotism in the minds of those whom government policy had kept in ignorance of its real function....

On July 16, the assembly of electors of Paris decided that the Bastille was to be razed to the ground. The task was entrusted to a master mason, "Patriot" P. F. PALLOY, who had the idea of carving miniature Bastilles out of the stones and sending them to the municipalities. Demolition was expensive and was still incomplete in 1792. In 1840 a column was erected to the memory of the victims of the July revolution of 1830.

—*Encyclopaedia Britannica,* Vol 3, 1964, p. 260

শুভেচ্ছা-পত্র



H. No : 23, Sector : 3/A.
Chandigarh—160001.
11.3.87.

My Dear Sri Bishwanath Chakarvorty,

Received yours of 2nd March.

The task that you have taken in hand is to be appreciated by all revolutioneries.

You have enumerated the historical facts of revolutionary movements that will give full justice to the movements and the actors who have played the parts. Herein I am inducing certain suggestions. Hope you shall appreciate. Please try to find the books that you should go through to make the book more valuable ;

1. Revolutionary Movement of 1857 written by Vir Damodar Savarkar.
2. My Life History by Vir Damodar Savarkar.—the books is available in English, Marathi & Hindi.
3. Kala-Pani Katha by Virindra [Barindra] Kumar Ghosh.
4. Confession of a revolutionary—Maharaj Triloki [Trailokya] Nath Chakarvarty

5. My Life History—by Bhai Parmananda.
6. Indian Bastile—by Sinha.
7. History of Gadar Party—by Sohan Singh Josh.
8. Kuka Movement—Guru Ram Singh—by Sohan Singh Josh.
9. Yash-Ke-Draohar—by Dr. Bhagwan Dass Mahaore.
10. Jog-Se-Jog Jala—by Sukhdev.
11. Penal Settlement—Govt. Publication by Mazumdar.

In the Penal Settlement Govt. Publication two glaring unpleasant facts are highlighted—Confession by Vir Damodar Savarkar—confession by Virindra [Barindra] Kumar Ghosh. Both the facts are very damaging for revolutionery movements but they are facts. May be highlighted.

12. Samritan by Shiv Verma.
13. Kranti-Kathaion—by Krishav Saral.—is a very big volume. 1800 Photos are presented in this book. If possible photos of prominent persons be included in the book.

After the hanging of three great National Heroes—Bhagat Singh, Sukhdev, and Raj Guru—many writers of repute have written many books giving all the details of heroic deeds of the Heroes.

Between 1907 & 1947 so many ardent revolutionaries have played their parts and many writers of the day have fully depicted their life account. Many writers of great repute have done the job.

It is a sad thing that after 1947 no patriot of the name has committed revolutionary action. We can not deny the fact that in free India our National Govt. have taken up drastic action to suppress the feelings of the people but no body has ventured to challenge the atrocious regime. The readers and supporters of the National Govt. have written Volumes & Volumes glorifying the national Govt.

Sri Bishwanath Chakravorty
C/o. Anil Chandra Nag
1/10, Naktala, Calcutta-700 047

(Baba Prithvi Singh Azad)

প্রাক্‌কথন

আমাদের জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের কাহিনী এ গ্রন্থে এক অভিনব এবং অসামান্য দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে। একটি বিশেষ ভূখণ্ড কারও কাছে নেহাতই মানচিত্রের একটি অংশ, কারও কাছে বা সে ভূখণ্ড ভৌগোলিক-রাষ্ট্রনৈতিক কৌতূহল জাগায়, অনেকের কাছে সে ভূখণ্ড হয়তো এক তীর্থস্বরূপ এবং তার বেশি কিছু নয়। এ গ্রন্থে গ্রন্থকার দুজন আন্দামানকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে আমাদের বিপ্লবী আন্দোলনের এক আনুপূর্বিক ইতিহাস রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। বঙ্গোপ-সাগরের এক প্রান্তে অবস্থিত এই দ্বীপটি ১৮৫৭ সালের মহা জাগরণ থেকে শুরু করে ১৯৪৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর অর্থাৎ যেদিন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ওই দ্বীপে জাতীয় ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করেছিলেন—সেই দীর্ঘ কালের জাতীয় আন্দোলনের নানা ঐতিহাসিক এবং নাটকীয় ঘটনার সাক্ষী।

গ্রন্থকারদ্বয় বহু যত্নে বহু তথ্য সংকলন করেছেন—প্রায় নব্বই বছরের মধ্যে ভারত উপমহাদেশ-আলোড়নকারী নানা বিদ্রোহ এবং অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত বহু বন্দী এবং শহীদের নাম এখানে সংকলিত হয়েছে। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিদ্রোহ আর অভ্যুত্থানগুলি ছিল ঔপনিবেশিক অধীনতা-পাশবদ্ধ এক প্রাচীন জাতির পুনর্জাগরণজাত বিস্ফোরণের মতো। এ-সব বিস্ফোরণ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে, এমন-কি ভারতের সীমানার বাইরেও ঘটেছে। তার প্রতিস্পন্দন সমগ্র ভারতীয় ভূখণ্ডকে সচকিত করেছে, আবার তা আন্দামান, বিশেষ করে তার কুখ্যাত সেলুলার বন্দীশিবিরকে ছুঁয়েছে। সেখানে বিপ্লবী বন্দীরা নির্মম নির্যাতন এবং মৃত্যুবরণের পথে স্বাধীনতার মূল্য দিতে বাধ্য হয়েছেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে আন্দামান সেলুলার জেলের যন্ত্রণাবিদ্ধ কণ্ঠস্বর ভারতবর্ষের মূলে ভূখণ্ডে পৌঁছতে কিছু সময় লেগেছিল।

আমার স্পষ্ট মনে পড়ে ১৯৩৭ সালে আন্দামানের বিপ্লবী বন্দীরা কেমন করে, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা সেখানে যে অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন সে

সম্পর্কে, ভারতবর্ষের মানুষের চেতনা জাগানোর জন্য অনশন ধর্মঘট শুরু করেছিলেন। কীভাবে কলকাতার ছাত্রসমাজ সেদিন হাজারে হাজারে পথ নেমে পড়েছিলেন, আন্দামান থেকে বীর দেশপ্রেমিকদের মূল ভূখণ্ডে ফিরিয়ে আনার জন্য এক ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন, সে কথা আমার স্মৃতিতে আজও উজ্জ্বল। আমি স্পষ্ট মনে করতে পারি ১৯৩৭ সালের এক ঐতিহাসিক বিকালে কলকাতার টাউন হলে আমার পূজনীয় পিতৃদেব শরৎচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে এক বিশাল প্রতিবাদ-সভায় শামিল হবার জন্য আমরা যখন হাজারে হাজারে পায়ে পা মিলিয়ে এগোচ্ছিলাম তখন কী নির্মম লাঠিচার্জ হয়েছিল আমাদের উপর।

ভারতের বিপ্লব এখনও শেষ হয়নি। একে যথার্থ পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেই বিপ্লবী ঐতিহ্যকে জাগিয়ে তুলতে হবে, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এই পথে আন্দামান হবে আমাদের আলোর দিশারী। আমাদের বুঝতে হবে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কেন দিল্লীর লালকেল্লার প্রতীক তুলে ধরেছিলেন, কেন ঝাঁসির রানীর নামে বাহিনী সৃষ্টি করেছিলেন। জাতীয় বিপ্লবের স্বার্থে প্রাচীন বীর এবং বীরত্বগাথাকে তিনি আমাদের স্মৃতির সামনে তুলে ধরেছিলেন। আমাদের বিপ্লবী ঐতিহ্যকে পুনর্জাগ্রত করতে, যে-সব অপচেষ্টা আমাদের ঐতিহাসিক ধারাকে বিকৃত বা বিপথচারী করতে চায় তার বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে এ-সব অশুভ শক্তির সঙ্গে আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্যের কোনো যোগ নেই।

আমি আশা করব, যে-মহান উদ্দেশ্য নিয়ে এ গ্রন্থ রচিত হয়েছে তা সার্থক হবে। আজকের জাতীয় জীবনের এই সংকটের মুহূর্তে, যখন 'রাজপুত্র আর জমিদাররা' বেড়ে উঠছে আর 'মানুষ ধ্বংসের মুখে' নেমে যাচ্ছে, তখন গ্রন্থ রচনার সাহস যাঁরা দেখিয়েছেন তাঁরা দেশবাসীর অকুণ্ঠ সাধুবাদ অর্জন করবেন, আমার সন্দেহ নেই। জয় হিন্দ্।

শিশিরকুমার বসু

বসুন্ধরা
৯০, শরৎ বসু রোড
কলিকাতা ৭০০ ০২৬

"রাজবন্দীর জবানবন্দী"

পুস্তক প্রকাশের সঙ্গে লেখকের কৈফিয়ৎ পর্বও একটি প্রথা। বিদ্রোহী কবির উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করতে চাই— ১৯২৩ সালের ৭ জানুয়ারি রবিবারের দুপুরে প্রেসিডেন্সি জেলে রাজদ্রোহে অপরাধী বন্দী কবির জবানবন্দী— 'রাজার পেছনে— ক্ষুদ্র, আমার পেছনে রুদ্র।··· আমি কবি, আমি অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিতে মূর্তি দানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত।··· সত্য স্বয়ং প্রকাশ। তাহাকে কোন রক্ত আঁখি রাজদণ্ড নিরোধ করতে পারে না। আমি চিরন্তন স্বয়ং প্রকাশের বীণা, যে বীণায় চিরন্তন সত্যের বাণী ধ্বনিত হয়েছিল।···" মূলত এই হল আমাদের প্রস্তাবনাকারে নিবেদন। বিস্মৃত, অবহেলিত তথা ইতিহাসকে বিকৃত করার যে নিরলস প্রচেষ্টা চলেছে তার স্বরূপ ছিন্ন ভিন্ন করে সত্য উদ্ঘাটনই আমাদের লক্ষ্য।

আন্দামান সম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সে-সব স্মৃতিকথা পাঠে স্তম্ভিত হতে হয়। নির্বাসিত বিপ্লবী রাজবন্দীদের প্রতি 'white mens burden' অপসারণের জন্য ব্রিটিশরাজের পরিকল্পিত অত্যাচারের কাহিনী, কী অবর্ণনীয় ক্লেশ, দুর্দশা, দৈহিক নির্যাতন, মানসিক পীড়ন, তিলে তিলে আত্মাহুতি দেওয়ার বজ্রকঠিন সংকল্প আন্দামান দণ্ডোপনিবেশে নির্বাসিত বন্দীদের দেশকে ভালোবাসার অপরাধে সহ্য করতে হয়েছিল। আমাদের সৌভাগ্য হয়েছিল ভারতে ইংরেজের তৈরি 'জেলখানা-কারাগার'-এ বাস করার নাতিদীর্ঘ অভিজ্ঞতা। তাই আমাদের নিবেদনকে আখ্যায়িত করেছি "রাজবন্দীর জবানবন্দী" রূপে। নির্বাসিতদের প্রতি দরদে, মমতায় সমবেদনায় মন আপ্লুত হয়ে যায়। হৃদয়মথিত বিষাদে নিজেদের সত্তা বিলুপ্ত হয়ে তাঁদের সঙ্গে একাত্ম হয়। যন্ত্রণায় চিৎকার করে 'প্রশ্ন' তুলতে ইচ্ছে করে 'তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ'।

তাই এই গ্রন্থ কেবলমাত্র সন-তারিখের তালিকায় কণ্টকিত করা হয় নি। যাঁরা জীবনের সর্বস্ব পণ করে ফকির হওয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়ে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মুক্ত

করার জন্য আত্মোৎসর্গ করলেন— যাঁদের রবীন্দ্রনাথ বললেন— 'full blown flowers', তাঁদের প্রতি আমাদের অসীম শ্রদ্ধা, মর্মবেদনা ও একাত্মবোধই এই পুস্তক রচনার প্রেরণা। এ পর্যন্ত যে-সব পুস্তকাদি প্রকাশিত হয়েছে তা মূলত বিশেষ সময়ের বিশেষ ব্যক্তির অভিজ্ঞতালব্ধ স্মৃতিচারণ। ধারাবাহিকতা-বর্জিত এক-একটি অধ্যায়, এ সম্বন্ধে বিবিধ পুস্তকাদি পাঠে লক্ষ্য করা যায় যে আন্দামান দণ্ডোপনিবেশের কাহিনী একান্তভাবেই ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবের এক উজ্জ্বল ও প্রেরণাদায়ক ধারাবাহিক কাহিনী। সুগ্রথিত করে যদি দেশবাসীর কাছে পরিবেশন করা যায় তা হলে তার মধ্যে ইতিহাস কথা বলে উঠবে।

ইতিহাস শব্দের অর্থ হল— ইহা নিশ্চয়ই ঘটেছিল। সেই নিশ্চিত ঘটনার বিকৃতি ঘটিয়ে ক্ষমতাসীনরা চিরকালই মসীলিপ্ত করেছে। এ যেন এক আদিম অপ্রতিরোধ্য বাসনা। তাই বোধ করি নেপোলিয়নের যখন ইতিহাস পাঠের ইচ্ছা হত তখন পার্শ্বচরকে আদেশ দিতেন— 'Bring me my liar'— রবীন্দ্রনাথও অনুরূপভাবেই সেই ইতিহাসকে আবার ক্ষেত্রবিশেষ আখ্যায়িত করছেন— 'ওগো

সেই প্রচেষ্টা আজও অব্যাহত। কারণ প্রচারের যতগুলি মাধ্যম আছে তাতে অনবরত প্রচার চলেছে অহিংস আন্দোলনের ফলেই নাকি খণ্ডিত ভারত-বর্ষের স্বাধীনতা এসেছে।. 'মিথ্যাময়ী' ইতিকথনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য তথ্যের উপর নজর দিয়ে নিষ্ঠা সহকারে অগ্রসর হতে হয়েছে। তত্ত্বের দিকে ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন বোধ করা হয় নি। তথ্য যদি হারিয়ে যায় তত্ত্ব অলীক হয়ে দাঁড়ায় —'রচিতে পারে না কভু শাশ্বত অধ্যায়'। সেই হেতু মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করে সাধ্যমত যেখান থেকে যা তথ্য সংগ্রহ করা গেছে পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে দেশ-বাসীর কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ (যুদ্ধ) ভারতের স্বাধীনতার প্রথম সশস্ত্র বিপ্লব— এ তথ্য ইতিহাস-স্বীকৃত। তার পর প্রায় একশত বৎসর ব্যাপী আঘাতের পর আঘাত করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্‌কে নড়বড়ে করে দেওয়ার নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস— এবং প্রত্যেকটি বিপ্লব বা বিদ্রোহের অবসানে সেই বিপ্লবের নায়ক অথবা বন্দী অন্যান্য বিপ্লবীদের স্থান সেই আন্দামান দণ্ডোপনিবেশে। পরিণাম নরকযন্ত্রণা ভোগ। তার পারম্পর্য রক্ষা করে সেই-সব বিস্মৃত প্রায় কাহিনী এই পুস্তকে বিধৃত হয়েছে। আন্দামানের ইতিহাস ও ভৌগোলিক পরিবেশ থেকে

আরম্ভ করে স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের আন্দোলন-জনিত সংক্ষিপ্তাকার বিবরণ— পরিণতি ও আন্দামান সেলুলার জেলে বন্দীদের নাম যতদূর সম্ভব সংগৃহীত, প্রসঙ্গত সংঘবদ্ধাকারে দেওয়া হয়েছে। কারণ এঁদের যেন আমরা ভুলে না যাই। তাঁদের নাম যেন ঘরে ঘরে অক্ষয় হয়ে থাকে।

যদিও সশস্ত্র আন্দোলনের ধারাবাহিকতায়— সাঁওতাল বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, নীলকর বিদ্রোহ, কুকা বিদ্রোহ প্রভৃতি বিপুল ও ব্যাপক গণ-আন্দোলন এই শতবর্ষব্যাপী আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু গ্রন্থের প্রাসঙ্গিকতাবর্জিত বলেই সে-সব সযত্নে পরিহার করা হয়েছে।

ব্রিটিশ শাসনের দমননীতির ফলে জাতি যে মৃতকল্প হয়ে পড়েছিল, তাকে একটা শক্ত নাড়া দেওয়ার প্রয়োজন প্রকট হয়েছিল, যে জাগরণের প্রচেষ্টার ফল বিস্ফোরণ; বিস্ফোরণের প্রেক্ষাপটে সেই-সব অধ্যায় অবশ্যম্ভাবী রূপে এসে পড়ে এবং যা ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে একান্তভাবেই সম্পৃক্ত। এই বিবেচনায় বর্তমান গ্রন্থে কারো কারো কাছে অপ্রাসঙ্গিক হলেও কয়েকজন প্রখ্যাত বিপ্লবীর ক্রিয়াকাণ্ড সন্নিবেশিত হয়েছে।

আন্দামানকে কেন্দ্র করে সশস্ত্র সংগ্রামের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনায় আন্দামানে নির্বাসিত বিপ্লবী বন্দীদের সম্ভাব্য কিছু কিছু জীবনী সংযোজন করা যেত, সেটাও কম আকর্ষণীয় হত না, কারণ ইংরেজীতে একটি প্রবচন আছে— 'one anecdote of a man is worth a volume of biography' কিন্তু পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি এবং তজ্জনিত ব্যয় ও পরিশ্রম বর্তমানে আমাদের সাধ্যাতীত।

প্রথমেই আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রবীণ বিপ্লবী বাবা পৃথ্বি সিং আজাদকে। আমাদের উৎসাহিত করে তাঁর যে শুভেচ্ছাজ্ঞাপনপত্র তা আমাদের পরম সম্পদ। তাঁর মূল্যবান উপদেশ এই পুস্তক রচনায় বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

স্বনামখ্যাত ডাঃ শিশিরকুমার বসু মহাশয় তাঁর নানাবিধ ব্যস্ততার মধ্যেও এক সুচিন্তিত ও উৎসাহব্যঞ্জক ভূমিকা লিখে দিয়ে গ্রন্থের সৌষ্ঠাবর্ধন করে গৌরবান্বিত করেছেন। তাঁর কাছে আমরা সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

এই গ্রন্থ প্রকাশ এবং আনুষঙ্গিক যাবতীয় কাজে প্রথমাবধি যাঁর কাছ থেকে উপদেশ ও ঐকান্তিক সহযোগিতা পেয়েছি তিনি বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের

শ্রীসুবিমল লাহিড়ী। তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ বিবেচনায় তাঁকে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করে অকুণ্ঠচিত্তে বলা ভালো তিনিই আমাদের ধন্য করেছেন।

সুহৃদবর শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় নানা পরামর্শ দিয়ে, তথ্য দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন। কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর সহযোগিতা স্মরণ করি।

প্রচ্ছদ প্রণয়নে শিল্পী শ্রীদেবব্রত ঘোষ এবং মুদ্রণ ব্যাপারে শ্রীঅরিজিৎ কুমার ও শ্রীশিবনাথ পাল নিজেদের কাজ বলেই এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের কাছে আমরা ঋণী হয়ে রইলাম। প্রচ্ছদ ও চিত্রমুদ্রণে রাজা প্রিন্টার্স-এর শ্রীবিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থে মুদ্রিত চিত্রের ফোটো Encyclopaedia Britannica, Netaji : A Pictorial Biography, ভারতের মুক্তি সংগ্রাম, নির্বাসিতের আত্মকথা গ্রন্থ, নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো ও শ্রীমান সিদ্ধার্থ বোসের সৌজন্যে প্রাপ্ত। শিশির স্টুডিও-র শ্রীমান অরুণ রায়চৌধুরী ফোটোগ্রাফির কাজে সহায়তা করেছেন— তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ। এ ছাড়াও যাঁদের কাছে অযাচিত সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া গেছে তাঁদের জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা।

সর্বশেষে উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা আছে, যে ভাবনা-চিন্তা থেকে এই গ্রন্থ রচনার প্রেরণা ও পরিকল্পনা তা পূর্বেই ব্যক্ত করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে হয়েছে যে, স্বাধীনতার কিঞ্চিদধিক পূর্বে ও পরে যাঁরা জন্মগ্রহণ করলেন তাঁরা সবদিক দিয়েই ছিন্নমূল ও দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামের ধারা-বাহিক ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁরা যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছেন। কত ত্যাগ-তিতিক্ষা ও রক্তের বিনিময়ে পৃথিবীতে স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে মর্যাদা পেয়ে যাঁরা গর্বিত— সেই স্বাধীনতার পশ্চাৎপট তাঁদের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেল। তাই যদি সর্বদা ব্যবহারযোগ্য এই গ্রন্থ স্বজাতীর গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের কথা জানতে ও কৌতূহল বাড়াতে এবং সেই জানার ফলে নিজেদের সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত করে, ত্যাগমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে, তবেই এই গ্রন্থ প্রকাশ সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী
অনিলচন্দ্র নাগ

সূচনা

অসংখ্য দ্বীপের সমষ্টি। পুঞ্জ পুঞ্জ দ্বীপমালা। আদিম জঙ্গলাকীর্ণ। দাঁড়িয়ে আছে যুগ যুগ ধরে সমুদ্রের বুকে। বঙ্গোপসাগরে ৬°১৪ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে, ৯২°৯৪ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশের উপর অবস্থিত। কলকাতা থেকে ১২৫৫ কি.মি., মাদ্রাজ থেকে ১১৯১ কি.মি. এবং রেঙ্গুন থেকে ৩৪৮ কি.মি. দূরে অবস্থিত সেই দ্বীপপুঞ্জ। নাম তার আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। নামকরণের আদি ইতিহাস যা জানা যায় তা হ'ল— বিদেশী জাহাজ যখন আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের নিরাপদ দূরত্ব রেখে চলত তখন দ্বীপে কিছু কালো কালো আবছা ছায়ামূর্তির মতো জীব দেখা যেত— বিদেশী নাবিকরা দেশী খালাসীদের জিজ্ঞেস করলে তারা বলত— ওরা নরখাদক হনুমান— বিদেশীদের উচ্চারণ-বৈগুণ্যে— হনুমান 'হণ্ডুমান' আকার ধারণ করে এবং কালক্রমে রূপান্তরিত নাম হয়— 'আন্দামান'।

ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের জানা ও অজানা যে-সমস্ত বিপ্লবী সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দিলেন, বিচারের প্রহসনে মৃত্যুদণ্ডে মৃত্যু বরণ করলেন এবং প্রায় দু-তিন হাজার বিপ্লবী বন্দী আজীবন সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করার জন্য আন্দামানে জীবনের অবশিষ্ট কাল তিলে তিলে অমানুষিক যন্ত্রণা ও কষ্টের মধ্য দিয়ে শেষ করলেন, যাঁদের কেউ আর দেশে ফিরতে পারেন নি— সেখানেই শহীদের মৃত্যুবরণ করলেন— তাঁদের অমর আত্মার উদ্দেশে সশ্রদ্ধ প্রণিপাত জানিয়ে আন্দামান দণ্ডোপনিবেশের ইতিবৃত্ত শুরু করছি।

কোথাও দীর্ঘ, কোথাও প্রসারিত, কোথাও ভগ্ন এই দ্বীপমালা। সংখ্যাগণনার অতীতে 'টারশিয়ারি' যুগে যখন আরাকান পর্বতশ্রেণী নিজেকে বিস্তার করতে চাইছিল, ইরাবতী উপত্যকায় আগ্নেয়গিরিসমূহ প্রাণ ফিরে পেয়েছিল, সে সময় প্রবল চাপে আরাকান পর্বতমালার কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সৃষ্টি করে।

বিশাল আন্দামানের দ্বীপ-সংখ্যা ৩২৪। সমুদ্রগর্ভে ডুবে থাকা পাহাড়ের শিখর-দেশ এই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। মোট আয়তন ২৪৬১ বর্গমাইল। সব থেকে

উঁচু পর্বত শিখর— 'স্যাডেল পিক্' সমুদ্র থেকে ২৪০০ ফুট উঁচু, উত্তর আন্দামানে। দ্বিতীয় : 'ফোর্ডস পিক'— ১৪০০ ফুট ও তৃতীয় : 'মাউন্ট হ্যারিয়ট'— ১২০০ ফুট। আন্দামানে গ্রীষ্ম প্রখর নয়; শীতও প্রবল নয়। বছরে প্রায় সাত মাসই বৃষ্টি হয়। প্রাচীন আদিবাসী মানুষ আজও এখানে বর্তমান। 'ফ্রুট গ্যাদারিং ট্রাইব' —যা আদিতম মানুষের অংশ, পৃথিবীতে যা আজ নিঃশেষিতপ্রায়, তাদেরই সামান্য কিছু এই দ্বীপের ঘন জঙ্গলের অধিবাসী। চারটি মূল ভাগ এদের মধ্যে : ১. আন্দামানী, ২. ওঙ্গী, ৩. জারোয়া, ৪. সেন্টিনালী। এই আদিবাসীরা— 'নেগ্রিটো' পর্যায়ের। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রাচীনতম অধিবাসী— 'নেগ্রিটো'রা পৃথিবীর এই দিকে ছড়িয়ে ছিল। মালয়ের 'সেমাং' ও আন্দামানের এই আদি মানুষরা 'বিশুদ্ধ নেগ্রিটো'। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের সংখ্যা (যখন থেকে জানা যায়)— ৮০০০ থেকে ক্ষয়িষ্ণু হ'তে হ'তে এখন শ'খানেকে দাঁড়িয়েছে।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের বর্তমান ইতিহাস ১৭৮৯ সাল থেকে শুরু হয়েছে বলা যেতে পারে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টর্স-এর আদেশে ভারতীয় নৌবহরের লেঃ কলব্রুক (Lt. R. H. Colbrooke এবং আর্চিবল্ড ব্লেয়ার (Archibald Blair) ২৯ ডিসেম্বর ১৭৮৮ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত Interview দ্বীপে আসেন, এখানে একটি দণ্ডোপনিবেশ স্থাপন সম্বন্ধে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। ব্লেয়ার সেখান থেকে দক্ষিণ আন্দামানে (South Andaman) আসেন। এই দক্ষিণ আন্দামান বন্দরই (South Andaman Port) উপনিবেশ স্থাপনের উৎকৃষ্ট জায়গা বলে তাঁর মতামত জানান। সে জায়গা এখনো তাঁর নাম বহন করছে PORT BLAIR নামে। ১৭৮৯ সালের ১২ জুন আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের দণ্ডিত কয়েদীদের কলোনি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পোর্ট কর্নওয়ালিশ (Port Cornwallis)-এ (যা পরে পোর্ট ব্লেয়ার নামে পরিচিত) একটি উপনিবেশ স্থাপনের আদেশ পেয়ে ব্লেয়ার দ্বিতীয়বার আন্দামানে আসেন ১৭৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। সেখানে চ্যাটহাম (Chatham) দ্বীপে ২৫ অক্টোবর ১৭৮৯ সালের মধ্যেই ব্লেয়ার কিছু জায়গা পরিষ্কার করিয়ে ফেলেন। আগস্ট ১৭৯০ সালের মধ্যে সেখানে প্রথম কয়েদী-উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ১৭৯১ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে চ্যাটহাম দ্বীপে নৌবহরের জিনিসপত্র অবতরণের জন্য একটি জেটি তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু ১৭৯২ সালের নভেম্বর মাসে বঙ্গোপসাগরের

তদানীন্তন অধিকর্তা কমোডর কর্নওয়ালিশের সুপারিশে এই স্থান থেকে উত্তর আন্দামানের উত্তর-পূর্ব বন্দরে উপনিবেশটি সরিয়ে নেওয়া হয়। পরে কিন্তু এই উপনিবেশ সরিয়ে নেওয়া খুব অবিবেচনার কাজ বলে প্রমাণিত হল। কেননা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া অসুস্থতা ও ম্যালেরিয়ায় প্রভূত মৃত্যু হওয়ায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স ১৭৯৬ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি আন্দামানের এই কয়েদী উপনিবেশটি থেকে সমস্ত লোকজন সরিয়ে নিয়ে এটি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সে সময় সেখানে ২৭০ জন সাধারণ কয়েদী ও ৫০০ জন অন্যান্য পুরুষ, মহিলা ও শিশু ছিল।

এর পর থেকে বোর্ড অব ডিরেক্টর্স আন্দামান নিয়ে আর মাথা ঘামায় নি। ১৮৪৯ সালে আন্দামানের কাছে যে ব্রিটিশ জাহাজটি ধ্বংস হয় এবং আরোহী ও নাবিকগণ আন্দামানের আদিবাসী দ্বারা নিহত হয়— সে ঘটনার খবর বোর্ড অব ডিরেক্টর্স ঘটনার পাঁচ বছর পর (১৮৫৪ সালে) জানতে পারে।— তার পরেই বোর্ড অব ডিরেক্টর্স ভারতের গবর্নর জেনারেলকে আন্দামানে একটি দণ্ডোপনিবেশ গড়ে তোলার অনুরোধ করে। কিন্তু গবর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং ও তাঁর কাউন্সিল সমবেত ভাবে এই প্রস্তাব বাতিল করে দেন ব্যয়বাহুল্যের কারণে। কিন্তু ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহই ব্রিটিশ সরকারকে আন্দামানে আবার দণ্ডোপনিবেশ স্থাপনের কথা চিন্তা করতে বাধ্য করে। সেই কারণে ১৮৫৭ সালের ২০ নভেম্বর **Dr. F. L. Mout, Dr. G. D. Playfair ও Lt. Heathcole**-কে নিয়ে আন্দামানে দণ্ডোপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে— একটি কমিটি গঠিত হয়। সে রিপোর্টের ভিত্তিতে গবর্নমেন্টের আদেশ :

"Home Judicial, oc, No. 21. 15th June 1858— Communique of India Government.— It has been determined by Right Hon'ble the Governor General in Council to establish a Penal Settlement on Andaman Islands, for the reception in the first instance of Convicts sentenced to imprisonment and transportation of Crimes of mutiny and rebellion and for other offences connected therewith and eventually for the reception of all Convicts under sentence of transportation. Whom, for reasons it may not be thought expedient to send to strait Settlement

or the Tenarserim Provinces.'' —Dr. Narayan H. Kulkarni, "Andaman and 1857" 'মুক্তিতীর্থ আন্দামান' পুস্তিকা,

Capt. H Man-কে আন্দামানে দণ্ডোপনিবেশ স্থাপনের ভার দিয়ে পাঠানো হল। Man মাত্র দুমাস আন্দামানে থাকেন। তার পর James Paterson Walker আন্দামান দণ্ডোপনিবেশের প্রথম সুপারিণ্টেনডেণ্ট হন।

সিপাহী বিদ্রোহ : পরিচয়, প্রকৃতি, পরিণাম : আন্দামান দণ্ডোপনিবেশে সিপাহী বিদ্রোহের বন্দীগণ

প্রাক্তন আন্দামান বন্দীদের সংস্থা— আন্দামানকে আখ্যায়িত করেছে— 'মুক্তি তীর্থ আন্দামান'। কেন 'মুক্তি তীর্থ'? কারণ ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সংগ্রামে দণ্ডিতদের অশেষ ক্লেশের কাহিনী জড়িয়ে আছে এই উপনিবেশে। সিপাহী যুদ্ধকেই স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধে বলে ইতিহাস স্বীকৃতি দেয়। তার পর শতাব্দীব্যাপী সশস্ত্র স্বাধীনতা-সংগ্রামের নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস। এই দণ্ডোপনিবেশের ইতিবৃত্ত বলতে গিয়ে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সিপাহী যুদ্ধের কাহিনী দিয়ে।

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ-মহাবিদ্রোহ—সিপাহীযুদ্ধ ব্যারাকপুরে মঙ্গলপাণ্ডে যে বিদ্রোহের মশালে প্রথম আগুন দিলেন ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ— সারা ভারতে ১০ মে, ১৮৫৭ থেকে সে বিদ্রোহের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ল। দিকে দিকে বিদ্রোহী সিপাহী ও জনসাধারণ ইংরেজ সৈন্য ছাউনিগুলি ধ্বংস করতে লাগল। সিপাহী, কৃষক ও অন্যান্য জনসাধারণ সহ মোট প্রায় এক কোটি লোক এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে। বিদ্রোহী ভারতীয় সিপাহী ও অন্যান্য বিদ্রোহীদের সঙ্গে ইংরজ সৈন্যদলের সম্মুখ যুদ্ধ হতে লাগল। ভারতে ইংরেজের ভিত নড়ে ওঠে, ব্রিটিশ প্রমাদ গনল।

কিন্তু কেন এই বিদ্রোহ— কেনই বা এ যুদ্ধ? "The Revolt of 1857 was much more than a mere product of Sepoy discontent. It was in reality a product of accumulated grievances of the people against Company's administration and of their dislike for foreign regime." —*Modern India* National Council of Educational Research and Training, G. O. I. New Delhi। এ কথা সত্য যে রাজ্যচ্যুত অথবা নানা কারণে বিক্ষুব্ধ কয়েকজন দেশীয় নৃপতি এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশকে এদেশ থেকে বহিষ্কৃত করে নিজেদের রাজ্য ফিরে পেতে চেয়ে-

ছিলেন। কিন্তু তাতে কী এসে যায়। তাঁরা তো ভারতীয় সিপাহী ও অর্থনৈতিক কারণে পিষ্ট, বিদেশী শাসনে অতিষ্ঠ জনগণের সাহায্যে ভারতকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন ইংরেজের হাত থেকে। ইংরেজের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট ভারতীয়-সিপাহীরাই এই যুদ্ধের মূল শক্তি। হাজার হাজার ভারতীয় সিপাহী ইংরেজের সৈন্য ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এসে বিদ্রোহে যোগ দেয়— ইংরেজ সৈন্যর সঙ্গে যুদ্ধ করে— প্রাণ নেয় ও প্রাণ দেয় নির্ভীক ভাবে। অনেক জায়গায় নিজেদের স্বাধীন শাসন ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠা করে।

প্রকৃতপক্ষে এই বিদ্রোহের পরিকল্পনা প্রস্তুতি অনেকদিন আগে থেকেই অতি গোপনে চলতে থাকে কানপুরের বিঠুরে, ধুন্ধুপন্থ নানাসাহেবের দরবার গৃহে। শেষ পেশোয়া, রাজ্যচ্যুত দ্বিতীয়া বাজীরাও-এর দত্তক পুত্র নানাসাহেব। দ্বিতীয় বাজীরাও রাজ্যচ্যুত হওয়ার পর ইংরেজের নির্দেশে কানপুর থেকে বারো মাইল দূরে গঙ্গাতীরে বিঠুরে বাস করতে থাকেন— তাঁর বহু আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি নিয়ে, বার্ষিক আট লক্ষ টাকার বৃত্তি ও একটি জায়গীরের বিনিময়ে। বত্রিশ বছর এই বৃত্তি ভোগ করার পর দ্বিতীয় বাজীরাও বিঠুরে মারা যান ১৮৫১ সালে। মৃত্যু-কালে তিনি তাঁর দত্তক পুত্র নানাসাহেবকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। কিন্তু ইংরেজ সরকার নানাসাহেবকে এই বৃত্তি মঞ্জুর করতে অস্বীকার করে নানা অজুহাতে। বহু ভাবে চেষ্টা করেও নানাসাহেব বিফল হন। ১৮৫৩ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি আজিমুল্লাকে তাঁর দূত নিযুক্ত করে ইংলণ্ডে পাঠান— ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টর্সও ইংলণ্ডের রানীর কাছে, তাঁর পিতার ঐ বৃত্তি তাঁকে মঞ্জুর করার জন্য। কিন্তু প্রচেষ্টা বিফল হয়। পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজিমুল্লা— ফ্রান্স, তুরস্ক ও রাশিয়ায় ভারতে বিপ্লবের সাহায্যের জন্য চেষ্টা করেন। প্রায় আড়াই বছর পর তিনি ভারতে ফেরেন। বিদ্রোহের প্রস্তুতি চলতে থাকে নিভৃতে। নানাসাহেব বাইরে খুব ইংরেজ ভক্ত— আর ইংরেজরাও তা বিশ্বাস করত। নানাসাহেবই যে এই বিদ্রোহের নায়ক তা ইংরেজরা বহুদিন পর্যন্ত বুঝতে পারে নি। এত চাতুর্যের সঙ্গে নানাসাহেব কাজ করেছিলেন। নানাসাহেব তাঁর বিশ্বস্ত দূত মারফত খুব গোপনে ভারতের সব দেশীয় রাজাদের ব্রিটিশ-বিরোধী অভ্যুত্থানে যোগ দিতে আহ্বান করেছিলেন। ভারতে সকল ব্রিটিশ সৈন্য ছাউনিগুলিতে নানাসাহেবের লোকেরা, ইংরেজের প্রতি বহু কারণে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ভারতীয়-সিপাহীদের কাছে বিদ্রোহে যোগ-

দানের আহ্বান করতে থাকে। ইংরেজের সৈন্য ছাউনিগুলির বাইরে দেখা যেতে লাগল বহু সন্ন্যাসী ও ফকীরকে। এই সন্ন্যাসী ও ফকীররা দেশীয় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহীদিগকে উত্তেজিত করতে থাকে আসন্ন বিদ্রোহের সামিল হওয়ার জন্য। প্রচার হতে থাকে জ্যোতিষীদের ভবিষ্যৎ গণনা— পলাশীযুদ্ধের ১৭৫৭ সালের ২৩ জুনের-একশো বছর পর ব্রিটিশ ভারতে আর থাকবে না। বাংলা থেকে সুদূর পেশোয়ার পর্যন্ত সব ইংরেজ সৈন্য ছাউনিগুলিতে দেশী সিপাহীদের কাছে বিলি হতে থাকল প্রচুর "চাপাটি চিঠি", এক গ্রাম থেকে অন্যগ্রামে— এক সিপাহী ব্যারাক থেকে অন্য সিপাহী ব্যারাকে চলে যেতে লাগল এই চাপাটি— ময়দার রুটি। প্রচার হল: এ খেলে কোনো অসুখ হয় না। প্রকৃত-পক্ষে এই চাপাটির মধ্যে থাকত আসন্ন বিদ্রোহে যোগ দেওয়ার আহ্বান-লিপি। জনসাধারণ ও সিপাহীরা অতি আগ্রহের সঙ্গে এই চাপাটি নিত ও বিলি করত। নির্দেশ ছিল কোনো সিপাহীদল বিদ্রোহ করলে তারা ব্যারাকে বা অফিসারদের বাংলোতে আগুন লাগিয়ে দেবে— যাতে বহুদূরের সিপাহীরা সেই আগুন দেখে-বুঝতে পারে যে ওখানকার সিপাহীরা বিদ্রোহ করবে বা করেছে। আর ঠিক এইভাবেই কাজ হয়েছিল দেশের বহু জেলখানাতে, কয়েদীদের কাছেও এই-"চাপাটি চিঠি"-বিলি হয়েছিল।

বিপ্লবের প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে এল একটি অব্যর্থ সুযোগ। কোম্পানির ফৌজের মধ্যে এতদিন "ব্রাউন ব্রেস" নামে অল্প পাল্লার বন্দুকের ব্যবহার ছিল। এবার তার বদলে সৈনিকদের ব্যবহারের জন্য এল দূরপাল্লার বন্দুক-'এনফিল্ড গান'। এই বন্দুকের টোটা গোরু ও শুয়োরের চর্বি-মাখানো মসৃণ কাগজে মোড়া থাকত, আর সেই কাগজ দাঁতে কেটে টোটা বন্দুকে ভরতে হত। এই খবর সিপাহীদের মধ্যে ভীষণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহীরা জাতি ও ধর্ম নাশের আতঙ্কে ইংরেজদিগের উপর ভীষণ ক্রোধান্বিত হয়। এক ছাউনি থেকে অপর ছাউনিতে গোপনে তারা খবর পাঠাতে থাকে আসন্ন বিদ্রোহে তাদের যোগদানের সম্মতি জানিয়ে।

এই সময় আরো একটি কথা খুব প্রচার হয় জনসাধারণ ও সিপাহীদের মধ্যে, যে, ইংরেজ ভারতীয়দের জাতি নাশের জন্য হাড়ের গুঁড়ো মিশিয়ে দিচ্ছে— চিনি, নুন ও ময়দার মধ্যে। জনসাধারণ ও সিপাহীরা উত্তেজিত— ইংরেজের উপর ভীষণ বিরূপ।

বিপ্লবের প্রস্তুতি পর্ব প্রায় শেষ। ঠিক হল সারাভারতের কোম্পানির বিভিন্ন সেনানিবাসের সমস্ত দেশীয় সিপাহীরা ও জনসাধারণ একই দিনে বিদ্রোহ করাবে— আর সে তারিখটি হল— রবিবার ৩১ মে, ১৮৫৭ খৃ.। গোপন কর্মকেন্দ্রগুলি হল— বিঠুর, দিল্লী, লক্ষ্মৌ, বিহারের আরা জেলার জগদীশপুর প্রভৃতি।

কিন্তু সিপাহীরা কোনো কোনো জায়গায় অধৈর্য হয়ে ওঠে। বহরমপুরের উনিশ নম্বর রেজিমেণ্টের সিপাহীরা ১৮৫৭-র ১৯ ফেব্রুয়ারি বিদ্রোহ করে বসল। সহজেই ইংরেজ সেনানায়করা সেদিনের বিদ্রোহ দমন করে। সেদিন— বহরমপুরের নিকটবর্তী অঞ্চলের অনেক লোক সিপাহীদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য বহরমপুরে এসে জমায়েত হয় ও মুর্শিদাবাদের নবাবকে এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব নিতে অনুরোধ করে। নবাব কিন্তু রাজী হন নি। পরে এই ১৯ নং রেজিমেণ্টকে বন্দী করে ব্যারাকপুরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেই সংবাদ ও অনেক গোরা সৈন্য কলকাতায় এসেছে— এই সংবাদে ও পূর্ব থেকেই উক্ত চর্বি-টোটার খবরে উত্তেজিত ব্যারাকপুর ক্যাণ্টনমেণ্টের সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে বিদ্রোহী হয় ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ। ৮ এপ্রিল ১৮৫৭ মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি হল সর্বজনসমক্ষে। আর ২২ এপ্রিল ১৮৫৭ তে ফাঁসি হল জমাদার ঈশ্বরী পাঁড়ের। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ হল— ঘটনার সময় মঙ্গল পাণ্ডের কাছে দাঁড়িয়ে থেকেও তিনি বাধা দেন নি।

২৪ এপ্রিল ১৮৫৭ মীরাটের **3rd Native Cavalry**-র অশ্বারোহী সৈন্যরা চর্বি মাখানো সেই টোটা নিতে অস্বীকার করে। ৯ মে ১৮৫৭ কোর্ট মার্শালে বিচারে ঐ অশ্বারোহী সিপাহীদের ৮৫ জনকে সৈন্য বাহিনী থেকে বহিষ্কৃত করা হয় ও তাদের দশ বছর করে কারাদণ্ড হয়।— তাদের হাতে ও পায়ে বেড়ী দিয়ে জেলখানায় রাখা হয়।

মীরাটের সিপাহীরা অপমানিত, লাঞ্ছিত হল। ১০ মে ১৮৫৭ সন্ধ্যায় মীরাটের সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়ে জেলখানায় থাকা তাদের সেই ৮৫ জন সহকর্মীকে জেল ভেঙে মুক্ত করে নিয়ে আসে— তৎসহ জেলের তিন-চারশো সাধারণ কয়েদী। সেনানিবাসে, অফিসারদের বাংলোগুলিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। মীরাট সেনানিবাসের কর্নেল ফিনিস্ সিপাহী-বিদ্রোহের প্রথম বলি। এই মীরাটেই প্রথম ধ্বনি উঠল— "ফিরিঙ্গি লোগোঁ কো মারো।" মীরাটের সমস্ত দেশী সিপাহী বিদ্রোহী হয়ে ইংরেজ অফিসারদের আক্রমণ করে হত্যা করল। তাদের সঙ্গে সেদিন মীরাটের সাধারণ লোকও যোগ দেয়। দিল্লীর সঙ্গে

টেলিগ্রাফ লাইনও তারা কেটে দেয়। ছাউনিতে, রাস্তায় পথে পথে— শুধু ইংরেজদের মৃতদেহ। প্রায় প্রত্যেক ইংরেজ ঐতিহাসিকের অভিমত— "দি গ্রেট ক্রিশ্চিয়ান কার্নেজ" এইভাবে শেষ হয়। ভাবতে অবাক লাগে ইংরেজ-কর্তৃক সম্মিলিত হিন্দু-মুসলিম হত্যালীলা "কার্নেজ" বলে গণ্য হল না। রাত্রি শেষ হবার আগে এই বিদ্রোহী বাহিনী— পদাতিক ও অশ্বারোহী দু হাজার সিপাহী— মীরাট থেকে বত্রিশ মাইল দূরে দিল্লীর দিকে রওনা হয়।

১১ মে ১৮৫৭ মীরাটের বিদ্রোহী আশ্বারোহী দল প্রথমে দিল্লী এসে পৌঁছায়। পদাতিকরা এসে পৌঁছলো বেলা দশটায় মধ্যেই। আশা আকাঙ্ক্ষা উৎসাহে উদ্দীপ্ত বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর পদভারে সেদিন দিল্লীর রাস্তা টলমল। বিদ্রোহীরা এসে দাঁড়ালেন শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শা'র প্রাসাদে— লালকেল্লায়।

একদল বিদ্রোহী গেল দিল্লী ক্যান্টনমেণ্টের দিকে। দিল্লীতে তখন তিন হাজার দেশীয় সিপাহী ও বাহান্ন জন ইংরেজ সৈন্য ছিল। দিল্লীর সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে অনেক ইংরেজ অফিসারকে হত্যা করে। প্রাসাদের সব ইংরেজও নিহত হলো। দিল্লীর প্রাসাদ বিদ্রোহীতে ভরে গেল। বাহাদুর শাহ্‌র সঙ্গে বিদ্রোহীনেতাদের গোপন পরামর্শ হল। স্থির হল আর বিদ্রোহ আরম্ভের পূর্বনির্ধারিত তারিখ ৩১ মে ১৮৫৭-র জন্য অপেক্ষা করা উচিত নয়। বাহাদুর শা' বিদ্রোহের নেতৃত্ব নিলেন। ১৬ মে ১৮৫৭-র মধ্যে দিল্লীতে ইংরেজদের কোনো চিহ্নই আর থাকল না। রাজত্ব করতে লাগলেন বাহাদুর শা'। দিল্লীর দুর্গের মধ্যে ইংরেজরা অবরুদ্ধ হয়ে থাকল। দিল্লীর খবর সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। ক্রমে ক্রমে দিল্লীতে বিদ্রোহী সিপাহীর সংখ্যা দাঁড়াল বিশহাজার। সেনাপতি হলেন রোহিলাখণ্ডের বখৎ খাঁ। বিপ্লবীদের পক্ষে দিল্লীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন— হাকিম আহমান উল্লা খাঁ, জেনারেল সমাদ খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁ প্রভৃতি।

১১ মে ১৮৫৭ থেকে ১৮৫৭র আগস্টমাসের শেষ পর্যন্ত দিল্লী বিদ্রোহীদের দখলে থাকে।

১২ মে ১৮৫৭ ফিরোজপুরের সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়।

২০ মে ১৮৫৭ নৌশেরার কিছু সিপাহী বিদ্রোহ করে ও মরদানের সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দেয়।

২১ মে ১৮৫৭ পেশোয়ারের কিছু নিরস্ত্র সিপাহী বিদ্রোহী হয়ে ব্যারাক ছেড়ে চলে যায়। সেই ফৌজের— ৫১ নং পল্টনের সুবেদার দিগ্বিজয় সিংহ ধরা প'ড়ে কোর্ট মার্শালের বিচারে ফাঁসিতে প্রাণ দেন।

৩১ মে ১৮৫৭ লক্ষ্মৌর সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়। লক্ষ্মৌ-বিদ্রোহের প্রাণ ছিলেন— মৌলভী আহাম্মদ উল্লা।

১৮৫৭র ৩১ মে বেরিলির সিপাহীরা বিদ্রোহ করে বেলা এগারোটায়। ছয় ঘণ্টার মধ্যে বেরিলিতে ইংরেজের শাসন লুপ্ত হয়। জনসাধারণও এই বিদ্রোহে যোগ দেয়। নেতৃত্ব করেন বেরিলির বিখ্যাত নবাব বংশীয় বৃদ্ধ খাঁ বাহাদুর খাঁ। তিনি বেরিলির শাসনকর্তা হন। পরে বেরিলির পুনরুদ্ধারের সময় ইংরেজদের হাতে তাঁর ফাঁসি হয়।

বেরিলির পর পরই— মোরাদাবাদ শাজাহানপুর বুদায়ুন প্রভৃতি স্থানে সিপাহী ও জনসাধারণ বিদ্রোহ ক'রে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

ফরাক্কাবাদে ৪১ নং ও ১০ নং ফৌজের সিপাহীরা বিদ্রোহী হয় সুলতান খাঁর নেতৃত্বে। সঙ্গে সঙ্গে ফতেগড়ে বিদ্রোহ হয়। আগ্রার পতন হয় ও আলীগড়, প্রটোয়, মৈলপুরী, মথুরা বিদ্রোহী সিপাহীদের দখলে আসে।

১৮৫৭ সালের ৩ জুন আজিমগড়ের সিপাহীরা বিদ্রোহ করে ও কোম্পানির সাত লক্ষ টাকা লুঠ করে ; ৪ জুন কাশীর সিপাহীরা ও ৫ জুন জৌনপুরের সিপাহীরা বিদ্রোহ করে ; ৬ জুন এলাহাবাদের সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়। গবর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং এলাহাবাদের সিপাহীরা কোম্পানির প্রতি অনুগত আছে জেনে যে ধন্যবাদ পত্র পাঠান তা সেদিন সকালে প্যারেডে সিপাহীদের পড়ে শোনানো হয়, সিপাহীরা হর্ষধ্বনি করে ওঠে। আর রাত নয়টায় তারাই বিদ্রোহ করে। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের অদ্ভুত গোপন কর্মচাতুর্যে রাত্রেই এখান থেকে সংকেতসূচক হাওয়াই ছাড়া হয়। পরদিন এলাহাবাদের, ট্রেজারি লুঠ ক'রে সিপাহীরা ত্রিশ লক্ষ টাকা পায়। এলাহাবাদের চক্র বাগের মৌলভী লিয়াকৎ আলির প্রচেষ্টায় এলাহাবাদে ভীষণ ইংরেজ বিদ্বেষ প্রসারিত হয়। তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা জনসাধারণের হৃদয় উদ্‌বেলিত করে তুলত। এলাহাবাদ পরিত্যাগ করে পলায়নকালে একটা বড়ো স্টীমারে কামান নিয়ে এলাহাবাদের গঙ্গার দুই তীরের গ্রামগুলিতে যথেচ্ছ গোলা বর্ষণ করে আগুন ধরিয়ে দিয়ে সম্পত্তি ও বহু নিরীহ প্রাণ বিনষ্ট করে ব্রিটিশ সেনাপতি কর্নেল নীল।

কানপুরে বিঠুর দরবার গৃহে বসেই অতি গোপনে, অতি দক্ষতার সঙ্গে ১৮৫৭ সালের এই মহাবিদ্রোহের নিখুঁত পরিকল্পনা করেছিলেন নানাসাহেব— আজিমুল্লা, তাঁতিয়া তোপী, মৌলভী আহাম্মদউল্লা, মৌলভী লিয়াকৎ আলী প্রভৃতির সহায়তায়। তাঁরা নির্ভুল ও নিখুঁত ভাবে বিদ্রোহের পরিকল্পনা ও তা বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন। সারা উত্তর ভারতে যেভাবে নিঃশব্দে একের পর এর ইংরেজ সেনানিবাসে দেশীয় সিপাহীর বিদ্রোহ করেছিলেন তাতে তাঁদের বুদ্ধি কৌশল ও কর্মকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এপ্রিল মাসের আজিমুল্লা সহ নানাসাহেব উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান শহরগুলি ঘুরে বিপ্লবের শেষ পর্যায়ের কাজগুলি সেরে আসেন।

৪ জুন ১৮৫৭ রাতে কানপুরে সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আগের দিন রাত্রে এই বিদ্রোহী সিপাহীদের নেতৃস্থানীয়— সামস্ উদ্দিন খাঁন, টিক্কাসিং জাওলাপ্রসাদ ও মুদ্দুদ আলী— নানাসাহেবের সঙ্গে গোপনে দেখা করেন ও সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলেন। ৪ জুন রাত্রেই সিপাহীরা জেলখানা ভেঙে কয়েদীদের মুক্ত করে দেয়, ট্রেজারি লুঠ করে, অফিসারদের মেরে কামান ও অস্ত্রাগারের অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র হস্তগত করে। নানাসাহেব বিদ্রোহী সিপাহীদের সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ করলেন। ইংরেজ বিতাড়িত হতে লাগল। ৬ জুন ১৮৫৭ কানপুরের বিদ্রোহ-পরিচালনা ও যুদ্ধ করার জন্য নানাসাহেব ভার দিলেন— সুবেদার টিক্কা সিং, জমাদার দলগঞ্জ সিং ও গঙ্গাদীন সিংকে। টিক্কা সিংকে জেনারেল উপাধি ও অপর দুজনকে কর্নেল উপাধি দেন নানাসাহেব। বেলা দুটায় বিদ্রোহীদের কামান গর্জে ওঠে, কানপুরের ইংরেজদের দুর্গ আক্রমণ করে। সুরক্ষিত দুর্গটি তিন সপ্তাহ ধরে অবরোধ করে রাখে বিদ্রোহীরা। দুর্গমধ্যে কানপুরের সব ইংরেজ সামরিক বেসামরিক লোক ছিল। বিদ্রোহীদের ক্রমাগত গুলি চালনায় অনেক ইংরেজ সেখানে মারা যায়। ক্রমেই ইংরেজরা দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে— বিদ্রোহীরা প্রবল হয়ে ওঠে। ইংরেজরা ক্ষুধাতৃষ্ণায় অবসন্ন। দুর্গের রসদও নিঃশেষিতপ্রায়। নানাসাহেব তাদের আত্মসমর্পণ করতে বললেন। তাদের এলাহাবাদ যেতে দেওয়া হবে বলা হল। ইংরেজেরা রাজী হয়ে অস্ত্রশস্ত্র সহ দুর্গ পরিত্যাগ করল। সঙ্গে সঙ্গে নানাসাহেবের পক্ষে ব্রিগেডিয়ার জোয়ালা প্রসাদ দুর্গের ভার নিলেন। দুর্গশিখর থেকে ইংরেজের ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে পেশওয়ার পতাকা উত্তোলন হল। ব্যবস্থামত প্রায় পাঁচশো সামরিক ও বেসামরিক ইংরেজ (স্ত্রীলোক, শিশু

সহ) সেদিন ২৭ জুন ১৮৫৭তে কানপুরের গঙ্গার সতীচৌরা ঘাটে এলাহাবাদ যাওয়ার জন্য চল্লিশটি নৌকায় ওঠে।— বেলা নয়টায় নৌকায় ওঠা শেষ হলে হঠাৎ ভেরী বেজে ওঠে— মাঝিরা নৌকা থেকে পালিয়ে যায়— আর গঙ্গার দুই তীর থেকে নৌকাগুলির উপর গোলাবর্ষণ হতে থাকে। উনচল্লিশখানা নৌকা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অনেক ইংরেজের মৃত্যু হয়, অবশিষ্টদের বন্দী করে আনা হয়। গোলাবর্ষণ কালে একটি নৌকায় কয়েকজন সেনাবাহিনীর লোক ভেসে যেতে সক্ষম হয়। পরদিন বিদ্রোহীরা সেই নৌকা আক্রমণ করে ও দশজন ইংরেজ সামরিক ব্যক্তিকে হত্যা করে। চারজন গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে অযোধ্যায় এসে প্রাণ বাঁচায়। সেদিন কানপুরে আশিজন ইংরেজকে বন্দী করা হয়। পুরুষদের প্রাণদণ্ড হল, মহিলা শিশু ও সতীচৌরা ঘাট থেকে যাদের বন্দী করে আনা হয়েছিল তাদের— দুশো-ছয়, জনকে 'বিবিঘরে' বন্দ করে রাখা হয়। ১৮৫৭-র ১৫ জুলাই তাদের সকলকে হত্যা করা হয়। পরদিন মৃতদেহগুলি কাছেই একটি কুয়োর মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। কানপুরে আর একটি ইংরেজও জীবিত থাকল না। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা এই দুটি হত্যাকাণ্ডের জন্য নানাসাহেবকেই দায়ী করেন।

নানাসাহেব কর্তৃক ব্রিটিশ সৈন্যকে বাধা দেওয়ার জন্য দেড় হাজার পদাতিক ও গোলন্দাজ, পাঁচশো অশ্বারোহী, দেড় হাজার সশস্ত্র সাধারণ লোকের এক মিলিত বাহিনী ১২টি কামান নিয়ে এলাহাবাদ যাত্রা করে। ১২ জুলাই তারিখে তাদের সঙ্গে ব্রিটিশ সেনাপতি হ্যাভলকের সেনাবাহিনীর যুদ্ধ হয়— ফতেপুরে। প্রচণ্ড যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্য জয়লাভ করে। এই যুদ্ধে বিদ্রোহী পক্ষে— সেনাপতি ছিলেন টিক্কা সিং ও জাওলাপ্রসাদ, মৌলভী লিয়াকৎ আলী ছিলেন তাঁদের পরামর্শদাতা। তারপর ইংরেজ সৈন্যকে বাধা দিবার জন্য নানাসাহেব পাঠান রণনিপুণ বালারাওকে সেনাপতি ক'রে, প্রচুর অস্ত্র ও সৈন্য দিয়ে। 'আওঙ্গ' নামে এক জায়গায় ব্রিটিশ সেনাপতি হ্যাভলকের সৈন্যদলের সঙ্গে দু'ঘণ্টা তুমুল যুদ্ধের পর বালারাও পরাজিত হয়ে কানপুরে ফিরে আসেন। ১৬ জুলাই নানাসাহেব নিজে পাঁচ হাজার সৈন্য ও সাতটি কামান নিয়ে জেনারেল হ্যাভলকের সৈন্যদলকে বাধা দেওয়ার জন্য কানপুর থেকে চার মাইল দূরে সৈন্য সমাবেশ করেন। দুপক্ষে তুমুল যুদ্ধ হল— আড়াই ঘণ্টা যুদ্ধের পর জয়ের আশা ত্যাগ করে নানাসাহেব যুদ্ধ পরিত্যাগ করলেন।

৭ জুন রাত্রে জলন্ধরের সিপাহীরা বিদ্রোহ করে। আর জলন্ধরের বিদ্রোহী

সিপাহীদের সঙ্গে মিলে ৮ জুন লুধিয়ানার সিপাহীরা বিদ্রোহী হয় ; ১৪ জুন গোয়ালিয়রের সিপাহীরা বিদ্রোহ করে। তারপর ইন্দোরের সিপাহীরাও বিদ্রোহী হয়। অযোধ্যায় সিপাহীরা বিদ্রোহ করে ১৮৫৭ সালের জুন মাসের শেষে।

পাটনার রাজপথে বিদ্রোহীরা আত্মপ্রকাশ করে ৩ জুলাই সন্ধ্যায়। বিদ্রোহীদের বেশির ভাগই ওয়াহাবী মুসলমান। দানাপুরের শিখ সৈন্য এসে এই বিদ্রোহ দমন করে। এর আগেই পাটনার বিশিষ্ট প্রভাবশালী ওয়াহাবী মৌলবী শাহ মহম্মদ হুসেন, আহাম্মদ উল্লা ও ওয়াজুল হক-কে গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছিল। পাটনার বিদ্রোহী পীর আলীকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

২৪ জুলাই ১৮৫৭ দানাপুরের সিপাহীদের নিরস্ত্র করা হয়। এই সিপাহীরা আরার বিদ্রোহী দলের সঙ্গে যুক্ত হয়। বিদ্রোহীদের নায়ক ছিলেন— অশীতিপর বৃদ্ধ কুমার সিং। আরা জেলার জগদীশপুরের এক প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন তিনি। সহায়ক ছিলেন— তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমর সিং। ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে জগদীশপুরের একটু দূরে কুমারসিংহ-এর সেনাবাহিনীর তুমুল যুদ্ধ হয়। কুমার সিং পরাজিত হয়ে সাসারামে পালিয়ে যান। ইংরেজরা তাঁর প্রাসাদ, দেবালয় ও ভ্রাতা অমর সিং ও দয়াল সিং-এর বাড়িও কামানের গোলা দেগে ভূমিসাৎ করে দেয়। জগদীশপুরের আশেপাশের গ্রামগুলি জ্বালিয়ে দেয়। গ্রামবাসীদের ফাঁসি দিয়ে গাছে গাছে ঝুলিয়ে রাখে ইংরেজরা। এই অশীতিপর বৃদ্ধ কুমার সিং-এর নামের এক আশ্চর্য জাদু ছিল। সারা বিহারে ও মধ্য ভারতের কোম্পানির সিপাহীরা তাঁর নামে চঞ্চল হয়ে উঠত। তিনি যেখানেই গেছেন সেখানকার সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। জগদীশপুরের পতন হবার আট মাস পর কুমার সিং বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আজমগড়ের ইংরেজ ঘাঁটি আক্রমণ করেন। শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে ইংরেজ সেনাপতি মিলম্যানের সেনাবাহিনীর সঙ্গে কুমার সিংহ-এর সিপাহীদের যুদ্ধ হয়। ইংরেজরা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। কুমার সিং আজমগড় দখল করেন। দলে দলে বিদ্রোহী সিপাহী এসে তাঁর বাহিনীতে যোগ দিতে থাকে। তিনি এই সময় কাশীতে তাঁর আধিপত্য বিস্তার করেন। জগদীশপুর থেকে কিছু দূরে 'নথাই'-এ কুমার সিং-এর শিবির আক্রমণ করতে এক বিশাল ইংরেজ সৈন্যবাহিনী আসে। কিন্তু অতি অদ্ভুত কৌশলে কুমার সিং তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, গঙ্গা পার হয়ে গাজিপুরে আসতে সমর্থ হন। ইংরেজসৈন্য সব সময়েই তাঁর পিছু পিছু আসছে।

তিনি যখন পাল্কিতে আসছিলেন তখন ইংরেজদের একটি গোলার আঘাতে তাঁর ডান হাত খুব জখম হয় ও উরুতেও আঘাত লাগে। তাঁর আদেশে ডান হাতখানি কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়, কুমার সিং জগদীশপুরে নিজ বাড়িতে মারা যান। এর আগে মধ্য ভারতে তাঁতিয়া তোপীর পাশে থেকেও তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে। গেরিলা যুদ্ধে পারদর্শী এই দেশপ্রেমীর নাম এখনো লোকের মুখে মুখে ফেরে। নানাসাহেবের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগা-যোগ ছিল।

১০ জুন ১৮৫৭ হোটীমরদানের একশো কুড়ি জন ধৃত বিদ্রোহী সিপাহীর মধ্যে চল্লিশ জনকে প্রকাশ্যে তোপের মুখে উড়িয়ে দেয় ইংরেজরা। আর ৩ জুন ১৮৫৭তে ৫১ নং পল্টনের পলাতক সিপাহীদের বারো জনকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হয়।

ইংরেজের হাতে কানপুরের পতনের পর তাঁতিয়া তোপী আবার যুদ্ধ করে ইংরেজের হাত থেকে কানপুর দখল করেন। পরে তিনি পরাজিত হয়ে অন্যত্র গমন করেন।

৫ জুন ১৮৫৭তে ঝাঁসীর ইংরেজ সেনানিবাসের দেশীয় সিপাহীরা বিদ্রোহ করে ও ইংরেজদের তাড়িয়ে দেয়। রাজ্যচ্যুত ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাই তখন থেকে প্রকৃতপক্ষে ঝাঁসী শাসন করতে থাকেন। তিনি ব্রিটিশের হাত থেকে ঝাঁসী রক্ষা করার জন্য দুর্গটি সুরক্ষিত করেন, সৈন্য সংখ্যা বাড়ান ও নিজে সিপাহী ও নগরবাসী স্ত্রীপুরুষ সকলকেই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করতে উদ্-বুদ্ধ করেন। প্রায় এক বছর এই প্রচেষ্টায় তাঁর কোনো বিশ্রাম ছিল না। ১৮৫৮ সালের ২২ মার্চ ইংরেজরা ঝাঁসীর দুর্গ আক্রমণ করে। দুপক্ষে যুদ্ধ চলতে থাকে। ইতিমধ্যে ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাইকে সাহায্য করার জন্য তাঁতিয়া তোপী বাইশ হাজার সৈন্য ও ২৮টি কামান নিয়ে ঝাঁসীর রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হলেন। তাঁর অগ্রবর্তী সৈন্যদল ইংরেজদের সঙ্গে পরাজিত হওয়ায় তিনি জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে দিয়ে সৈন্য নিয়ে চলে যান। এদিকে ঝাঁসী দুর্গ রক্ষার জন্য তুমুল যুদ্ধ হতে থাকে। ৪ এপ্রিল ১৮৫৮তে ঝাঁসীর পতন হয়। সেদিন রাত্রেই রানী লক্ষ্মীবাই ঝাঁসী ছেড়ে চলে গেলেন — কাল্পিতে, তাঁতিয়া তোপীর কাছে। এবার কাল্পির দ্বিতীয় যুদ্ধে রানী লক্ষ্মীবাই যথেষ্ট পরাক্রম দেখান কিন্তু তাঁরা জয়লাভ করতে পারলেন না। তিনি তখন তাঁতিয়া তোপীর সঙ্গে গিয়ে গোয়ালিয়র দুর্গ অবরোধ করেন। সেখানকার সিপাহীরা তাঁদের পক্ষে যোগ দেয়। তাঁরা গোয়ালিয়র দখল করলেন।

১৭ জুন ১৮৫৮-তে গোয়ালিয়রের দক্ষিণ-পূর্বে— পাঁচ মাইল দূরে "কোঠা-কি-সরাই"-এর যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর কাছে তাঁরা পরাজিত হন। রানী যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করলেন। পথে কয়েকজন ইংরেজ অশ্বারোহী সৈন্য তাঁকে আক্রমণ করে —রানী তাদের সঙ্গে একাকী একটি তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করতে থাকেন। ইংরেজ সৈন্যের আঘাতে তাঁর মাথায় ডান দিক কেটে যায়— বক্ষস্থল সঙ্গিন-বিদ্ধ হয়। আর জীবনের আশা নেই দেখে তিনি এক বিশ্বস্ত সহচরের সাহায্যে নিকটস্থ গঙ্গাধর বাবাজীর পর্ণকুটিরে যান। বাবাজী তাঁর মুখে গঙ্গা জল দেন। ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাই দেহত্যাগ করলেন ১৭ জুন ১৮৫৮-তে।

কানপুরে ইংরেজের গুলিতে আগেই আজিমুল্লার মৃত্যু হয়েছে। বাকী শুধু মারাঠা বীর তাঁতিয়া তোপী।

সারা মধ্যভারত তখন তাঁতিয়া তোপীর নামে মুখরিত। তাঁকে ধরবার জন্য ইংরেজরা নগরে বন-জঙ্গলে পাহাড়-পর্বতে হন্যে হয়ে ছুটতে লাগল। দেখতে দেখতে নয় মাস কেটে গেল, তাঁতিয়া তোপীর কোনো সন্ধানই ইংরেজরা পেল না। তাঁতিয়া তোপীর পলাতক জীবনের কাহিনী সিপাহী-বিদ্রোহের গেরিলা যুদ্ধের এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়। সৈন্যদল সহ এমন-কি কামান সহ তিনি স্থান থেকে স্থানান্তরে জঙ্গলে জঙ্গলে গিয়েছেন ইংরেজের চোখ এড়িয়ে। কোনো কোনো জায়গায় যুদ্ধে হেরেছেন— কামান ফেলেও পালাতে হয়েছে তাঁকে— কিন্তু ইংরেজেরা তাঁকে ধরতে পারে নি। এর মধ্যেও তিনি ঝালোরের রাণার প্রাসাদ অবরোধ করেন, রাণার সৈন্যদল তাঁর অনুগামী হয়। তখনো সঙ্গে ছিলেন রাও সাহেব ও বাঁদার নবাব। তাঁকে নানা স্থানে ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে কৌশলে পথ করে নিয়ে চলতে হয়। আর কত দিন এভাবে চলা যায়? তবু তাঁর ক্লান্তি নেই। রাওসাহেব তাঁকে ছেড়ে গেলেন— বাঁদার নবাবও একদিন অদৃশ্য হলেন। পূর্বের সংগ্রামী সঙ্গী সহকর্মী আর কেউ সঙ্গে নেই। তিনি একা। সঙ্গে আছে শুধু গোয়ালিয়রের চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত নরবরের সর্দার মানসিংহ। বহু ইংরেজ সেনাপতি তাঁতিয়া তোপীকে ধরার জন্য তাঁর পিছন পিছন তাড়া করেছে, যুদ্ধ করেছে— কিন্তু কখনো তাঁকে ধরতে পারে নি। ইংরেজদের বাধার জন্য মারোয়াড় রাজ্যে প্রবেশ করতে পারলেন না তিনি। তখন যুদ্ধের আশা ত্যাগ করে তিনি 'পারানে'র গভীর জঙ্গলে আশ্রয় নিলেন। সঙ্গে শুধু মানসিংহ। এই মানসিংহ-ই তাঁকে ইংরেজের কাছে ধরিয়ে দেয়। ১৮ এপ্রিল ১৮৫৯ সালে সিপ্রিতে তাঁতিয়া তোপীর ফাঁসি হয়।

সকল স্থানেই, বিশেষ করে দিল্লী, কানপুর, ঝাঁসী, এলাহাবাদ প্রভৃতি পুনঃ-উদ্ধারের পর ইংরেজরা বিদ্রোহী সিপাহী ও নিরপরাধ জনসাধারণকে যেভাবে হত্যা করেছিল— ইতিহাসে সেরকম ঘটনা বিরল। ঐ সমূহ হত্যাকাণ্ডকেই প্রকৃতপক্ষে 'কার্নেজ' আখ্যা দেওয়া চলে।

প্রথম দিকে বিদ্রোহী সিপাহীরা কিছুদিন সফলতা লাভ করলেও পরে বিভিন্ন কারণে বিদ্রোহে ভাঁটা পড়ে এল (যদিও কোনো কোনো জায়গায় ১৮৬২ ও ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত এর জের চলেছিল)। ইংরেজরা ক্রমে বিদ্রোহ দমনে তৎপর হয়ে ওঠে। বিদ্রোহীরা হটে যেতে লাগল। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধের আগুন নিভে এল। প্রথম বারো মাসের যুদ্ধে— ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে ত্রিশ হাজার বিদ্রোহী প্রাণ দেন (ইংরেজ ঐতিহাসিক ট্রটার-এর হিসাব)।

বিদ্রোহের আগুন নিভে গেল। শুরু হল সুসভ্য ইংরেজের অত্যাচার— ভীষণ নির্মম। বিদ্রোহীদের ধরে ধরে গুলি করে হত্যা করা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে জনসাধারণকে আতঙ্কিত করার জন্য শহরের মধ্যস্থলে কোনো ফাঁকা জায়গায়— বিদ্রোহীদের শাস্তি দেওয়া হবে এবং যে তা দেখতে না যাবে তারও সাজা হবে— বলে ঢেঁড়া পিটিয়ে দিয়ে, তোপের মুখে বিদ্রোহীদের বেঁধে তোপ দাগা হতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদ্রোহীদের ছিন্নভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাটিতে এসে পড়তে লাগল। এই নারকীয় দৃশ্য ভারতের বিভিন্ন শহরের জনসাধারণকে দেখতে ইংরেজ সেদিন বাধ্য করেছিল।

কানপুরে একটি গুদামে প্রায় তিনশো বিদ্রোহী সিপাহীকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। তিন দিন পর এক-একজন সিপাহীর নাম ধরে ডেকে বের করে এনে তৎক্ষণাৎ গুলি করে মেরে ফেলা হতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে বিদ্রোহীরা এটা টের পেয়ে নাম ধরে ডাকা সত্ত্বেও আর বেবিয়ে আসে না। তখন ইংরেজ সৈন্য সেই গুদামটি আগুনে পুড়িয়ে দেয় একজন বিদ্রোহী সিপাহীও সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন নি— সকলেই প্রাণ দেন। এ ছাড়া শত শত বিদ্রোহী সৈন্যকে গাছে গাছে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছিল দেশের বিভিন্ন জায়গায়। বহুদিন তাদের দেহ সেইভাবেই ঝুলিয়ে রাখা হয়, যাতে এ দৃশ্য দেখে লোকে আর বিদ্রোহী না হয়।

বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়ক— নানাসাহেব চিরতরে আত্মগোপন করলেন, বিদ্রোহের মহামন্ত্রী সুদর্শন বিচক্ষণ আজিমুল্লা

ইংরেজের গুলিতে প্রাণ দিলেন, ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাই ও বিহারের বীর যোদ্ধা কুমার সিং ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ দিলেন, মহাবিদ্রোহের মহান সেনাপতি সুচতুর তাঁতিয়া তোপী কিছুকাল আত্মগোপন করার পর সঙ্গীর বিশ্বাসঘাতকতায় ধৃত হয়ে ফাঁসির রজ্জুতে প্রাণ দিয়ে শহীদ হলেন। বাহাদুর শা' বর্মায় নির্বাসিত হলেন (কলকাতা হয়ে তাঁকে রেঙ্গুনে নিয়ে যাওয়া হয় ১৮৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে, বর্মায় ১৮৬২ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর মৃত্যু হয়।

শেষ হল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধ। প্রাণ দিলেন হাজার-হাজার বিদ্রোহী। "দুই বৎসরে (১৮৫৭-৫৮) অস্ত্রাঘাত, দুঃখ-জনক পরিস্থিতি, দুঃখকষ্ট পরিশ্রম ও বিচারালয়ে প্রাণদণ্ড প্রভৃতির ফলে লক্ষাধিক সিপাহী প্রাণ হারাইয়াছিল। এই দুই বৎসর অন্য যে-সকল বিদ্রোহী নিহত হইয়াছিল তাহাদের সংখ্যা গণনা করিলে নিঃসন্দেহে নিহতের সংখ্যা আরও অধিক।" —L. Trotter, *India under Queen Victoria*, Part II, p. 89 ; সুপ্রকাশ রায়, 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম', পৃ. ৩০০।

শুরু হল বিচারের প্রহসন। বিচারে যাঁরা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন, সঙ্গে সঙ্গেই তা কার্যকরী করা হল। অন্যান্যদের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হল। কিন্তু সমস্যা হল এত অধিক সংখ্যক বন্দীদের কোন্ জেলে রাখা যাবে। দেশের যে-কোনো জেলখানাতেই এঁদের রাখা হোক-না কেন তাঁরা যে ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রচার করবেনই এটা স্বাভাবিক। অবশেষে সিদ্ধান্ত হল : ভারতের—মূল ভূখণ্ড থেকে বহু দূরে, চারিদিক সমুদ্রবেষ্টিত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জেই এই মারাত্মক বিদ্রোহী বন্দীদের রাখা হবে। সেখান থেকে এঁরা পালাতে পারবেন না, এঁদের সঙ্গে দেশের কোনো যোগাযোগও থাকবে না, যাঁদের কথা কেউ কোনোদিন জানতেও পারবে না। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিতদের বিচারের প্রহসনে ক্রমে ক্রমে পাঠানো হতে লাগল সেই ভীষণ আদিম জঙ্গলাকীর্ণ, বৃশ্চিক শঙ্কুল, হিংস্র আদিম মানব-অধ্যুষিত আন্দামান দণ্ডোপনিবেশে। এই বন্দীদের ২০০ জনের প্রথম দলটি জে. এস. ওয়াকার (J. S. Walker)-এর নেতৃত্বে কলকাতা থেকে ৪ মার্চ ১৮৫৮ সালে রওনা হয়ে ১০ মার্চ ১৮৮৫তে পোর্ট ব্লেয়ারে পৌঁছায়। তারপর ১৫১ জন বিদ্রোহী বন্দীকে পাঠানো হল করাচী থেকে— "রোমান এক্সপ্রেস" (Roman Express) ও "এডওয়ার্ড" (Edward) জাহাজে করে—মার্চ-এপ্রিল ১৮৫৮ সালে। এই মহাবিদ্রোহ দমনের কাজ ১৮৬০ সালের পরও

২

চলতে থাকে। আর ১৮৬৪ সালের মধ্যে প্রায় ৩০০০ (তিন হাজার) প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামীকে পাঠানো হয় আন্দামানে। তাঁরা অমানুষিক পরিশ্রম করে প্রতিদিন তিলে তিলে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলেন। আর আন্দামানেই তাঁদের জীবনাবসান হল। যদিও কেউ কেউ ২০/৩৫ বছর বন্দী জীবন যাপন করেছিলেন, দেশে ফিরতে পারেন নি তাঁদের একজনও।

ওয়াকার-এর রিপোর্টে জানা যায় যে ৪ জন পাঞ্জাব বিদ্রোহী আন্দামানে পৌঁছানোর আগেই জাহাজে মারা যান। তাঁদের মধ্যে বিদ্রোহী লোনী সিং (মিতুয়ালী, জেলা সীতাপুর, ইউ.পি.) অনশনে মারা যান।

কে এই মহাবিদ্রোহের বন্দীরা ? কী এঁদের নাম, পরিচয় ? কোথাকার অধিবাসী এঁরা ? এ সম্বন্ধে ইতিহাস প্রায় নীরব। কোনোখানেই এঁদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। যে কয়েকজনের নাম পাওয়া যায় তা আঙুলে গণনা করা যায়।

প্রথম দিকে যাঁদের আন্দামানে পাঠানো হল তাঁদের মধ্যে লোনী সিং এবং আরো ১২ জনের নাম পাওয়া যায় :
১ বাহাদুর সিং, ২ দেবী, ৩ ফুট্টা, ৪ গুলাব খাঁন, ৫ জওহর সিং, ৬ মহীবুল্লা, ৭ মঞ্জুশাহ, ৮ মায়ারাম, ৯ নুরা, ১০ কাইম খাঁন, ১১ সিরাজুদ্দিন— সকলেই মধ্য প্রদেশের সীমার এলাকার লোক। ১২. ভেঙ্কট রাও— মধ্য প্রদেশের রায়-পুরের বাসিন্দা ও আরপুলির জমিদার। তিনি গোণ্ডা, মারিয়া ও রোহিলাদের একত্র করে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এঁরা প্রত্যেকেই আন্দামানে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

আন্দামানে বন্দী অবস্থায় মৃত্যু হয় এমন আরো যে কয়েকজনের নাম পাওয়া যায় তা হল :

১. মৌলবী ফজলুল হক, খয়রাবাদী— (খয়রাবাদ, সীতাপুর, ইউ. পি.) (১৭৯৭-১৮৬১)— দিল্লী রেসিডেন্সির সেরেস্তাদারের পদ ত্যাগ করে তিনি বিদ্রোহী সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দেন। তিনি স্বাধীন দিল্লীর সংবিধান রচনা করে-ছিলেন। বিখ্যাত উর্দু কবি— মির্জা গালিবের বন্ধু ছিলেন তিনি। গালিবের আত্মচরিতে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। দিল্লী ইংরেজদের দখলে আসার কিছু পরে তিনি ধরা পড়েন, বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় এবং আন্দামানে প্রেরিত হন। ২. সিপাহী-বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট বিপ্লবী নায়ক এলাহাবাদের

মৌলভী লিয়াকৎ আলি— ধৃত হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ৩. সৈয়দ আলাউদ্দিন মৌলভী (যিনি পূর্বে হায়দ্রাবাদে ব্রিটিশ রেসিডেন্সি আক্রমণ করে-ছিলেন) ২৮ জুন ১৮৫৯ সালে আন্দামানে প্রেরিত হন। ১৮৮৪ সালে তিনি যখন মুক্তি পাওয়ার মুখে তখন আন্দামানে বন্দী অবস্থায় রহস্যজনকভাবে তাঁর মৃত্যু হয়। ৪. হিমা নোহাল সিং ও ৫. কুরা সিং— পিতাপুত্র (থানভান, মজঃফরপুর, ইউ. পি.) দুজনকেই আন্দামানে পাঠানো হয় এবং পিতা ৩৫ বছর সেখানে অসীম যন্ত্রণা ভোগ করে মারা যান, পুত্রের মৃত্যুর তারিখ জানা যায় না। ৬. উড়িষ্যায় ঘেসের জমিদার— হাট্টা সিং ও তাঁর পরিবারের সকলেই ইংরেজের বিরুদ্ধে ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত যুদ্ধ করেন। তাঁর পিতা, ভ্রাতারা ও বন্ধুগণ ফাঁসিতে মৃত্যু বরণ করেন। কিন্তু হাট্টা সিংকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগের জন্য আন্দামান দণ্ডোপনিবেশে পাঠানো হল। এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। ৭. ভীল সর্দার ভীমা নায়েক (ধোলীবাউলি, বারোনী স্টেট— নিমার, মধ্যপ্রদেশ) তাঁর ভীল সৈন্য বাহিনী নিয়ে তাঁতিয়াতোপীর পাশে থেকে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন ও দুবছর পরে ধরা পড়েন। আন্দামানে বন্দী অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করেন। ৮. গর্ব-দাস প্যাটেল— 'আনন্দ 'এলাকায় প্রধান (কইরা, গুজরাট)— যিনি লোটিয়া ভগল (গুজরাট) এর ব্রিটিশ ক্যাম্প আক্রমণ করে বিখ্যাত হয়েছিলেন, তিনিও ধরা পড়ে আন্দামানে প্রেরিত হন।

গবর্নমেণ্টের কাছে লেখা ওয়াকার সাহেবের চিঠি থেকে জানা যায় যে আন্দামানে প্রেরিত হবার চারদিন পরেই (অর্থাৎ ১৪ মার্চ, ১৮৫৮) কয়েদী নং ৬১ নারায়ণ সিং, চ্যাটহ্যাম দ্বীপ থেকে আর-এক দ্বীপে নিয়ে যাবার সময়, নৌকা থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার দিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে গুলি করে তাঁর গতি পরিবর্তন করানো হয়। ধরা পড়ে তৎক্ষণাৎ তাঁর বিচার হয় ও সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ফাঁসি হয়। আরো জানা যায় যে কয়েদী নং ৪৬ নিরঞ্জন সিং ঐ দিন রস্ দ্বীপে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করেন, কারণ অজ্ঞাত।

একজন বিদ্রোহী বন্দী— মীরজাফর আলী থানেশ্বরী সম্বন্ধে শোনা যায় যে তিনি আন্দামানে ২০ বছর কারাদণ্ড ভোগ করার পর মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে-ছিলেন। তিনিই হয়তো একমাত্র ব্যক্তি যিনি আন্দামান থেকে— যেখানে বন্দীদের মৃত্যুই কেবল মাত্র মুক্তি দিতে পারে— সেখান থেকে ফিরতে পেরেছিলেন। আরো কয়েকজন মুষ্টিমেয় বন্দী মুক্তি পাবার পর আন্দামানেই সংসার করে জীবন

শেষ করেন বলে শোনা যায় কিন্তু এ-সব শোনা কথায় কোনো তথ্যভিত্তিক প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আন্দামান দণ্ডোপোনিবেশে বন্দী অবস্থায় মারা যান এমন আরো কয়েকজনের নাম— (১৮৫৮-৬০ সালের মধ্যে)— ১. দুতি রাম বড়ুয়া, ২. বাহাদুর গাঁওবুড়া, ৩. সেখ ফরমুদ আলী, ৪. মধু মল্লিক— এঁরা সকলেই আসামের অধিবাসী।

আন্দামানে বন্দীজীবন যাপন করার জন্য প্রেরিত হবার ছয় সপ্তাহের মধ্যেই দুধনাথ তেওয়ারী ও আরো নব্বই জন বন্দী ২৩ এপ্রিল, ১৮৫৮-তে রসদ্বীপ থেকে গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায়। দুধনাথ তেওয়ারী বাদে আর-সকলেই আদিবাসীদের হাতে ও খাদ্যাভাবে মারা যায়। দুধনাথ তেওয়ারীকে আদিবাসীরা ধরে নিয়ে যায় ও এক আদিবাসী মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দেয়।

১৮৫৮ সালের মার্চ এপ্রিল মাসে আন্দামান থেকে সিপাহীবন্দী ২২৮ জন জঙ্গলে পালিয়ে যান। তাঁদের মধ্যে ৮৮ জন ধরা পড়েন আর বাকী সকলেই— মাত্র একজন বাদে— আদিবাসীদের হাতে, অসুখে ক্ষুধা তৃষ্ণায় জঙ্গলে মারা পড়েন। যে ৮৮ জন ধরা পড়লেন— তাঁদের মধ্যে একজন হাসপাতালে আত্মহত্যা করেন। বাকী ৮৭ জনকে ওয়াকার সাহেব একই দিনে তৎক্ষণাৎ গাছে গাছে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেন। বহুদিন দেহগুলি গাছেই ঝুলতে থাকে। বন্দীদের মনে ভীতি প্রদর্শনের জন্যই এই ব্যবস্থা হয়েছিল। পলাতক বন্দীদের মধ্যে যিনি আদিবাসীদের হাতে ধরা না পড়ে অশেষ কষ্টে কোনোরকমে তিনদিন অভুক্ত থেকে ব্রিটিশ ক্যাম্পে ফিরে আসেন, তাঁর ভাগ্যও মৃতদের থেকে কিছু ভালো ছিল না। তাঁর সারা শরীরে এমন-কি চোখের পাতায় ও কানে জঙ্গলের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটে আচ্ছন্ন হয়েছিল— কিছুতেই সেগুলি থেকে মুক্ত করা সম্ভব হয় নি।

পূর্বোল্লিখিত দুধনাথ তেওয়ারী একবছর পর ফিরে এসে আন্দামানের আদিবাসীদের অ্যাবার্ডিনের ব্রিটিশ ক্যাম্প আক্রমণের প্রস্তুতির কথা ইংরেজদের বলে দেয়। ৬ এপ্রিল ১৮৫৯ সালে প্রায় ২০০ আন্দামানী আদিবাসী অ্যাবার্ডিন-এ ইংরেজ ব্যারাক-জেল তীর ধনুক নিয়ে আক্রমণ করে। বহু কয়েদী তাদের হাতে প্রাণ হারায়। ইংরেজের গুলিতে পর্যুদস্ত হয়ে তারা পালিয়ে যায়। পূর্বে সতর্কিত হওয়াতে ইংরেজদের সুবিধা হয়েছিল। ১৪ এপ্রিল ১৮৫৯ সালে আবার আন্দামানীরা আক্রমণ করে। এবার তাদের সংখ্যা প্রায় ১৫০০। কিছু বন্দী সিপাহীও আগের বারের মতো এবারও নিহত হয়। ইংরেজদের ওপর বেশি

হামলা হয়। বিফল হয়ে তারা এবারও পালিয়ে গেল। আবার আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে আন্দামানীরা ১৬ মে ১৮৫৯ সালে সন্ধ্যা নাগাদ পোর্ট ব্লেয়ারের দিকে এগোতে থাকে। তারা বিভিন্ন দিক থেকে এসে অ্যাবার্ডিন-এর তিন কিলোমিটার দূরে অপেক্ষা করতে থাকে। ১৭ মে ১৮৫৯-এর সকালে তারা আক্রমণ শুরু করে। এবার বেড়ী হাতকড়িতে বাঁধা বিদ্রোহী সিপাহী বন্দীদের দিকে তারা নজর দিল না। মুক্ত কয়েদী ও ইংরেজদের দিকে তাদের লক্ষ্য। তীর ধনুকের সঙ্গে ইংরেজের বন্দুকের গুলির যুদ্ধ। তুমুল যুদ্ধে বহু সাধারণ কয়েদী মারা গেল। নিহত হল ইংরেজপক্ষের অনেক সামরিক পুলিস। আর আত্মদান করল অসংখ্য আন্দামানী আদিবাসী, যারা ব্রিটিশের বারুদের চোখ-রাঙানি সহ্য করে নি। এই হল ইতিহাসে বিখ্যাত অ্যাবার্ডিন-এর যুদ্ধ। দুধনাথ তেওয়ারী দ্বারা আগে থেকে সতর্কিত হওয়ায় ইংরেজ পক্ষ জয়ী হতে পেরেছিল। দুধনাথ তার কাজের পুরস্কার স্বরূপ মুক্তি পায়। তার সম্বন্ধে আর-কিছু জানা যায় না।

পয়লা এপ্রিল ১৮৫৯ সালে আন্দামান দণ্ডোপনিবেশের সুপারিন্টেনডেণ্ট ওয়াকার-কে মেরে ফেলার জন্য বন্দী সিপাহীরা চেষ্টা করে কিন্তু পূর্বেই সতর্কিত হওয়ায় তাঁর প্রাণ রক্ষা পায়।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন দ্বীপের জেলে ব্যারাকে এই সিপাহী বন্দীদের বিভক্তভাবে রাখা হত। তাঁদের তত্ত্বাবধানে থাকত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত সাধারণ কয়েদীরা, তাদের ওপরে থাকত সামরিক পুলিস। কী রকম জীবন যাপন করতে হত তাঁদের? সাত-আট জন বন্দীর এক-একটি দলকে চালনা করত হাতে বেত নিয়ে এক-একজন ঐ কয়েদী, আবার ঐ কয়েদীদের তত্ত্বাবধানে তাঁদের আন্দামানের আদিম বিরাট বড়ো বড়ো গাছ কেটে জঙ্গল পরিষ্কার করতে হত। তাঁদের পায়ে থাকত লোহার বেড়ী, যাতে পালাতে না পারে কেউ। এই-সব বড়ো বড়ো গাছ কাটা যে কিরকম কষ্টসাধ্য তা কল্পনায় আনা যায় না। তাঁরা বেশির ভাগই সৈনিক জীবনের কঠোরতায় অভ্যস্ত ছিলেন, তথাপি তাঁদের কাছে এই আদিম গাছ কাটায় পরিশ্রম অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। বড়ো বড়ো মোটা মোটা লতার বন্ধনে আবদ্ধ সেগুলি, কাটা হলেও ঝুলতে থাকত, মাটিতে পড়ত না। লতা কেটে সেই গাছ টেনে জঙ্গল পরিষ্কার করে বের করাও এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। জঙ্গলে কোনো রাস্তা নেই— কোনো রকমে সেই বিশাল বিশাল গাছ কেটে

টেনে নামিয়ে ঠিক জায়গায় স্তূপ করা কী ভীষণ কষ্টকর পরিশ্রমের কাজ তা ভাবা যায় না। তার ওপর একটু এদিক-ওদিক হলেই খবরদারী করা সেই কয়েদীর হাতের চাবুক পড়ত তাঁদের পিঠে। এই গাছ কাটা ও পাহাড়ের পাথর ভাঙা ও চুন ভাঙার কাজও করতে হত তাঁদের।

এই রকম কাজই করতে হয়েছে বিদ্রোহী বন্দীদের দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, যতদিন না মৃত্যু এসে তাঁদের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছে। ভাবলে শিউরে উঠতে হয় যে কোনো সভ্যজাত, আদিম ক্রীতদাসের মতো তাঁদের শরীরের সব শক্তি নিংড়ে নিয়েছিল এইভাবে। পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, দেশে ফেরার আশা ত্যাগ করে, পেটভরে না খেতে পেয়ে— সভ্যতার আলোক থেকে আদিম অন্ধকারে ফিরে গিয়ে, সবসময় কর্তৃপক্ষের গালাগালি, প্রহার খেয়ে জীবনের অবশিষ্ট কাল ক্রীতদাসের জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরা। তারপর একদিন সেই আন্দামানেই মৃত্যু এসে সব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছিল এঁদের। দেশপ্রেম, দেশকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করার জন্য এই তাঁদের পুরস্কার। দেশবাসী আজ তাঁদের নাম জানে না, পরিচয় জানে না, তাঁদের সম্বন্ধে কিছুই জানে না। এই বন্দী সিপাহীরা যে একদিন বিদেশী শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করার জন্য অস্ত্র ধারণ করেছিলেন, জীবন পণ করে ইংরেজের সঙ্গে সারা ভারতে অসংখ্য বার বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, কৃতজ্ঞ চিত্তে একথা স্মরণ করা ছাড়া ভারতবাসীর কি আজ আর কিছুই করার নেই?

কী খেতেন আর কেমন করে খেতেন তাঁরা? প্রত্যেকে খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদের খরচ সহ দৈনিক এক আনা নয় পাই করে পেতেন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। যে-সব দ্বীপে জেল-ব্যারাক ছিল, সেখানে সরকার থেকে একটি করে দোকান খোলা হয়েছিল খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রয়ের জন্য। বন্দীদের সাত-আট জনের এক-একটি দলের মধ্যে একজন বন্দী পাহারাদারের তত্ত্বাবধানে থেকে রান্না করত কোনোরকমে। তাই দুবেলা তাঁরা খেতেন সামান্য ভাত, ডাল বা রুটি ও লতাপাতার একটু তরকারী। এইভাবে আধপেটো খেয়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তাঁদের কাটাতে হয়েছে। নিকৃষ্ট সাধারণ কয়েদীর ও কর্তৃপক্ষের প্রহার ও অশ্রাব্য অকথ্য গালাগালি তাঁদের দৈনিক উপরি পাওনা ছিল। প্রতিদিন যে ভাবে তিলে তিলে মানসিক ও দৈহিক মৃত্যু তাঁরা বরণ করেছিলেন দেশকে ভালোবেসে— স্বাধীনতার জন্য, পৃথিবীর ইতিহাসে সে

দৃষ্টান্ত বিরল। আর এ শাস্তি যারা দিয়েছিল, তারা আর যাই হোক সভ্য বা সভ্যতার বড়াই করতে পারে না।

এক আনা নয় পাই তো কোনো প্রকারে আধপেটা খেতেই চলে যেত। জামাকাপড় আর কারো কেনা হত না। শেষ পর্যন্ত এমন হয়েছিল যে প্রত্যেকের মাত্র একখানা বা আধখানা কম্বল ছিল। তাই দিয়ে লজ্জা নিবারণ করতে হত। তাও আবার যখন ক্রমাগত বৃষ্টিতে ভিজে যেত তখন কল্পনাতীত অবস্থা।

সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রমে গাছ কেটে ক্লান্ত হয়ে জেল ব্যারাকে এসে শয়নের সময়ও তাঁদের অনেকের পায়েই লোহার বেড়ী থাকত। পা কেটে যেত; চলাফেরা করাই কষ্টকর ছিল। সেখানে আইনকানুন বলে কিছু ছিল না। সুপার ওয়াকার-এর ইচ্ছাই সেখানকার আইন ছিল। বর্বর সাধারণ কয়েদীদের নালিশে যখন তখন যাকে খুশি এনে বেত মেরে, পায়ে বেড়ী ও হাতে হাতকড়ি দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা, না খেতে দেওয়া বা অতি অল্প খেতে দেওয়া প্রভৃতি শাস্তি ওয়াকার-এর দৈনিক কার্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এইভাবে অশেষ কষ্ট, যন্ত্রণা ভোগ করে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধের দু-তিন হাজার স্বাধীনতা সংগ্রামী শহীদের মৃত্যু বরণ করলেন আন্দামান দণ্ডোপ-নিবেশে। তাঁদের যে ক'টি মাত্র নাম জানা যায় তা হল :

আসাম

১. বাহাদুর গাঁওবুড়া
২. দুতিরাম বড়ুয়া
৩. মধু মল্লিক
৪. সেখ ফরমুদ আলী

বিহার

৫. নারায়ণ

গুজরাট

৬. গর্বদাস প্যাটেল

হায়দ্রাবাদ

৭. সৈয়দ আলাউদ্দিন মৌলভী

মধ্যপ্রদেশ

৮. বাহাদুর সিং
৯. ভীমা নায়েক
১০. দেবী
১১. ফুট্টা
১২. গুলাব খাঁ
১৩. জওহর সিং
১৪. মহীবুল্লা

১৫. মজনু শা
১৬. মায়ারাম
১৭. ঝুরা
১৮. কইম খাঁ
১৯. সিরাজুদ্দিন
২০. ভেঙ্কট রাও

ওড়িশা

২১. হাট্টা সিং

উত্তরপ্রদেশ

২২. আল্লামা ফজল হক
২৩. হীমানোহাল সিং
২৪. জুরা সিং
২৫. মৌলভী লিয়াকৎ আলি
২৬. লোনী সিং
২৭. দুধনাথ তেওয়ারী
২৮. মীরজাফর আলী থানেশ্বরী
২৯. নিরঞ্জন সিং

সিপাহীযুদ্ধের কয়েকজন বিশিষ্ট নায়ক

১. মঙ্গল পাণ্ডে :

ব্যারাকপুর ইংরেজ সেনানিবাসের বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রির ৩৪নং রেজিমেণ্টের অন্তর্গত ৫ নং কোম্পানির ১৪৪৬ নং সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রথম শহীদ। চর্বি-টোটা ব্যবহার করার ব্যাপারে, বহরমপুরে বন্দী বিদ্রোহী সিপাহীদের ব্যারাকপুরে আনা হচ্ছে ও কলকাতায় অনেক গোরা সৈন্য এসেছে—শুনে উত্তেজিত মঙ্গল পাণ্ডে ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ, রবিবার বিকালে, নিজের গোশাক পরে, অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ব্যারাকের বাইরে এসে তাঁর সহকর্মীদের তাঁর সঙ্গে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে আহ্বান জানান। কিন্তু কেউ তাঁর সঙ্গে যোগ দিল না। খবর পেয়ে লেঃ বগ ঘোড়ায় চেপে সেখানে আসেন। মঙ্গল পাণ্ডের গুলিতে লেঃ বগের ঘোড়াটি মারা যায়। মঙ্গল পাণ্ডেকে মারার জন্য লেঃ বগের পিস্তলের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তার আগে মঙ্গলপাণ্ডে একজন সার্জেন্ট মেজরকে গুলি করেন, কিন্তু গুলি তার গায়ে লাগে নি তখন ঐ দুইজন ইংরেজ অফিসার তরোয়াল নিয়ে মঙ্গল পাণ্ডেকে আক্রমণ করে। মঙ্গল পাণ্ডেও একটি তরোয়াল দিয়ে যুদ্ধ করে তাঁদের ক্ষত বিক্ষত করেন। সাহেবদের অবধারিত মৃত্যুর মুখে শেখ পল্টু নামে একজন সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডেকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে জেনারেল হিয়ারসে এসে দেখেন যে সব সিপাহীরাই নীরব দর্শক। মঙ্গল পাণ্ডে শেখ পল্টুর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নির্ভীকভাবে পায়চারী করছেন আর সিপাহীদের তাঁর সঙ্গে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে আহ্বান করছেন। জেনারেল অগ্রসর হলে—মঙ্গল পাণ্ডে বন্দুক মাটিতে রেখে পা দিয়ে ঘোড়া টিপে নিজের বুকে গুলি করেন। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আরোগ্য লাভের পর সামরিক বিচারে তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়। ৮ এপ্রিল ১৮৫৭ সালে সর্বজনসমক্ষে মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি হয় ব্যারাকপুর সেনা নিবাসেই।

২. ধুন্ধুপন্থ নানা সাহেব :

মহারাষ্ট্রের মাথেরন পর্বতের পাদদেশে বেণুগ্রামে দরিদ্র নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ দম্পতি— নারায়ণ ভট্ট ও গঙ্গাবাই-এর পুত্র নানা সাহেব। ১৮২৪ খৃস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাও কানপুরের বিঠুরে নির্বাসিত হবার পর মাধব রাও সপরিবারে বিঠুরে এসে বাস করতে থাকেন। ১৮২৭ সালের ৭ জুন নিঃসন্তান দ্বিতীয় বাজীরাও নানা সাহেবকে দত্তক গ্রহণ করেন। ইংরেজ শিক্ষকদের দ্বারা সুশিক্ষিত নানা সাহেব অতিমার্জিত ও রুচিশীল ছিলেন। ইংরেজরা তাঁকে খুবই পছন্দ করত। ১৮৫১ সালে দ্বিতীয় বাজীরাও-এর মৃত্যুর পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দ্বিতীয় বাজীরাও-এর বার্ষিক ভাতা আট লক্ষ টাকা নানাসাহেবকে দিতে অস্বীকার করে। নানা সাহেব বহু চেষ্টা করেও বিফল হন। তিনি ব্রিটিশ-বিরোধী হয়ে ওঠেন। বাইরে তিনি ইংরেজদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার বজায় রাখতেন। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের মহানায়ক এই ধুন্ধুপন্থ নানা সাহেব। বিঠুরে তাঁর দরবার গৃহে বসেই তিনি এই বিপ্লবের নিখুঁত পরিকল্পনা করেন। ইংরেজরা বহু পরে নানা সাহেবকে বুঝতে পারে। তখন ইংরেজদের কাছে নানা সাহেব ছিলেন মূর্তিমান আতঙ্ক। শৌর্যে, বীর্যে, চরিত্রে— অতুলনীয় নানা সাহেব সারা ভারতবাসীর গৌরব। যখন তিনি দেখলেন ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে আর জয়ের আশা নেই তখনই তিনি চিরতরে আত্মগোপন করেন। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট সমস্ত শক্তি দিয়ে খুঁজেও নানা সাহেবকে ধরতে পারে নি। কিংবদন্তী নেপালের গহন জঙ্গলে তিনি দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন।

৩. তাঁতিয়া তোপী :

ভারতের প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধের মহান সেনাপতি। প্রকৃত নাম রঘুনাথ। পিতা— পাণ্ডুরং ভাট। জন্মস্থান মহারাষ্ট্র। জন্মকাল— ১৮১২ সাল। মহারাষ্ট্র থেকে বিঠুরে এসে বাস করতে থাকেন। তাঁর সামরিক প্রতিভার পরিচয় পেয়ে নানা সাহেব তাঁকে বিঠুর প্রাসাদে নিয়ে এসে সৈন্য বিভাগের উচ্চ কর্মে নিযুক্ত করেন। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহে ইংরেজের সঙ্গে বহু যুদ্ধে জয়ী ও পরাজিত গেরিলাযুদ্ধে পারদর্শী পৃথিবীর সমর নায়কদের অন্যতম, অক্লান্ত যোদ্ধা, ইংরেজের ত্রাস, তাঁতিয়া তোপীর স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতার জন্য তাঁর আত্মবলিদান ভারতবাসীর কাছে চিরদিনের গর্বের বিষয়। ১৮৫৯ সালের ২২ জানুয়ারি শিকাহারার যুদ্ধই

তাঁতিয়া তোপীর শেষ বড়ো যুদ্ধ। ইংরেজ সেনাপতি ও সৈন্যরা মধ্যভারত চষে ফেলেছিলেন তাঁকে ধরবার জন্য। কিন্তু ধরতে পারে নি। অবশেষে মাড়ওয়াড়ের কাছে 'পেরাইনের' গভীর জঙ্গলে যখন তিনি আত্মগোপন করেছিলেন— তখন তাঁর একমাত্র সঙ্গী নরবরের সর্দার মানসিংহ তাঁকে ইংরেজের হাতে ধরিয়ে দেয়— গভীর রাত্রে-ঘুমন্ত অবস্থায়— ৭ এপ্রিল ১৮৫৯। জেনারেল মীডের শিবিরে তাঁকে আনা হয় ৮ এপ্রিল ১৮৫৯-এ। তাঁর বিচার হয় সিপ্রির সামরিক আদালতে। অভিযোগ ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রতি আনুগত্যের অভাব, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও কানপুরের নিরপরাধ ইংরেজ স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে হত্যা। তৃতীয় অভিযোগটি উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে প্রত্যাহৃত হয়। বিচারের সময় তাঁতিয়া তোপী একটি জবানবন্দী দেন। জেনারেল মীড এই জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন।

"ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রতি আমার কখনো আনুগত্য ছিল না। কারণ আমি কোনো দিন ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রজা ছিলাম না, এমন-কি ব্রিটিশ-অধিকৃত অঞ্চলের নাগরিকও ছিলাম না। ইংরেজের অধিকারে আমার জন্ম হয় নাই। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে যখন আমার জন্ম হয়, তখন আমার প্রভু পশ্চিম ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অংশের অধিপতি ছিলেন। যে জাতি আমার প্রভুকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছে সেই জাতির প্রতি আমার কোনো আনুগত্যই থাকিতে পারে না। আমার আনুগত্য একমাত্র পেশওয়াদের প্রতি এবং সেই আনুগত্যের প্রশ্নে একমাত্র তাঁহারাই আমার বিচার করিতে পারেন। অন্য কেহ নহে। কাজেই আমার বিরুদ্ধে আনুগত্য-হীনতার অভিযোগ টিঁকিতে পারে না। আদালতের দ্বিতীয় অভিযোগ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আমি স্বীকার করিতেছি যে আমি ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছি। কিন্তু এই অভিযোগের জন্য আমাকে যে দণ্ড দেওয়া হইবে, যাঁহারা আমার বিচার করিতেছেন তাঁহাদের প্রতিও সেই দণ্ড বিধান হওয়া উচিত। তাঁহাদের বিরুদ্ধেও ভারতবাসী গুরুতর অভিযোগ আনিতে পারে— কুশাসনের অভিযোগ, পররাজ্য গ্রাসের অভিযোগ, প্রজার সম্পত্তি লুণ্ঠনের অভিযোগ— ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রতিনিধি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে ভারতবাসী আজ এই সব অভিযোগ অনায়াসেই আনিতে পারে এবং এইগুলি প্রমাণ করা তাহাদের পক্ষে আদৌ কঠিন নহে। ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যদি অপরাধ হইয়া থাকে, সে অপরাধ আমি সগৌরবে স্বীকার করিতেছি। আমি কখনো নরহত্যায় লিপ্ত হই নাই। আমি যাবতীয় বিষয়ে আমার প্রতিপালক প্রভু নানা সাহেবের আদেশ পালন করিয়াছি। আমাকে

যদি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমার অনুরোধ, আমাকে যেন বীরের মতো তোপের মুখে মরিতে দেওয়া হয়।"

—মণি বাগচী, 'সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস', পরিশিষ্ট : খ।

সেই সামরিক আদালতে তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়। ১৮ এপ্রিল ১৮৫৯ সালের সন্ধ্যায় সিপ্রিতে তাঁতিয়া তোপীর ফাঁসি হয়।

'যে জেনারেল মীড তাঁকে ফাঁসি দিয়েছিলেন, তিনি পর্যন্ত মৃত্যুকালে তাঁতিয়ার সাহস দেখে বিচলিত হয়েছিলেন।' মিচেল এই প্রসঙ্গে লিখেছেন,

"সাহস ও গর্বের সঙ্গেই তাঁতিয়া তোপী বধ্যমঞ্চে আরোহণ করিলেন। বিদ্রোহে তাঁহার যে ভূমিকা ছিল তাহাতে কৃতকার্যতা সম্বন্ধে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। চক্ষু বন্ধ না করিয়াই তিনি ফাঁসির রজ্জু নিজের হাতে গলায় দিয়াছিলেন···।"

—মণি বাগচি, 'সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস', পৃ. ৩৫৫।

৪. কুমার সিংহ :

গেরিলা যোদ্ধা, ৮০ বছর বয়স্ক কুমার সিংহ বিহারের আরা জেলার জগদীশপুরের জমিদার। সিপাহীবিদ্রোহে ইংরেজদের সঙ্গে বহু যুদ্ধের এই বিদ্রোহী নায়ক যুদ্ধে গুরুতর আহত হয়ে জগদীশপুরে এসে নিজ বাড়িতে মারা যান— ২৬ এপ্রিল ১৮৫৬ খৃ.।

৫. ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাই :

মৃত্যু ১৭ জুন ১৮৫৮ খৃ. সম্মুখ যুদ্ধে। পূর্বেই এই বীরাঙ্গনা সম্বন্ধে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। এতএব পুনরুল্লেখ অবাঞ্ছিত। তিনি ভারতীয়দের মনে কত শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয় তার একটি উদাহরণ নেতাজী কর্তৃক অজাদ-হিন্দ ফৌজের নারী বাহিনীর নামকরণ করেন—'ঝাঁসীর রানী বাহিনী'।

৬. বেগম হজরত মহল :

অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলীর পত্নী। ওয়াজেদ আলী পূর্বেই রাজ্যচ্যুত হয়ে কলকাতায় নির্বাসিত হন। সিপাহীযুদ্ধের সময় তিনি বন্দী হয়ে ফোর্ট উইলিয়মে কারারুদ্ধ থাকেন। বেগম হজরত মহল অযোধ্যা ও লক্ষ্মৌর বিদ্রোহ যুদ্ধে বিশেষ

কৃতিত্ব দেখান। বিদ্রোহের শেষ পর্যায়ে তিনি নেপালের জঙ্গলে পালিয়ে যান। তাঁর সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না।

৭. বয়ৎ খাঁ :

বেরিলী-বিদ্রোহের নায়ক। তিনি বেরিলীর বিদ্রোহী সিপাহীদের দিল্লী নিয়ে যান। কোম্পানির সেনাদলে তিনি একজন সুবেদার ছিলেন। দিল্লী অধিকার করার পর সম্রাট বাহাদুর শা' তাঁকে জেনারেল উপাধি দিয়ে সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব প্রদান করেন। দিল্লীতে যে 'সিপাহী কমিটি' প্রকৃতপক্ষে শাসন ক্ষমতায় ছিল, তিনি তাঁর নেতৃত্বে করতেন। ১৮৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিদ্রোহীদের হাত থেকে দিল্লীর পতন হলে তিনি লক্ষ্ণৌ-এ চলে আসেন। ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। ব্রিটিশ সৈন্যর সঙ্গে এক যুদ্ধে জেনারেল বয়ৎ খাঁ মারা যান ১৩ মে ১৮৫৯ সালে।

৮. মৌলভী আহাম্মদ উল্লা (ফৈজাবাদ) :

অযোধ্যা ও লক্ষ্ণৌ-এর সিপাহী বিদ্রোহের নায়ক ইনি। পূর্বে মাদ্রাজের বাসিন্দা ছিলেন। সেখানে সশস্ত্র বিপ্লবের বাণী প্রচার করতে থাকেন। জানুয়ারি ১৮৫৭-য় তিনি ফৈজাবাদের দিকে চলে আসেন। তখন তাঁর ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচার থামাবার জন্য সরকার তাঁর বিরুদ্ধে এক কোম্পানি ইংরেজ সৈন্য পাঠায় তাদের সঙ্গে আহাম্মদ উল্লার সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ হয়। মহাবিদ্রোহের একজন প্রথম সারির নেতা ছিলেন তিনি। ইংরেজদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধে যোগ দিয়ে সিপাহীদের উৎসাহিত করেছেন তাঁর বক্তৃতায়, ও সৈন্য পরিচালনাও করেছেন। তাঁর সঙ্গে লস্কর শাহ নামে এক ফকিরও যোগ দিয়েছিল। লক্ষ্ণৌতে পরাজিত হবার পর তিনি রোহিলা-খণ্ডে আসেন। সেখানে 'পোয়াইনের' রাজা জগন্নাথ সিংহের ভ্রাতার বিশ্বাস-ঘাতকতার ফলে ১৮৫৮ সালের জুন মাসের প্রথম দিকে ইংরেজ-ত্রাস এই মৌলভী আহাম্মদ উল্লা প্রাণ হারান। তখন ব্রিটিশ সরকার তাঁর মাথার দাম ধার্য করেছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা। বিশ্বাসঘাতক রাজা এঁর ছিন্ন মস্তকের বিনিময়ে শাহাজান-পুরের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে ঐ টাকা পুরস্কার পান। ইংরেজ ঐতিহাসিক ম্যালিসন তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন : **"If a patriot is a man who plots and fights for the independence wrongfully destroyed, of his**

native Country, then most certainly the Maulavi was a true patriot... He had faught manfully, honourably and stubbornly in the field against the strangers who had seized his Country, and his memory is entitled to respect of the brave and the true hearted of all nations."

—*Modern India*, G.O.I. Publications.

৯. মৌলভী লিয়াকৎ আলী :

এলাহাবাদের চক্রবাগের মৌলভী লিয়াকৎ আলীর প্রচেষ্টায় মহাবিদ্রোহের সময় এলাহাবাদে ভীষণ ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচারিত হয়। বিভিন্ন স্থানে ও যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে তিনি ব্রিটিশ-বিরোধী জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে সিপাহী ও জনসাধারণকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করতেন। বিদ্রোহের শেষ পর্যায়ে জয়ের আশা নাই দেখে তিনি মক্কা যাবার জন্য বোম্বাই যান। জাহাজে ওঠার মুখে ইংরেজ সেনা তাঁকে গ্রেপ্তার করে। কোর্ট মার্শালের বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। তিনি বন্দী হিসাবে আন্দামানে প্রেরিত হন। অশেষ দুঃখকষ্টের মধ্যে বন্দী অবস্থায় আন্দামানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

১০. আজিমুল্লা খাঁন :

বাল্যকালে কানপুরে এক রেস্তোরাঁতে পরিচায়কের কাজ করতেন। খুবই বুদ্ধিমান ও রুচিশীল দেখে তাঁকে এক ইংরেজ সাহেব নিজ বাড়িতে নিয়ে যান কাজ করার জন্য। সেই সাহেব তাঁকে ইংরেজী, ফরাসী ও উর্দু ভাষা ভালোভাবে পড়ান, আজিমুল্লাও সেই-সব ভাষায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে থাকেন। নানা সাহেব আজিমুল্লার বুদ্ধিমত্তার কথা শুনে তাঁকে বিঠুরে এনে নিজ পরামর্শদাতা রূপে নিযুক্ত করেন। আজিমুল্লা যেমন সুদর্শন ও মার্জিত, রুচিশীল ছিলেন, তেমনি ছিলেন বিচক্ষণ, কঠোর ও আপসহীন সংগ্রামী। ১৮৫৩ সালের গ্রীষ্মকালে নানা সাহেব আজিমুল্লাকে তাঁর দূত নিযুক্ত করে ইংল্যাণ্ডে পাঠান, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরস ও ইংল্যাণ্ডের রানীর কাছে, তাঁর পিতা দ্বিতীয় বাজীরাও-এর বৃত্তি তাঁকে মঞ্জুর করার জন্য। কিন্তু সে প্রচেষ্টা বিফল হয়। আজিমুল্লা তখনই দেশে না ফিরে ফ্রান্স, তুরস্ক ও রাশিয়া

যান ভারতের আসন্ন বিপ্লবে সাহায্য জোগাড় করার জন্য। তিনি ক্রিমিয়ার যুদ্ধেও গিয়েছিলেন ও সেখানে—'লণ্ডন টাইম্‌সে'র সংবাদদাতা W. H. Russel-এর সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হন রাসেল। যুদ্ধক্ষেত্রে রাসেলের তাঁবুতেই ছিলেন তিনি। পরে এই সাংবাদিক মহাবিদ্রোহের সময় ভারতে 'লণ্ডন টাইমস্' পত্রিকার প্রতিনিধি হয়ে আসেন ও বিদ্রোহ সম্বন্ধে নানা খবর সেই পত্রিকায় পাঠান, তাতে বিপ্লবে আজিমুল্লার ভূমিকা সম্বন্ধেও অনেক খবর ছাপা হয়। নানাসাহেব আজিমুল্লার পরামর্শ মতোই কাজ করতেন। শেষবার যখন ইংরেজের হাতে কানপুরের পতন হয়, রাস্তায় ও বাড়িতে বাড়িতে তুমুল যুদ্ধ হওয়ার সময় ইংরেজের গুলিতে আজিমুল্লার মৃত্যু হয়।

১১. বাহাদুর শাহ :

অশীতিপর বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহকে ইংরেজ ইতিহাস দুর্বল বলেই প্রচার করে এসেছে। মহাবিদ্রোহের আগে তাঁর দরবার কক্ষে যখন এই মহাবিদ্রোহের মন্ত্রণা সভা বসে তখন কিন্তু তাঁর কোনো দুর্বলতা দেখা যায় নি। বেরিলীর সিপাহীরা প্রথম বিদ্রোহের পর দিল্লীতে বাহাদুর শাহর প্রাসাদের নীচে জমায়েত হয়ে, তাঁকে বিদ্রোহের নেতৃত্ব নিতে অনুরোধ করেন— সেদিনও তাঁর কোনো দুর্বলতা দেখা যায় নাই। সানন্দেই তিনি এই মহাবিদ্রোহের সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন, বিদ্রোহীদের জন্য প্রাসাদ উন্মুক্ত করে দেন। দিল্লীতে তাঁর প্রাসাদে শেষ পর্যন্ত প্রায় কুড়ি হাজার হিন্দু-মুসলমান বিদ্রোহী সৈন্য ছিল। তাঁদের কাছে তিনি প্রায়ই যেতেন ও উৎসাহিত করতেন। এই বিশাল বাহিনীর খরচের জন্য তিনি মোগল প্রাসাদের বহু মণি মুক্তা জহরৎ ও সোনা-রুপার জিনিস বিক্রি করে তাঁদের দিয়েছিলেন-- তখনও তাঁর কোনো দুর্বলতা দেখা দেয় নি। যেদিন ব্রিটিশের হাতে দিল্লীর পতন হয়— সেই শেষ যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য এই বৃদ্ধ সম্রাট অশ্বপৃষ্ঠে খোলা তরোয়াল হাতে বিদ্রোহী সিপাহী বাহিনীকে নেতৃত্ব দেবার জন্য প্রাসাদ থেকে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অনুচরদিগের বিশেষ অনুরোধে সে কার্য থেকে তিনি বিরত হন। দিল্লীর পতনের পর সম্রাট বাহাদুর শাহ তাঁর পরিবারের কিছু ব্যক্তি সহ হুমায়ুনের কবরে আশ্রয় নেন। সেখান থেকে ইংরেজ তাঁদের গ্রেপ্তার করে আনে। প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও ইংরেজরা সেদিন তাঁর দুই পুত্র ও দুই পৌত্রকে দিল্লী গেটের সামনে গুলি করেও ফাঁসি দিয়ে হত্যা

করে। বাহাদুর শাহর এক পৌত্র বিপ্লবের সাহায্যের জন্য মক্কা ও অন্যান্য রাষ্ট্রে গমন করেন। বিপ্লব চলা কালীন অবস্থায় কিন্তু তিনি আর ফিরে আসতে পারেন নি। বহু বছর পর মক্কায় তিনি প্রাণত্যাগ করেন। দিল্লির প্রাসাদে সম্রাট বাহাদুর শাহর বিচার করল ইংরেজরা। বিচারে বাহাদুর শাহর ফাঁসীর হুকুম হল, কিন্তু সম্রাট বলে তাঁকে অনুকম্পা প্রদর্শন করে পত্নিসহ তাঁকে ভারত থেকে নির্বাসিত করা হল বর্মায়। কলকাতা হয়ে তাঁদের রেঙ্গুনে নিয়ে যাওয়া হয় ১৮৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে। বর্মায় ১৮৬২ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর মৃত্যু হয়।

"সম্রাট বাহাদুর শাহ কবি ছিলেন। বিদ্রোহের আগুন যখন সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই সময় তিনি একটি গজল রচনা করেছিলেন। একদিন দিল্লীর প্রাসাদে একজন সম্রাটকে জিজ্ঞাসা করল—

দম্‌দমায়মেঁ দম্‌ নেঁহী খয়ের মাঙ্গো জাস্কি
আয় জাফর গৈণ্ডী হুই শম্‌শের্‌ হিন্দুস্থান কি।

'হে সম্রাট, এখন প্রতি মুহূর্তেই আপনি যখন দুর্বল হয়ে পড়ছেন, তখন, আপনি (ইংরেজের কাছে) আপনার জীবন ভিক্ষা করুন ; কারণ, ভারতের তরবারি এখন চির দিনের মতন ভেঙে গেছে।'

কথিত আছে, এর উত্তরে সম্রাট বলেছিলেন :

'গাজীয়োঁমেঁ বু রহেগী জব্‌তক্‌ ইমান কি
তব্‌ তো লণ্ডন তক্‌ চলেগী তেগ্‌ হিন্দুস্থান কি।'

'যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের বীর যোদ্ধাগণের হৃদয়ে আত্মবিশ্বাসের কণামাত্র অবশিষ্ট থাকবে, ততক্ষণ তীক্ষ্ণ থাকবে হিন্দুস্থানের কৃপাণ এবং একদিন সেই তরবারি লণ্ডনের তোরণে ঝলকে উঠবে।"

—মণি বাগচী, 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস', পৃ. ৩৬৭-৬৮

সম্রাট বাহাদুর শাহর অন্তরমথিত সেই শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল, ইতিহাস তার

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৯৪৩ সালে আগস্ট মাসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র রেঙ্গুনে আসেন আজাদ-হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়করূপে, ভারতের শেষ স্বাধীন সম্রাট বাহাদুর শাহের সমাধি পরিদর্শন করেন এবং সজল নয়নে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।



AT BAHADUR SHAH'S MAUSOLEUM

"We express our unshakable determination before a sacred memorial, before the mortal remains of the last fighter for India's freedom, the man who was an Emperor among men and a man among Emperors...... And now I shall close by quoting the English meaning of a couplet which was composed by Bahadur Shah himself: 'As long as the last particle of faith exists in the souls of India's freedom fighters, the sword of India shall continue to penetrate the heart of London.'"

—Netaji

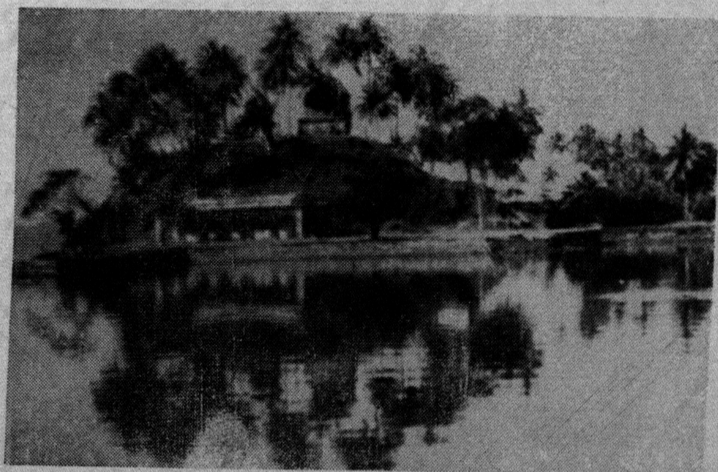
Rangoon, September 26, 1943

রেঙ্গুনে বাহাদুর শাহের সমাধিতে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পুষ্পার্ঘ্য দ্র. পৃ ৩২



তিতুমীর দ্র. পৃ ৩৫

শের আলী দ্র. পৃ ৪২



আন্দামানে ভাইপার দ্বীপে শের আলীর বধ্যভূমিতে স্মৃতিস্তম্ভ দ্র. পৃ ৪৩



বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে দ্র. পৃ ৪৭







চাপেকার ভ্রাতাদ্বয় :

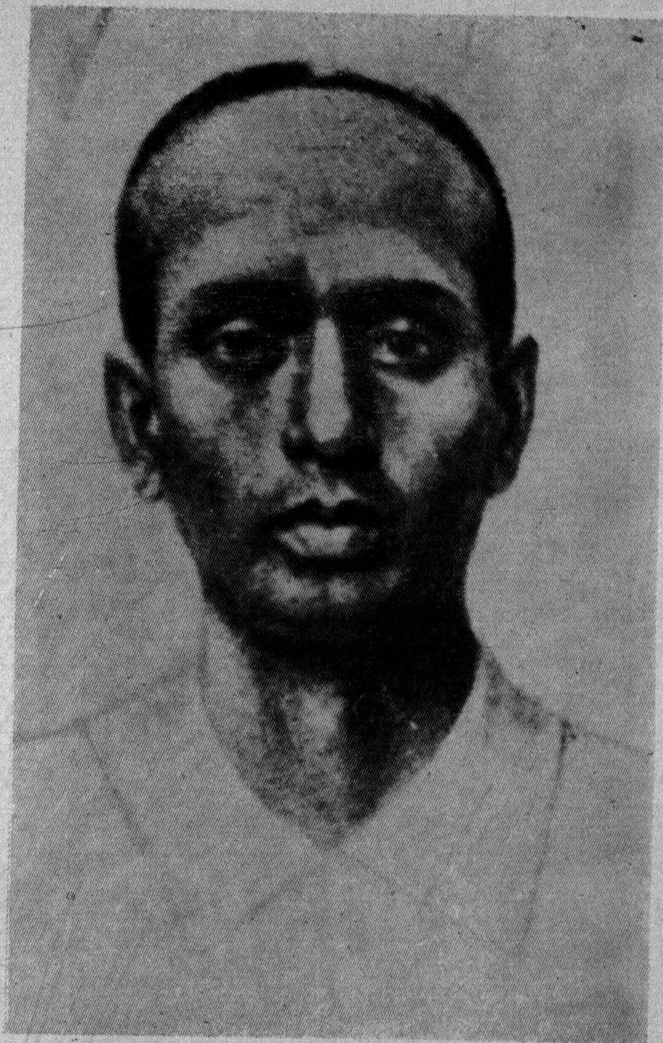
দামোদর হরি চাপেকার   বালকৃষ্ণ চাপেকার

বাসুদেব চাপেকার

দ্র. পৃ ৪৯

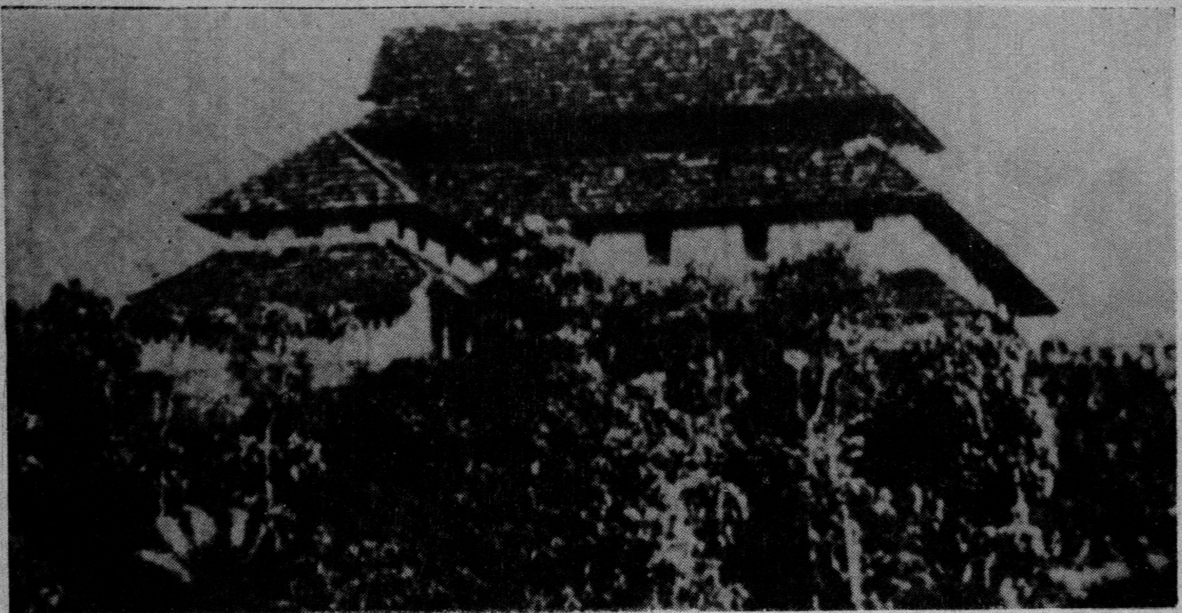


বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্র. পৃ ৫৮



সূর্য সেন (মাস্টারদা)

দ্র. পৃ ১০৬



মোপলা বিদ্রোহের কেন্দ্র তিরুরঙ্গাড়ি মসজিদ

দ্র. পৃ ৯০

ওয়াহাবী বিদ্রোহ—প্রকৃতি-বিস্তার : আন্দামান দণ্ডোপনিবেশে বন্দী ওয়াহাবী বিদ্রোহীগণ

যদিও ওয়াহাবী বিদ্রোহের ব্যাপ্তিকাল ষাট বছর, কিন্তু রাজনৈতিক প্রাদপ্রদীপ তাদের আবির্ভাব সিপাহীবিদ্রোহের প্রাক্‌কালেই প্রকট হয় এবং তার জের চলে ১৮৮০ পর্যন্ত।

প্রথমে ইসলাম ধর্ম-সংস্কারের আহ্বান নিয়ে আরম্ভ হলেও ক্রমেই ওয়াহাবী আন্দোলনের ধর্মীয় চরিত্র লোপ পেতে থাকে, আর তার অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। নীলকর, জমিদার, জায়গীরদার, মহাজন প্রভৃতির অত্যাচারে জর্জরিত মুসলমান ও হিন্দু চাষী জনসাধারণ এই আন্দোলনের প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। জমিদার প্রভৃতিদের সঙ্গে তাদের প্রায়ই সংঘর্ষ বাধতে থাকে। শেষে এই বিদ্রোহ ভারতবাসীর স্বাধীনতা-সংগ্রামে পরিণত হয়।

ভারতে এই ওয়াহাবী আন্দোলনের মূল উদ্যোক্তা হলেন রায়বেরিলীর ফকির সৈয়দ আহম্মদ ব্রেলভি। তাঁর সহকারী হন ফরিদপুর জেলার শরিয়তুল্লা ও চব্বিশ পরগনার নারকেলবেড়িয়ার নিশারত আলী বা তীতুমীর।

এই তিনজন মক্কায় হজে গিয়ে একত্রে মিলিত হন। মক্কায় নেজ-এর ওয়াহাব (*Wahab of Nejd*)-এর নির্দেশে এঁরা তিন জন ভারতে মুসলমান ধর্ম-সংস্কার করার ও যেহেতু ভারতবর্ষে মুসলমান শাসকদের কাছ থেকে ইংরেজরা ছলে ও কৌশলে শাসন ক্ষমতা অধিকার করেছিল সেজন্য ইংরেজকে তাড়িয়ে ভারত স্বাধীন করার ব্রত গ্রহণ করেন। আবদুল ওয়াহাবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এঁরা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ১৮২০ খৃস্টাব্দে মক্কা থেকে তাঁরা দেশব্যাপী সংগঠন ও প্রচার-কার্য শুরু করেন। আবদুল ওয়াহাবের নাম অনুসারেই এই আন্দোলনের নাম ওয়াহাবী আন্দোলন।

কিন্তু ইংরেজ যখন দেখল যে তা ধর্মীয় আন্দোলন থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে পর্যবসিত হয়েছে তখন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ছাড়াও কূটনৈতিক প্রচার চালাতে

লাগল। ওয়াহাবী শব্দের অর্থ 'ইসলাম-বিরোধী' এই অপব্যাখ্যা করে সাধারণ মানুষকে অর্থাৎ যারা এই আন্দোলনের প্রাণশক্তি তাদের বিভ্রান্ত করবার অপ-চেষ্টায় ব্রতী হল।

ওয়াহাবী আন্দোলনকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়, যেমন :

১৮২০ খৃস্টাব্দ থেকে ১৮৩২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সৈয়দ আহাম্মদ ও তিতুমীরের পর্যায়।

তার পর থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত শরিয়তুল্লা ও তাঁর পুত্র দুদু মিঞার পর্যায় এবং এই পর্যায়ের পাশাপাশি পাটনায় ১৮৪৭-৪৯ থেকে সৈয়দ আহাম্মদের শিষ্য, এনায়েৎ আলী ও বিলায়েৎ আলী দু ভাই-এর কার্যকাল।

তার পরবর্তী পর্যায় ১৮৬৪-৮০ সাল পর্যন্ত।

সৈয়দ আহাম্মদ ব্রেলভি ১৮২০ সাল থেকে ১৮২২ সাল পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ান ওয়াহাবী আদর্শ প্রচার করার জন্য। দলে দলে মুসলমানগণ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে থাকে। এই সময় ১৮২১ খৃস্টাব্দে কলকাতায় সৈয়দ আহাম্মদের সঙ্গে তিতুমীরের দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়। তার পরই তিতুমীর দক্ষিণ বাংলায় ওয়াহাবী সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও আদর্শ প্রচারের কাজে জোর দেন।

মুসলমান ধর্মকে গ্লানিমুক্ত করে সহজ সরল করা ও মৌলবী-মসজিদের অত্যাচার থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করাই এর উদেশ্য। ধর্মীয় অত্যাচার থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্ত করতে গিয়ে অচিরেই অত্যাচারী জমিদার ও শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সৈয়দ আহাম্মদ ও তাঁর অনুগামীদের সংঘর্ষ বাধে। সৈয়দ আহাম্মদ খোলা-খুলি ভাবে অস্ত্রের সাহায্যেই তার প্রতিবাদ করতে থাকেন।

সারা ভারতব্যাপী এক দুর্ধর্ষ একনিষ্ঠ ওয়াহাবী কর্মী বাহিনী গঠন করেন সৈয়দ আহাম্মদ। তাঁরা লক্ষ্যে ও কর্তব্যে অবিচল। সৈয়দ আহাম্মদ মুক্তির প্রতীক। যেখানেই সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার, অবিচার, সেখানেই সৈয়দ আহাম্মদের ওয়াহাবী দল তার প্রতিকারে হাজির। বিশেষভাবে কৃষকরাই তাঁদের ওপর নির্ভর-শীল ছিল। সৈয়দ আহাম্মদ তাঁর কার্যক্রমের বেশির ভাগ, সিন্ধু ও পাঞ্জাবে অত্যা-চারী জমিদার, জায়গীরদার ও শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা উৎপীড়িত চাষীদের পক্ষ নিয়ে অস্ত্রের সাহায্যে যুদ্ধ করতে ব্যস্ত থাকেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি খোলাখুলি ভাবে ইংরেজ শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করার ডাক দেন। সারা দেশের ওয়াহাবী সম্প্রদায় তার সমর্থন করেন ও ইংরেজের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে প্রস্তুতি নিতে থাকেন। ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে আহাম্মদের বাহিনীর মাঝে মাঝেই সংঘর্ষ হতে থাকে।

সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ‘সিতানা’তে ব্রিটিশ-শাসন-বর্জিত একটি অতি ক্ষুদ্র স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন সৈয়দ আহাম্মদ ব্রেলভি। ১৮২৯-৩০ সালে তাঁর এই বিজয়বার্তা সারা ভারতে ওয়াহাবীদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে ও তাঁরা ব্রিটিশ-বিরোধী কার্যক্রম জোরদার করতে থাকেন। ‘সিতানা’ থেকে ভারতব্যাপী ওয়াহাবী-আন্দোলন পরিচালিত হতে থাকে।

ব্রিটিশ শাসকদের কাজে শিখ শক্তির আত্মবিক্রয়ের ও অন্যান্য অত্যাচারের প্রতিবাদে সৈয়দ আহাম্মদ শিখ বাহিনীর সঙ্গে তাঁর নিজস্ব ওয়াহাবী সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ১৮৩১ সালের মে মাসে ‘বালাকোটের’ যুদ্ধে আহাম্মদ নিহত হন ও তাঁর সেনাবাহিনী পরাজিত হয়।

সৈয়দ আহাম্মদের তৎপর সহকর্মীগণ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সেই ‘সিতানা’তে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করতে সক্ষম হন। সেখান থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালিত হতে থাকে। এই ‘সিতানা’ দুর্গটি হয় ওয়াহাবী সংগ্রামের প্রধান কেন্দ্র। এই দুর্গ থেকেই ভারতব্যাপী ইংরেজ-বিরোধী যুদ্ধের ডাক দেন ওয়াহাবী নেতাগণ।

এদিকে আগে থেকেই দক্ষিণ বঙ্গে চব্বিশ পরগনার বাদুরিয়া থানার অন্তর্গত নারকেলবেড়িয়াতে (সে সময় নদীয়া জেলার অন্তর্গত) নিসারত আলী (‘তিতুমীর’ নামেই বিশেষ পরিচিত) ওয়াহাবী আদর্শ প্রচার করছিলেন। মুসলমান ধর্ম-সংস্কার ও সরলীকরণ করতে গিয়ে তিনি মুসলমান কৃষক ও দরিদ্র জনসাধারণের অর্থনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন এবং অচিরাৎ নীলকর, জমিদার, মহাজনদের কোপানলে পড়েন। তিতুমীর সব সময়েই জমিদার মহাজন প্রভৃতির অত্যাচার থেকে দরিদ্র কৃষক জনসাধারণকে রক্ষা করার চেষ্টা করতেন ও তাঁর ওয়াহাবী দল-বল নিয়ে সেই অত্যাচারে বাধা দিলেন, প্রতিকার করতেন। ফলে একদিকে তাঁর মতাদর্শ যেমন প্রচারিত হয়ে দলে দলে দরিদ্র কৃষক জনসাধারণ তাঁর দলে যোগ দিতে লাগল, তেমনি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিবর্গের সঙ্গে তাঁর লড়াই বাধতে থাকে।

চব্বিশ পরগনার ‘পুঁড়া’ গ্রামের জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে তিতুমীরের প্রথম সংঘর্ষ বাধে। কৃষ্ণদেব চাষীদের দাড়ির উপর বছরে আড়াই টাকা খাজনা ধার্য করেছিলেন (অর্থাৎ কোনো মুসলমান দাড়ি রাখলে তাকে ট্যাক্স দিতে হবে)। ঐ জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনীর সঙ্গে তিতুমীরের দরিদ্র কৃষক বাহিনীর খণ্ডযুদ্ধ হতে থাকে। জমিদার ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে মামলা করে। তিতুর পক্ষও মামলা করে। উভয় পক্ষই খালাস হয়। তিতুমীর দক্ষিণ বঙ্গে এক প্রবল কৃষক আন্দোলন

গড়ে তোলেন। ওয়াহাবী দল দ্রুত বাড়তে থাকে। এই দিন ৬ নভেম্বর ১৮৩০ সালে ঐ অত্যাচারী জমিদারের গ্রাম আক্রমণ ক'রে তছনছ করে।

এই সময় ওয়াহাবী আদর্শ অনুযায়ী তিতুমীর ঘোষণা করলেন, "কোম্পানীর লীলাখেলা সাঙ্গ হইয়াছে যুরোপীয়রা অন্যায় পূর্বক মুসলমানদের রাজত্ব আত্মসাৎ করিয়াছে। উত্তরাধিকার সূত্রে মুসলমানগণই এ দেশের রাজা।" (সুপ্রকাশ রায়, 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন', পৃ. ২২৬)। সকল ওয়াহাবীই এই ঘোষণা সমর্থন ক'রে প্রচার করতে লাগল। তিতুমীর স্বাধীন রাজা বলে স্বীকৃত হলো। তিতুমীর জমিদারদের কাছ থেকে কর চাইলেন। এর পর জমিদার, নীলকর ও মহাজনরা সংঘবদ্ধ হয়ে তিতুমীর ও তাঁর ওয়াহাবী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার চেষ্টা করতে থাকে। ফলে বহু সংঘর্ষ হয়।

তিতুমীর এই সময় প্রায় এক হাজার যুবককে লাঠি, তরোয়াল, বল্লম, সড়কি প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত করে সব সময় প্রস্তুত রাখতেন। হিন্দু-মুসলমান প্রজারা তিতু-মীরের নির্দেশে জমিদারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে। নদীয়া ও চব্বিশ পরগনা জেলার বিস্তীর্ণ অংশে তিতুমীরের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় 'মিস্কিন ফকির' নামে এক প্রভাবশালী ফকির তাঁর শিষ্যদের নিয়ে তিতুমীরের বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেন।

ইংরেজ সরকার তিতুমীর ও ওয়াহাবীদের আর বাড়তে না দিয়ে ধ্বংস করার চেষ্টা করল। বাংলায় ছোটোলাটের নির্দেশে বন্দুকধারী এক সিপাহী বাহিনী, দারোগা ও জমিদারদের লাঠিয়াল দ্বারা পুষ্ট হয়ে নারকেলবেড়িয়াতে তিতুমীরকে আক্রমণ করে। তিতুমীর আগে থেকেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিতুমীরের ভাগিনেয় ও ওয়াহাবী বাহিনীর সেনাপতি গোলাম মাসুদের পরিচালনায় এক শক্তিশালী বিদ্রোহী বাহিনীর সঙ্গে ইংরেজ পক্ষের যুদ্ধ হয়। ইংরেজপক্ষ যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে পালিয়ে যায় এবং ইংরেজ পক্ষে বহু হতাহত হয়।

তিতুমীরের প্রভাব জনসাধারণের মধ্যে প্রবলভাবে বাড়তে থাকে। বিস্তীর্ণ এলাকায় সকলেই তাঁকে স্বাধীন বাদশা বলে স্বীকার করে নেয়।

তিতুমীর ও ওয়াহাবী বিদ্রোহীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে শীঘ্রই ইংরেজরা তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। সেজন্য তাঁরা ওয়াহাবী-আন্দোলনের কেন্দ্র নারকেল বেড়িয়াতে একটি সুদৃঢ় বাঁশের দুর্গ নির্মাণ করেন। বহু অস্ত্র, লাঠি, বল্লম, সড়কি, তরোয়াল, ইঁট-পাথর, কাঁচা বেল প্রভৃতি— ঐ দুর্গটির বিভিন্ন কক্ষ ভর্তি করে

রাখা হয়। এইটিই ভারতে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ "বাঁশের কেল্লা"।

ভারতের তৎকালীন গবর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্কের আদেশে নদীয়ার কালেক্টর ও জজ বহু সৈন্য নিয়ে তিতুমীরকে আক্রমণ করে, সঙ্গে জমিদার ও নীল-কর বাহিনীও ছিল। তিতুমীরের সেনাপতি গোলাম মাসুদ এবারও তাঁর বিরাট ওয়াহাবী বাহিনী নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন এক নীলকুঠীতে। দুপক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। বহু হতাহত হওয়ায় ইংরেজ পক্ষ পলায়ন করে। এর ফলে তিতুমীরের প্রভাব আরো বেড়ে যায়। ভূষণার জমিদার মনোহর রায় তিতুমীরের সঙ্গে যোগ দেন। তাঁর শক্তিতে ও অর্থসাহায্যে তিতুমীর বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠেন।

বারবার পরাজিত হয়ে উৎকণ্ঠিত ইংরেজ গবর্নমেণ্ট তিতুমীর ও ওয়াহাবীদের শেষ করার জন্য একশো গোরা সৈন্য, দুটি কামান ও অন্যান্য সশস্ত্র লোকের এক বিরাট বাহিনী একজন কর্নেলের নেতৃত্বে নারকেলবেড়িয়াতে পাঠান। সেই সৈন্য-বাহিনী নারকেলবেড়িয়া ঘিরে ফেলল। রাত্রেই বিদ্রোহী ওয়াহাবী সৈন্যরা ইংরেজ সৈন্যকে আক্রমণ করে। পরদিন ইংরেজ সৈন্য তিতুমীরের দুর্গ আক্রমণ করে। বিদ্রোহীরা দুর্গের মধ্যে থাকায় ইংরেজ সৈন্যর গুলিতে তাদের কোনো ক্ষতি হয় না, উপরন্তু বিদ্রোহীদের অজস্র তীর, ইট ও বেলের আঘাতে ইংরেজ পক্ষের প্রভূত ক্ষতি হতে থাকে। এমন অবস্থায় ইংরেজরা কামান দিয়ে তিতুমীমের "বাঁশের কেল্লা" আক্রমণ করে। ঘন ঘন গোলা বর্ষণ হতে থাকে। একটি গোলা তিতুর কাছে ফাটে। তার আঘাতে তাঁর ডান উরু ছিন্নভিন্ন হয়। অল্পক্ষণের মধ্যে তিতুমীর মারা যান— ৩ ডিসেম্বর ১৮৩২ খৃস্টাব্দ। "বাঁশের কেল্লা" মাটিতে পড়ে গেল। কেল্লার নিচে চাপা পড়ে অনেক বিদ্রোহী মারা পড়ল। অনেকে পালিয়ে গেল। ইংরেজ সৈন্য আটশো জনকে গ্রেপ্তার করে বারাসতে নিয়ে এল। বন্দীদের বিভিন্ন জায়গায় রাখা হয়। তাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হতে লাগল। তাঁদের প্রতিদিন মাথা-পিছু একছটাক করে চাল খেতে দেওয়া হত। আলিপুর আদালতে বন্দীদের বিচার হল। ৩৫০ জন আসামী সাবস্ত হয়— বাকীদের ছেড়ে দেওয়া হয়। বিচারে ১৪৫ জনের বিভিন্ন মেয়াদের সাজা হয়। কিছু বিদ্রোহীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ওয়াহাবী সেনাপতি তিতুমীরের ভাগিনেয় গোলাম মাসুদ (মাসুদ খাঁ)-এর ফাঁসি হয় নারকেলবেড়িয়াতে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লায় সামনে। শেষ হয় ওয়াহাবী বিদ্রোহের একটি পর্যায়।

১৮২০ খৃস্টাব্দে হজ থেকে ফিরে ফরিদপুর জেলায় শরিয়তুল্লা, সৈয়দ আহাম্মদ ব্রেলভি ও তিতুমীরের মতোই ভারতে ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রচারে ব্রতী হন। তিনি পূর্ববঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ওয়াহাবী আদর্শ— মুসলমান ধর্ম সংস্কার ও সরলীকরণ করার কথা-প্রচার করতে থাকেন। তাঁর সরল জীবনযাত্রা ও গরীব চাষীর প্রতি সহানুভূতি অচিরেই তাঁকে পূর্ব বাংলার হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উৎপীড়িত নিগৃহীত জনসাধারণের নেতার আসনে বসায়। মুসলমান ধর্ম সংস্কার করতে গিয়ে তিনি অর্থনৈতিক রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লেন। তাঁর নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার জমিদার, মহাজন, নীলকরদের দ্বারা উৎপীড়িত দরিদ্র চাষীগণ ঐক্যবদ্ধ হয়। তাদের 'ফরাজ' বলা হত। বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে শরিয়তুল্লার ক্রমেই সংঘর্ষ বাধতে থাকে। এমন সময়ে শরিয়তুল্লা মারা যান।

শরিয়তুল্লার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মহম্মদ মহসীন বা 'দুদুমিঞা', তরুণ বয়সে হজ থেকে ফিরে এসে পিতার অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি প্রথম থেকেই ভারত স্বাধীন করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে থাকেন। তিনি সারা পূর্ব বাংলা ভ্রমণ করেন ঝড়ের গতিতে। সব রকম থেকে মুক্তির পথ প্রচার করতে থাকায়, অল্পকালের মধ্যেই দুদুমিঞা দেশের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেন। ধর্মীয় আন্দোলন ক্রমে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হল। জমিদার নীলকর প্রভৃতিরা অত্যাচারের বিরুদ্ধে দুদুমিঞা মুসলমান হিন্দু দরিদ্র চাষীর পক্ষ নিলেন। অচিরেই সারা পূর্ববঙ্গে তাঁর নেতৃত্বে চাষী জনসাধারণ দলবদ্ধ হয়ে ফরাজী ওয়াহাবী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এক বিশাল শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। বারাসত, যশোহর, পাবনা, মালদহ, ঢাকা প্রভৃতি জেলাতে দুদুমিঞার এই 'ফরাজী'-ওয়াহবী দল খুবই শক্তিশালী হয়, বহু অস্ত্রশস্ত্রও জোগাড় হয়।

দুদুমিঞা পাল্টা শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজের বিচারালয়ে না গিয়ে ফরাজী-ওয়াহবীদের বিচার কার্যালয় গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়। কোনো ব্যক্তি এ ব্যবস্থা না মানলে তার কঠিন সাজা হত। জমিদার, নীলকর প্রভৃতির দলের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ বাধতে থাকে। সে সময় সারাদেশে দুদুমিঞার অসীম প্রভাব। তাঁর নেতৃত্বে প্রায় ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) উভয় সম্প্রদায়ের চাষী যে-কোনো অত্যাচারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত থাকত সব সময়। তাঁর নিযুক্ত 'খলিফা'গণ দেশের সর্বত্র কৃষক জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা ও নিয়মিত অর্থ সংগ্রহ করতেন। বিরুদ্ধশক্তির সঙ্গে এই ফরাজী-ওয়াহাবীদের সংঘর্ষ হতে

থাকে। বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে ফরিদপুরে জমিদার নীলকর প্রভৃতিরা, দুদু-মিঞার বাহিনীর কাছে পরাজিত হওয়ায় ইংরেজ সরকার এই কৃষক অভ্যুত্থান দমন করার জন্য ১৮৩৮ সালে সিপাহী বাহিনী পাঠিয়েও কিছু করতে পারে নি। সরকার দুদুমিঞা ও আরো অনেকের নামে বহু গৃহলুণ্ঠনের মামলা করে, তাঁদের গ্রেপ্তার করে ১৮৩৮ সালের শেষে। কিন্তু অভিযোগ প্রমাণ করতে না পেরে তাঁদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয় সরকার। ১৮৪৪ খৃস্টাব্দে আবার দুদুমিঞা গ্রেপ্তার হন। কিন্তু এবারও তিনি খালাস পান। দুদুমিঞা তাঁর নিজ গ্রাম ফরিদপুর জেলার বাহাদুরপুরে ও পার্শ্ববর্তী অনেক দূর দূর অঞ্চলে তাঁর শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। জমিদারদের খাজনা দেওয়া বন্ধ করেন। গ্রামে গ্রামে আদালত স্থাপন করেন। তাঁর নির্দেশে ৫০০ (পাঁচশো) লোকের এক কৃষক বাহিনী ফরিদপুর জেলার পাঁচচরের এক অত্যাচারী নীলকরের নীলকুঠী ধুলিসাৎ করে দেয়। এরপর জুলাই ১৮৪৭ সালে এক বিশাল সামরিক বাহিনী সমস্ত অঞ্চল ঘিরে নানারূপ অত্যাচার করে ও দুদুমিঞা ও তাঁর বহু সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করে। মামলায় তাঁদের সাজা হয়। কিন্তু আপিলে দুদুমিঞা ও অন্য সকলেই— (৬২ জন) মুক্তিলাভ করেন। গরীব চাষী জনসাধারণের পীর দুদুমিঞার অসীম প্রভাবে ভীত হয়ে ইংরেজ সরকার তাঁকে ১৮১৮ সালের তিন আইনে (Regulation III of 1818) গ্রেপ্তার করে রাজবন্দী (স্টেট্ প্রিজনার) হিসাবে আটকে করে রাখেন সিপাহী বিদ্রোহের সময়— আলিপুর জেলে। ১৮৫৯ সালে মুক্তি পেয়ে নিজগ্রামে যাবার পর আবার তিনি গ্রেপ্তার হন। "আন্দোলনের প্রধান দুদু মিঞার নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলে 'স্বাধীন সরকার' গঠন, কৃষক স্বেচ্ছাসেবকদের লইয়া 'স্বাধীন সরকারের সেনাবাহিনী' গঠন, স্বাধীন 'বিচারালয়' স্থাপন ও বিস্তৃত অঞ্চলে জনসাধারণের নিকট হইতে 'কর' আদায় প্রভৃতি কার্য্য ফরাজী আন্দোলনকে প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণ বৈপ্লবিক রূপ দিয়াছিল" (সুপ্রকাশ রায়, 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম', পৃ. ২৪৭)। মোট প্রায় দশ বছর জেলখাটার পর ভগ্ন-স্বাস্থ্য দুদুমিঞা ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৬০ নিজগ্রামে প্রাণ ত্যাগ করেন। শেষ হয় ওয়াহাবী-আন্দোলনের আর একটি পর্যায়।

১৮৪৩ সাল থেকেই ওয়াহাবী কার্যক্রমের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে পাটনা; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পূর্বোল্লিখিত 'সিতানা' দুর্গের সঙ্গে এক যোগা-যোগের মাধ্যম হয়ে ওঠে। সৈয়দ আহম্মদ ব্রেলভির শিষ্য পাটনার এনায়েৎ আলী

ও বিলায়েৎ আলী দুইভাই ওয়াহাবী আন্দোলনের নেতা হয়ে ওঠেন তারপর। আর জৌনপুরের করমত আলী, হায়দারাবাদের জৈনুদ্দিন এই আন্দোলনের সামিল হন। এঁরা প্রত্যেকেই খুব প্রভাবশালী ছিলেন। এই সময় ওয়াহাবী আন্দোলনের সর্বোচ্চ নেতা ছিলেন বেরিলীর পীর ইমতাজিন। এঁরা সকলেই একযোগে এ দেশ থেকে ব্রিটিশ শাসন খতম করার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁরা সুদূর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের 'সিতানা' থেকে রাজমহল, মালদহ ও চট্টগ্রাম পর্যন্ত যোগসূত্র রক্ষা করতেন। পাটনার মহম্মদ হোসেন ও মাজার আলী বিশেষ সক্রিয় হয়ে ওঠেন। সেই সময় সিলেট, ত্রিপুরা সহ বাংলার অনেক জেলা ও পাটনা, অমৃতসর, কানপুর, দিল্লী, থানেশ্বর, ঝিলাম, রাওয়ালপিণ্ডি, আটক, পেশওয়ায় প্রভৃতি স্থান ওয়াহাবী আন্দোলনের শক্ত ঘাঁটি হিসাবে গড়ে ওঠে। বম্বে, মধ্যপ্রদেশ ও হায়দ্রাবাদে কিছু কাজ হতে থাকে।

১৮৪৭ সালে 'সিতানা'র দুর্গ থেকে ওয়াহাবীরা ব্রিটিশ-বিরোধী যুদ্ধ আরম্ভ করার প্রস্তুতি নেয়। ১৮৪৯ সালে ওয়াহাবী নেতা বিলায়েৎ আলী ব্রিটিশ-বিরোধী যুদ্ধ করতে করতে পাটনা থেকে সিতানার দিকে রওনা হন। ১৮৫২ সালে তাঁর মৃত্যুর পর এনায়েৎ আলী সব দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আক্রমণ করতে তাঁকে সাহায্য করেন করমত আলী। উত্তর-পশ্চিমসীমান্ত প্রদেশে ওয়াহাবীরা অনেকগুলি যুদ্ধে ইংরেজদের ক্ষতি করে। ব্রিটিশ পক্ষ আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় ওয়াহাবীরা অনেক জায়গায় যথা দিল্লী, আগ্রা, হায়দ্রাবাদ, পাটনা, ভূপাল, জৈনপুর, হিসার প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহী সিপাহীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ১৮৫৭-৫৮ সালে এনায়েৎ আলী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। সে সময় পাটনাতে বিশিষ্ট ওয়াহাবী নেতা—আহম্মদউল্লা, মহম্মদ হোসেন ও ওয়াইজ খাঁ-কে ইংরেজ সরকার বন্দী করে রাখে। যুবক ওয়াহাবী নেতা ফারাৎ হোসেন আত্মগোপন করে কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন এবং ১৮৬৩ সালে আম্বালাতে ইংরেজদের আক্রমণ করেন।

১৮৬৩-৬৫ সালের মধ্যে ওয়াহাবীদিগের বিরুদ্ধে কয়েকটি ষড়যন্ত্র মামলা হয়—আম্বালা বিচার (Amabala Trial) হয় ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে। পাটনা বিচার (Patna Trial) হয় ১৮৬৫ খৃস্টাব্দে। এতে ইহায়া আলি, মহম্মদ জাফর, ফয়েজ আলি, ফরাৎ আলি ও মহম্মদ সফির প্রাণদণ্ড হয়। হাইকোর্টে আপিলে তাঁদের প্রাণদণ্ড

মকুব হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। আরো কয়েকজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এঁদের সকলকেই আন্দামান দণ্ডোপনিবেশে পাঠানো হয় বন্দী হিসাবে, অমানুষিক কষ্টের মধ্যে বাকী জীবন শেষ করার জন্য। এই মামলায় পাটনার আহাম্মদউল্লাও যাবজ্জীবন কারাবাসের জন্য আন্দামানে প্রেরিত হন ১৮৬৫ সালের জুন মাসে। মালদহ বিচার (Maldah Trial) হয় সেপ্টেম্বর ১৮৭০ সালে। মালদহর অশীতিপর বৃদ্ধ ওয়াহাবী নেতা রফিদ মণ্ডলের পুত্র আমিরুদ্দীনের এই মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। এ খবর শুনে বৃদ্ধ পিতা পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করেন। রাজমহল বিচার (Rajmahal Trial) হয় অক্টোবর ১৮৭০ সালে। সৎ, নির্ভীক ও সম্মানীয় ব্যক্তি বলে প্রসিদ্ধ ইসলামপুরের ওয়াহাবী নেতা ইব্রাহিম মণ্ডলের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় এই মামলায়। তাঁকে আন্দামানে পাঠানো হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তিনি ওয়াহাবী আন্দোলন পরিচালনা করতেন ও মালদহ, রাজসাহী, বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুরের ওয়াহাবীদের সংঘবদ্ধ করতেন ও এই আন্দোলন পরিচালনার জন্য এই-সব জায়গা থেকে নিয়মিত অর্থ সংগ্রহ করতেন।

১৮৬৯ সালের জুন মাসে কলকাতার কলুটোলার দুজন চামড়া ব্যবসায়ী আমীর খাঁন ও খুসমত খাঁন ওয়াহাবী আন্দোলনের জন্য চাঁদা তোলার অপরাধে গ্রেপ্তার হন। বেশ-কিছুকাল আটক থাকার পর আর তিনজনের সঙ্গে তাদের বিচার হয়। বিচারে তাঁদের সকলেরই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়। রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা হলে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নর্মান সাহেব (Norman) তা অগ্রাহ্য করেন। তাঁদের সকলকেই আন্দামানে পাঠানো হয়। ১৮৭১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর মহম্মদ আবদুল্লা নামে এক ওয়াহাবী যুবক কলকাতা টাউন হলের সামনে প্রধান বিচারপতি নর্মানকে হত্যা করেন ও ফাঁসিতে মৃত্যু বরণ করেন। পরে পাটনার বিচারে তব্রুক আলি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হয়ে আন্দামানে প্রেরিত হন।

শতশত ওয়াহাবী যোদ্ধাকে সে সময় আন্দামান দণ্ডোপনিবেশে পাঠানো হয় ও তাঁরা সেখানেই মারা যান। (দ্রষ্টব্য Lester Hutchinson, *Empire of Naboobs*)।

সিপাহী মহাবিদ্রোহের যোদ্ধাদের সঙ্গে আন্দামান দণ্ডোপনিবেশে মিলিত হলেন ওয়াহাবী স্বাধীনতা-সংগ্রামীগণ। ভাগ্য একই— অপরিসীম দুঃখকষ্টের মধ্য

দিয়ে বাকী বন্দী জীবনটা আন্দামানেই অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে শেষ করলেন তাঁরা। তাঁদের কথা অজানাই রয়ে গেল! সিপাহী বিদ্রোহের যে-সব যোদ্ধা আন্দামানে বন্দী ছিলেন (প্রায় ৩০০০ হাজার) তাঁদের মধ্যে যেমন মাত্র কয়েকটি নাম ছাড়া আর কিছু জানা যায় না, সেই রকম এই ওয়াহাবী বন্দীগণ, যাঁরা আন্দামানেই জীবন শেষ করেছেন, তাঁদের সংখ্যা, নাম-পরিচয় কিছুই দেশবাসী আজও জানে না। শোনা যায় ওয়াহাবী বিদ্রোহের কিছু যোদ্ধা আন্দামানে বন্দী জীবন কাটিয়ে সেইখানেই সংসারী হয়েছিলেন। শেষ হয়েও ওয়াহাবী বিদ্রোহের জের চলতে থাকে ইতস্তত।

ওয়াহাবী বিদ্রোহের একটি স্মরণীয় ঘটনা :

১৮৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি ভারতের গবর্নর জেনারেল লর্ড মেয়ো সপরিবারে ব্রহ্মদেশে রওনা হন গ্লাসগো জাহাজে। সেখান থেকে তিনি ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২ সালে আন্দামান পরিদর্শনে আসেন। লর্ড মেয়ো ব্যক্তিগত ভাবে আন্দামান সম্বন্ধে আগ্রহী ছিলেন। আন্দামানের চীফ কমিশনার তখন কর্নেল টটলার (Tottler)। 'রস' দ্বীপ তখন কয়েদী বসতির রাজধানী। সব সরকারী কর্মচারী থাকত তখন ওখানে। আন্দামানের বিভিন্ন দ্বীপের বিভিন্ন জেল ব্যারাকে তখন বন্দীদের রাখা হত। তখনো সেলুলার জেল তৈরি হয় নি। বিদ্রোহী সিপাহী ও ওয়াহাবীগণ দক্ষিণ আন্দামানের বিভিন্ন দ্বীপের জেল ব্যারাকে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। 'ভাইপার' দ্বীপেও তাঁদের রাখা হয়েছিল। এপারে 'অ্যাবার্ডিন' দ্বীপ ও ওপারে 'রস'। স্থির হল লর্ড মেয়ো 'রস' দ্বীপ দেখে 'ভাইপার' দ্বীপে যাবেন। দক্ষিণ আন্দামানের উচ্চ পর্বতশিখর 'মাউন্ট হ্যারিয়ট'-এ গেলেন তিনি সূর্যাস্ত দেখার জন্য আর ওখানে একটি স্যানিটোরিয়াম করা যায় কিনা তা নিজে দেখার জন্য। এলেন 'হোপ টাউন' জেটিতে। সদলে নামলেন সেখানে, সামনে চড়াই, উৎরাই। সূর্যাস্ত দেখে ফিরছেন লর্ড মেয়ো সদলে। চারি দিকে নিরাপত্তার লোকজন। মশাল জ্বালিয়ে পথ দেখাচ্ছে মশালচীরা। লর্ড মেয়ো জেটির কাছাকাছি আসছেন।

এদিকে তরুণ পাঠান— যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ওয়াহাবী বন্দী শের আলী —লর্ড মেয়োর "মাউ হ্যারিয়ট"-এ বাবার কথা শুনে আগের থেকে জঙ্গলে ছুরি নিয়ে লুকিয়ে আছেন তাঁকে হত্যা করার জন্য। লর্ড মেয়ো সদলে যখন পাহাড়ের চূড়ায় উঠছিলেন, শের আলীও গোপনে পাশে পাশে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে উপরে

চলেছেন সুযোগের সন্ধানে। কিন্তু সুবিধা হল না। লর্ড মেয়ো নামছেন পাহাড়ের চূড়া থেকে ; শের আলী কোন সুযোগই পাচ্ছেন না কার্যসিদ্ধির। শের আলী নিরাশ হন। এমন সময় লর্ড মেয়ো যখন জেটির কাছাকাছি এলেন, তখন অতর্কিতে শের আলী ছুটে এসে লর্ড মেয়োর কণ্ঠে সেই ছুবি বসিয়ে দিলেন। হঠাৎ তীক্ষ্ণ, আহত স্বর ভেসে এল লর্ড মেয়োর। সবাই হতবুদ্ধি। সম্বিত ফিরতেই দেখা গেল একজন তরুণ পাঠান পেছন থেকে লর্ড মেয়োর কণ্ঠনালীতে ছুরি চেপে ধরে আছে। রক্ষীরা ছুটে এল, বন্দী হল সেই পাঠান যুবক। লর্ড মেয়োর পোশাক রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে। ব্যর্থ হল রক্তক্ষরণ বন্ধ করার সব প্রচেষ্টা। পথেই মৃত্যু হল অবসন্ন লর্ড মেয়োর— ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২ সালে। মৃতদেহ জাহাজে আনা হল। শের আলি স্পষ্ট করেই বললেন— "আমিই খুন করেছি মেয়োকে— সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে। এ জন্য আমি গর্বিত।" বিচারে শের আলির ফাঁসির হুকুম হল। কলকাতা হাইকোর্টেও ঐ রায় বহাল রইল— ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২ খৃস্টাব্দে। ১৮৭২ সালের ১১ মার্চ— আন্দামানের 'ভাইপার দ্বীপে' ফাঁসির মঞ্চে ওয়াহাবী নেতা শের আলি আত্মাহুতি দিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই এক এবং একটিই মাত্র ঘটনা যা ব্রিটিশ রাজশক্তির সর্বোচ্চ প্রতিভূ —বড়োলাটকে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা মারতে পেরেছেন।

শেষ হল ওয়াহাবী পর্যায়। আন্দামান দণ্ডোপনিবেশে যাবজ্জীবন কারাবাসের জন্য যে সমস্ত ওয়াহাবী-স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রেরিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মাত্র যে-কটি নাম পাওয়া যায় :

(১৮৬০—১৮৭০সাল)

পাটনা বিচার ১৮৬৫ খৃ· (Patna Trial)	**মালদহ বিচার ১৮৭০ খৃ· (Maldah Trial)**	**রাজমহল বিচার (Rajmahal Trial)**
১. ইহায়া আলী	৭. আমিরুদ্দিন।	৮. ইব্রাহিম মণ্ডল।
২. মহম্মদ জাফর		৯. আমির খাঁ, কলকাতা
৩. কয়েজআলী		১০. খুসমৎ খাঁ, কলকাতা
৪. ফরাৎ আলী		১১. তব্রুক আলি, পাটনা
৫. মহম্মদ সফি		১২. মহম্মদ শের আলী।
৬. আহম্মদুল্লা		

আন্দামান সেলুলার জেল : পরিকল্পনা, নির্মাণ ও পরিচয়

দিন কেটে যায়। সিপাহী ও ওয়াহাবী বন্দীগণ আন্দামান দণ্ডোপনিবেশে কয়েদী জীবন যাপন করে চলেছেন। দৈনন্দিন মৃত্যু সংখ্যা অগণ্য। পশুর ন্যায় শৃংখলিত অবস্থায়, আদিম জঙ্গল পরিষ্কার করার অশেষ কষ্ট-পরিশ্রম তাঁদের জীবনের শেষ শক্তিটুকু নিংড়ে নিতে চলেছে। অনাহার, হতাশা, স্বজন থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন, দেশে ফেরার আর কোনো আশাই নাই— এমন শারীরিক ও মানসিক অবস্থাতেও যে তাঁরা জীবন ধারণ করতে পেরেছিলেন, তাতেই তাঁদের মনোবল যে কত দৃঢ় ছিল তা উপলব্ধি করা যায়। আর মূল ভূখণ্ডে, স্বদেশে, ভারতবাসী তাঁদের সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। আস্তে আস্তে তাঁরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে লাগলেন। আপন গতিতে বয়ে যায় আন্দামানের দিনগুলি।

'অ্যাবার্ডিনের' যুদ্ধের পর ওয়াকারসাহেবের বদলে আন্দামান দণ্ডোপনিবেশের সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট হলেন ক্যাপ্টেন জে. এস. হটন (Capt. J. S. Haughton)— ৩ অক্টোবর ১৮৫৯ সালে। তাঁরও দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরিবর্তন হল না। ১৮৬৮ সালের মার্চে কর্নেল এইচ. ম্যান (Col. H. Man) এই দ্বীপের সুপার হন। ১৬ এপ্রিল ১৮৬৯ সালে— নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ পোর্ট ব্লেয়ারের সুপারিনটেন্‌ডেণ্টের অধীনে আসে। কর্নেল ম্যানই সর্ব প্রথম আন্দামান দণ্ডোপনিবেশের জন্য কতকগুলি নিয়ম-কানুন তৈরি করেন। কিছু রদবদল করে এই নিয়মকানুনই মোটামুটি এখানকার আইন ছিল ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত। লর্ড মেয়োর হত্যাকাণ্ডের সময় পর্যন্ত কর্নেল টটলার ছিলেন আন্দামানের কমিশনার। এর ফলে ডি. এম. স্টুয়ার্ট (D. M. Stuart) এই দ্বীপের কমিশনার হন। ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত আন্দামানের শাসন ভার থাকে কমিশনার জেনারেল মর্টনের হাতে। ১৮৭৯ সালে চিফ কমিশনার হন জেনারেল বারওয়েল। তাঁর পর আরো আঠারো জন ইংরেজ চীফ কমিশনার আন্দামান শাসন করেন। ক্যাপ্টেন টি. ভি. ক্যাডেল (Capt. T. V. Cadel)-এর শাসনের পর ১৮৯৪ থেকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত আন্দামানের চিফ কমিশনার হন কর্নেল আর.

সি. টেম্পল (Col. R. C. Temple)। তিনি 'ফনিক্সরে'র ডক্ ইয়ার্ডটির সম্প্রসারণ করেন ও ওয়ার্কশপও তৈরি করেন। যদিও কর্নেল এইচ. এন. হর্নসফোর্ড (Col. H. N. Hornsford)-এর আমলে আন্দামান সেলুলার জেল তৈরি আরম্ভ হয়, তবু রিচার্ড টেম্পল-এর সময়ই এই জেল তৈরির কাজ অনেকটা এগিয়ে যায়।

কিছুকাল থেকেই ভারতের ইংরেজ সরকার, আন্দামানে বিভিন্ন দ্বীপের জেল-ব্যারাকে কয়েদীদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখার বদলে একটি স্থায়ী প্রশস্ত জেলখানার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে থাকেন— বন্দীদের বন্ধনদশা আরো দৃঢ় করবার জন্য। ইতিমধ্যে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামী বন্দীগণ সিপাহী বিদ্রোহের সিপাহী ও অন্যান্য বিদ্রোহীগণ এবং ওয়াহাবী বিদ্রোহীগণ শেষ হয়ে গেছেন। ভারত সরকার দেশের ক্রমবর্ধমান জনজাগরণের ও বৈপ্লবিক কাজকর্মের কঠোর ভাবে মোকাবেলা করার জন্য আন্দামানে একটি স্থায়ী, সুদৃঢ় জেলখানা তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয়।

আন্দামান সেলুলার জেল তৈরি করার হুকুমনামা—

Andaman and Nicober Settlement order No. 423

Cellular Jail,

Aberdin,

Port Blair, the 13th September 1893.

The Govt. of India has ordered the building of a Cellular Jail at Aberdin to accommodate 600 prisoners at an estimated Cost of Rs. 5,17,351/- (Cost expenditure Rs. 95, 881/-) Mr. Mc. Quilen, Sub-Engineer is to be the in charge of building of it.

—আন্দামান-নির্বাসিত বন্দীমুক্তি চক্র, 'সিংহদুয়ার'

"ভারত গবর্নমেণ্টের ইচ্ছা— নভেম্বর ১৮৯৩ সালে এই জেলখানা তৈরির কাজ আরম্ভ করে অক্টোবর ১৮৯৬ সালের মধ্যেই শেষ হয়। আনা হল আন্দামানে বহু যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদী। এই সেলুলার জেল তৈরি করতে দৈনিক ৬০০ জন কয়েদীকে বিভিন্ন রকম কাজে লাগানো হয়। মিঃ কুইলেন (Quilen) Sub-Engineer-এর অধীনে ওভারসীয়ার মিঃ ডবডন (Mr. Dob-don)-এর তত্ত্বাবধানে এই কাজ শুরু হয়। ইট আসে বর্মা থেকে। কিছু ইট সেখানে কয়েদীদের দিয়ে তৈরি করানো হয়। হাতে ও ঢেঁকিতে সুরকী কোটা হল। দ্বীপের বিভিন্ন জায়গা থেকে পাথর নিয়ে এসে রাখা হত 'এবার্ডিন' জেটিতে।

পরে সেগুলি জেলখানার কাছে নিয়ে যাওয়া হত। প্রতিমাসে কয়েদীদের দিয়ে ২০,০০০ (কুড়ি হাজার)— কিউবিক ফুট পাথর ভাঙা হত। তৈরি হতে লাগল আন্দামান সেলুলার জেল এবার্ডিন দ্বীপে, পোর্ট ব্লেয়ারের কাছে সমুদ্রতীরে। প্রস্তুতি পর্বের পর শুরু হয় মূল কাজ ১৮৯৬ সালে আর ১৮৯৮ সালের মধ্যে ৪০০টি সেল তৈরি হয়। বাকী কাজ শেষ হতে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত সময় লাগে। সেলের মোট সংখ্যা ৬৬৬, কারো কারো মতে ৭০০।"

—সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, 'মৌন মুখর সেলুলার জেল', পৃ. ১১

প্রত্যেকটি সেলের মাপ ৯ ফুট × ৫ ফুট। সেণ্ট্রাল টাওয়ার থেকে সাতটি তারার মতো সাতটি তিনতলা বাহু (wing) বের হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকটি তারার মতো বহু উঁচু প্রাচীর দিয়ে যুক্ত ভাবে ঘেরা। "…সেলুলার জেলে ছিল সাতটি তিনতলা ব্লক। মাঝখানে চারতলা 'সেণ্ট্রাল টাওয়ার', উপরের তলটি খোলা। মাঝখানে শুধু 'Sentry Box'। সেণ্ট্রাল টাওয়ার থেকে আড়াআড়ি (diagonal) ভাবে সাতটি বাহু প্রসারিত, তিনতলা দোতলা প্রত্যেকটি ব্লকের সঙ্গে যুক্ত। নিচের তলায়… আঙিনা। এক ব্লক থেকে অন্য ব্লকে যেতে হলে গরাদে ঘেরা লম্বা বারান্দার শেষে অবস্থিত গরাদে দেওয়া দরজা দিয়ে বের হয়ে আঙিনা দিয়ে ঘুরে অন্য ব্লকে প্রবেশ ব্যবস্থা। প্রত্যেকটি প্রবেশ পথে সান্ত্রী… প্রত্যেক ওয়ার্ডের মুখে তিনটি গেট— একটি সেণ্ট্রাল টাওয়ার থেকে ওয়ার্ডে ঢোকার, ঢোকার পর পাশের গেটটি ওয়ার্ডের প্রাঙ্গণে যাওয়ার এবং সামনেরটি সেগুলির সামনে লম্বা করিডরে প্রবেশের।"

—সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, 'মৌন মুখর সেলুলার জেল', পৃ. ৫৩।

সেলের সামনে একটি ছোটো মজবুত লোহার গরাদের দরজা। দরজাটি লম্বা ও চওড়ায় ছোটো আর সেলের মাঝামাঝি না হয়ে দরজাগুলি এক একপাশে অবস্থিত। সেলের মধ্যে দরজার বিপরীত দিকে লোহার গরাদে দেওয়া একটি ভেন্টিলেটার। সেলগুলির সামনে মাত্র দু ফুট চওড়া ইয়ার্ড। সেলের ও প্রাচীরের দেওয়ালে কোনোদিনই প্লাস্টার করা হয় নি। সেল সহ উপরোক্ত গেটগুলিতে মোট ৪টি তালা লাগানো হত। একটি ব্লকের সঙ্গে অন্য আর-একটি ব্লকের কোনো যোগ নেই। উপরের Central Tower থেকে একজন প্রহরী সব দেখতে পারত। বন্দীদের দিয়ে কাজ করাবার জন্য নীচে কয়েকটি শেড— ওয়ার্কশপ— কারখানা প্রভৃতি তৈরি করা হয়। এই হল আন্দামান সেলুলার জেলের গঠন।

ভারতের প্রথম গুপ্ত সমিতি ও বিপ্লবী নেতা ফাড়কে

সিপাহী-বিদ্রোহ ও ওয়াহাবী বিদ্রোহ দমনে ইংরেজ সরকার যে অত্যাচার চালায় তাতে সারা ভারতে জনসাধারণের মধ্যে নৈরাশ্যের ভাব দেখা দেয়। কালক্রমে এই অত্যাচার ও উৎপীড়নের ফলে কিছু লোক মরিয়া হয়ে অস্ত্রের সাহায্যেই এই অত্যাচার, অবিচারের মোকাবিলা করতে বদ্ধপরিকর হয়। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম হলেন— মহারাষ্ট্রের বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে। বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হবার জন্য তিনি একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন। এইটিই ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রথম বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি। ফাড়কেই হলেন প্রথম ভারতীয়, যিনি ভারতীয় গণতন্ত্রের (Indian Republic) কথা চিন্তা করেছিলেন— বাস্তবে রূপায়িত করারও চেষ্টা করেছিলেন। এই শিক্ষিত মহারাষ্ট্রীয় যুবক তাঁর কথায়, কাজে, বক্তৃতায়— অধ্যবসায়, কষ্টসহিষ্ণুতায় এক নিখুঁত বিপ্লবী নেতা রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। বিদেশী শাসনের উৎপীড়ন থেকে ভারতবাসীকে মুক্ত করার জন্য তিনি ভারতব্যাপী এক বিদ্রোহের পরিকল্পনা নিয়ে কাজে শুরু করলেন মহারাষ্ট্রে।

ফাড়কে তাঁর সৈন্যবাহিনী গঠন করার জন্য মহারাষ্ট্রের 'রার্মাসি' উপজাতির মধ্যে কাজ করতে থাকেন ও ব্রিটিশ-বিদ্বেষ প্রচার করতে থাকেন। এক সময় এই 'রামসি' উপজাতিরা মহারাষ্ট্র সৈন্যবাহিনীর অংশ ছিল। তাঁরা ১৮২৬ সালে একবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করেছিল। দুইজন প্রভাবশালী 'রামসি' নেতা— দৌলতরাও রামসি ও গোবিন্দ রাও দাভাড়ে ফাড়কের সহযোগী হলেন। ফলে 'রামসি' উপজাতিদের নিয়ে ফাড়কে, সুশৃংখল, বিশ্বাসী, গেরিলা যুদ্ধে পারদর্শী এক বিশাল ব্রিটিশ-বিরোধী সেনাবাহিনী গঠন করতে সক্ষম হন। শহরের যুবকদের সংঘবদ্ধ করে ফাড়কে বোম্বাই-এর ফারগুসন পাহাড়ের কাছে জঙ্গলে, গোপনে সামরিক শিক্ষা দিতে থাকেন। তাঁর সৈন্যবাহিনী বাড়তে থাকায় অর্থের অভাব দেখা দিল। তিনি ধনীব্যক্তিদের কাছে অর্থ চাইলেন, বললেন— ভারত স্বাধীন হলে তাদের টাকা শোধ করা হবে। কিন্তু কেউ কর্ণপাত করল না। উপায়ান্তর

না দেখে ফাড়কে ধনীদের কাছ থেকে জোর করে ও সরকারী টাকা লুঠ করার পন্থা অবলম্বন করলেন। একই সময় বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ চালিয়ে যেতে লাগলেন তিনি। তাঁকে গ্রেপ্তার করার সবরকম চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল ইংরেজ পুলিশ। উপরন্তু ফাড়কেই বোম্বাই-এর গবর্নর স্যার রিচার্ড টেম্পলের (Sir Richard Temple) মাথার উপর ৫০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলেন। ১৮৭৯ সালে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলেন ও পুণার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন স্থানে ইংরেজদের কুঠি তোষা-খানা (Treasury) প্রভৃতি আক্রমণ করে প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করেন। সরকারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেন। ইংরেজ সরকার বিশেষ অসুবিধায় পড়ে। ফাড়কের সৈন্যবাহিনী পুণার সন্নিহিত অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে সরকারের যোগাযোগ ব্যবস্থা, রেল, পোস্ট-অফিস আক্রমণ করে নষ্ট করতে থাকে, টেলিগ্রাফের তার কেটে দিতে থাকে। ইংরেজ সরকারের সৈন্যবাহিনী ফাড়কের 'রামসি' বাহিনীকে আক্রমণ করতে থাকে; কিন্তু গেরিলাযুদ্ধে পারদর্শী এই 'রামসি' বাহিনী ইংরেজ সৈন্য দেখামাত্র আক্রমণ চালিয়ে ক্ষতি সাধন করে, এবং তড়িৎ গতিতে ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যেত। আবার পরে একসঙ্গে মিলিত হত। জনসাধারণ ক্রমেই ফাড়কের বাহিনীর প্রতি সহানুভূতি দেখাতে থাকে। ইংরেজ সরকার আতঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফাড়কের বাহিনীকে আক্রমণ করে বিভিন্ন জায়গায়। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। বহু হতাহত হতে থাকে। এই রকম এক যুদ্ধে রামসি নেতা দৌলতরাও রামসি হত হন। আর-একটি যুদ্ধে গোবিন্দ রাও দাভাড়েও প্রাণ হারান। অপর একটি যুদ্ধে ফাড়কে নিজেও আহত হয়ে এক জঙ্গলের মন্দিরে আশ্রয় নেন। সেখানে ১৮৭৯ সালের ৩ জুলাই ফাড়কে ইংরেজ সৈন্যের হাতে ধরা পড়েন। বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। সারা ভারতের কোথাও বা আন্দামানেও ফাড়কেকে বন্দী করে রাখা নিরাপদ নয় মনে করে ইংরেজ গবর্নমেণ্ট তাঁকে 'এডেনে'র এক জেলে বন্দী করে রাখেন। বন্দী অবস্থায় সব সময়েই ফাড়কের দুই পা লোহার বেড়ী দিয়ে যুক্ত থাকত, যাতে তিনি পালাতে না পারেন। কিন্তু ঐ দুর্ধর্ষ বিপ্লবী সেই অবস্থাতেও কিছুদিন পর সেই জেল থেকে পালাতে সক্ষম হন। কিন্তু অল্পকাল পরে আবার তিনি ধৃত হয়ে সেই জেলে নিক্ষিপ্ত হন। বিশেষ কড়া পাহারায় তাঁকে রাখা হয়। এই অবস্থায় ১৮৮৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি এডেনের জেলে এই মহান বিপ্লবী নেতার রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়। তাঁকে যে ধীরে ধীরে বিষ প্রয়োগে মেরে ফেলা হয়েছে— এ সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম : গণপতি-শিবাজী উৎসব
পুনায় প্লেগ ও চাপেকার ব্রাদার্স

ভারতের ক্রমবর্ধমান জন-অসন্তোষ-প্রবাহের গতি পরিবর্তিত করে নিয়মতান্ত্রিক পথে চালনা করার জন্য তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের সম্মতিতে হিউম সাহেবের চেষ্টায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয় ১৮৮৫ সালে। এই সংস্থার কাজ হল ভারতের জনসাধারণের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের আশায় ভারত গবর্নমেণ্টের কাছে আবেদন-নিবেদন করে দাবিগুলি আদায় করার চেষ্টা করা। বিক্ষুব্ধ দেশবাসীর ক্ষোভ কিছুটা প্রশমিত হলেও কিছুসংখ্যক লোক এতে সন্তুষ্ট হতে পারে নি। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কাজে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ দৃঢ় হতে থাকে।

মহারাষ্ট্রে 'গণপতি'-উৎসবের পর রায়গড় দুর্গে-- ১৮৯৫ সালের ১৫ মার্চ —'Father of Indtan unrest'— বালগঙ্গাধর তিলক প্রথম শিবাজী-উৎসব পালন করেন। সারা ভারতে এই উৎসব প্রচলিত হয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবোধকে একটি সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় রূপ দেয়। তিলকের মতবাদ ছিল— **"in the attainment of independence the end justifies the means, and that every means that would lead to political emancipation of the Mother-land was justified."— K. C. Ghose, *The Roll of Honour*, p. 33।**

এই উৎসবে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলা ও মহারাষ্ট্রে যুবকগণ ক্লাব বা অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে শরীর চর্চা করে সংঘবদ্ধ হতে থাকে। মহারাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয় "মিত্র মেলা"। এই উৎসবের ফল বাংলায় শিবাজী উৎসব উপলক্ষে, রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা— "শিবাজী উৎসব" ও "প্রতিনিধি"। প্রসঙ্গত শিবাজী সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের উল্লেখযোগ্য ও উদ্দীপনাময় উক্তি— "শিবাজী অপেক্ষা বড় বীর কে আছেন— তাঁর থেকে বড় ঋষি, বড় ভক্ত বড় রাজা ? মহাকাব্যগুলিতে মহানায়কের যে রূপাঙ্কন করা হয়েছে— শিবাজী তার জীবন্ত বিগ্রহ।"... (এ সম্বন্ধে

বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখিত 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ', পৃ. ৪৪১-৪৮)।

১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইয়ে প্লেগ দেখা দেয়। ক্রমে মহামারীর আকার ধারণ করে বোম্বাইয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রোগের ধ্বংসলীলা শুরু হয়। রোগ-প্রতিরোধে সরকারের সাধারণ ব্যবস্থা বিফল হল। সরকার এই রোগাক্রান্ত সন্দেহে বহু লোককে স্বতন্ত্র করে রাখতে থাকে। এই কাজ পরিচালনা করার জন্য সাতারার কুখ্যাত অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেকটর র‍্যাণ্ড (Rand) সাহেবকে নিযুক্ত করা হয়। র‍্যাণ্ড সাহেবের আদেশে সৈন্যবাহিনী এই পৃথকীকরণ (segregation) এমন নির্দয় ও বীভৎস ভাবে চালাতে থাকে যে মূল রোগের চেয়ে রোগ-নিরোধের ব্যবস্থাটাই জনসাধারণের পক্ষে ভীতিজনক হয়ে দাঁড়াল। রোগাক্রান্ত এলাকায় সামরিক পাহারায় সব পুরুষদের সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করিয়ে সর্বসমক্ষে তাদের জামা কাপড় খুলে ফেলতে হত শরীরে কোনো গ্ল্যাণ্ড ফুলেছে কিনা পরীক্ষা করার জন্য। স্ত্রীলোকদিগকেও সকলের সামনে— তাদের পরিধেয় বস্ত্র খুলে ফেলে দেখাতে হত। বিভিন্ন জায়গায় রাস্তাঘাট বন্ধ করে, দোকানপাট ভেঙে তছনছ করে লোকেরা রুগী খুঁজত। এই-সব বর্বর আচরণের প্রতিবাদ হতে থাকে সারা মহারাষ্ট্রে। বিভিন্ন কাগজে এই অবস্থার প্রতিবাদ করা হয়। প্রতিকারের জন্য জনসাধারণের একটি দল সম্মিলিতভাবে র‍্যাণ্ড সাহেবের সঙ্গে দেখা করলে তিনি তাঁদের নিরাশ করে ফিরিয়ে দেন। তিলক তাঁর 'কেশরী' কাগজে এর ভীষণ প্রতিবাদ করতে থাকেন। ক্রমে সারা ভারতে এই বর্বরতার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। কিন্তু র‍্যাণ্ডের এই অশোভন অত্যাচার চলতে থাকে। পুনার সমস্ত পত্রিকা একবাক্যে এই অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য জনসাধারণকে কিছু-একটা করতে অনুরোধ করতে থাকে। বোম্বাইয়ের যুবকরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে অত্যাচারী র‍্যাণ্ড সাহেব ও আয়ার্স্ট [Ayerst] সাহেবকে পিস্তল দিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়— ২২ জুন ১৮৯৭ সালে পুনায়— মহারানী ভিক্টোরিয়ার ৬০তম রাজত্ব বার্ষিকী জুবিলী উৎসবের রাত্রে। আয়ার্স্ট ঘটনাস্থলেই মারা যান— আর র‍্যাণ্ড মারা যান ৩ জুলাই ১৮৯৭ সালে। জনসাধারণ উল্লসিত; অত্যাচার, উৎপীড়নও বন্ধ হল।

কিন্তু কারা মারল র‍্যাণ্ড ও আয়ার্স্ট সাহেবকে?

পুনার একটি শিক্ষিত চিৎপাবন ব্রাহ্মণ পরিবার। তিন ভাই। বড়ো— দামোদর হরি চাপেকার ; দ্বিতীয়— বালকৃষ্ণ চাপেকার ও তৃতীয়— বাসুদেব চাপেকার। স্বদেশপ্রেমী দামোদর তাঁর বন্ধুবান্ধব ও ভাইদের নিয়ে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে ব্যায়াম, ড্রিল প্রভৃতি শরীর চর্চা করে যুবকদের সংঘবদ্ধ করছিলেন। র‍্যাণ্ড-এর অত্যাচারে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তিনি দুটি রাইফেল, কয়েকটি পিস্তল ও তরোয়াল জোগাড় করে রাখেন। ২২ জুন ১৮৯৭ অপরাহ্ণে দামোদর, বালকৃষ্ণ ও আরো ক'জন সশস্ত্র হয়ে র‍্যাণ্ডকে হত্যা করার জন্য খুঁজতে থাকেন। এই কার্যের প্রস্তুতি প্রায় তিন মাস ধরে চলছিল। সেদিন ছিল জুবিলী উৎসব। সাহেবরা আনন্দ স্ফূর্তি করছে। দেখা গেল র‍্যাণ্ড ফিটন গাড়িতে করে গবর্নমেণ্ট হাউসে ঢুকছেন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময়। দামোদর বাইরে গেটের কাছে অপেক্ষা করছিলেন আর বালকৃষ্ণ একটু দূরে ছিলেন। রাত সাড়ে এগারোটায় র‍্যাণ্ড বের হয়ে এলেন— আয়ার্স্ট দম্পতিও র‍্যাণ্ড-এর পেছনের ফিটনে চেপে চলতে লাগলেন। উভয় গাড়িরই হুড নামানো ছিল। র‍্যাণ্ড-এর গাড়ির পিছনে ডান পাশ দিয়ে একটু দূরে দামোদর দৌড়ে চলতে লাগলেন গাড়ির সঙ্গে দূরত্ব ঠিক রাখার জন্য। বালকৃষ্ণও দৌড়তে থাকেন। কিছুদূর যাবার পর বালকৃষ্ণর সংকেত পেয়ে দামোদর র‍্যাণ্ড-এর গাড়ির পিছনে উঠে র‍্যাণ্ড-এর শরীর প্রায় স্পর্শ করে পিস্তলের গুলি ছোঁড়েন। গুলির আঘাতে র‍্যাণ্ড ঢলে পড়ল। দামোদর নিঃশব্দে গাড়ি থেকে নেমে রাস্তা পার হয়ে দৌড়ে পালিয়ে যান। ইতিমধ্যেই আয়ার্স্ট সাহেবের গাড়ির পিছনেও এক ব্যক্তি এইভাবে উঠে তাকে গুলি করেন। তিনিও নিঃশব্দে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। আয়ার্স্ট সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায়। র‍্যাণ্ড মারা যায় ৩ জুলাই ১৮৯৭ সালে।

এই হত্যাকারীদের ধরবার জন্য পুলিস জোর চেষ্টা করতে থাকে। দামোদর চাপেকার ধরা পড়েন ৯ আগস্ট ১৮৯৭। এ কাজ তিনি স্বীকার করেন ও তাঁর স্বীকারোক্তিতে আরো জানা যায় যে— খবরের কাগজে বালগঙ্গাধর তিলককে গালাগালি করার জন্য দুজন কাগজের সম্পাদককে তিনি আহত করেন, গবর্নমেণ্টের খরচায় তৈরি কয়েকটা মণ্ডপ তিনি পুড়িয়ে দেন, ও রানী ভিক্টোরিয়ার প্রতিমূর্তিতে তিনি আলকাতরা মাখিয়ে দেন ও গলায় জুতার মালা পরিয়ে দেন, ইত্যাদি।

চাপেকার ভাইদের ব্যবহৃত অস্ত্রগুলি পুলিসের তল্লাসীতে বের হয়। ১৮৯৭ সালের ২৭ জানুয়ারি দামোদর চাপেকারকে পুনার সেসন্স কোর্টে বিচারের জন্য

পাঠানো হয়। বে-আইনী বিচারে ১৮৯৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি দামোদরের ফাঁসির হুকুম হয়। বম্বে হাইকোর্ট ২ মার্চ ১৮৯৮ এই ফাঁসির হুকুম অনুমোদন করেন। ১৮৯৮ সালের ১৮ এপ্রিল ভোর ৬টা ৪০ মিনিটে যারবেদা জেলে নির্ভীক দামোদর চাপেকারের ফাঁসি হল।

র‍্যাণ্ড ও আয়ার্স্ট'কে গুলি করার পর পরই বালকৃষ্ণ চাপেকার হায়দ্রাবাদে পালিয়ে যান। বালকৃষ্ণ ও এই মামলার অন্যান্য আসামীদের ধরার জন্য গবর্নমেণ্ট কুড়ি হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। বালকৃষ্ণ হায়দ্রাবাদে ধরা পড়ে পুনায় নীত হন। তাঁর বিরুদ্ধে র‍্যাণ্ড ও আয়ার্স্ট'কে হত্যা করার অভিযোগ আনা হয়। সেসন্স কোর্টের বিচারে ১৮৯৮ সালের ৮ মার্চ বালকৃষ্ণের ফাঁসির হুকুম হয়। ১২ মে ১৮৯৯ সালে যারবেদা জেলে বালকৃষ্ণের ফাঁসি হল।

গুপ্তচর দুই ভাই গণেশ দ্রাবিড় ও রামচন্দ্র দ্রাবিড়ের দেওয়া খবরে— পুলিস জানতে পারে যে র‍্যাণ্ড ও আয়ার্স্ট'কে হত্যা করে দামোদর চাপেকার -প্রতিষ্ঠিত ক্লাবের ছেলেরা। গণেশ ও রামচন্দ্র সরকার ঘোষিত পুরস্কারের মধ্যে দশ হাজার টাকা পায়। চাপেকার ভাইদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অল্পবয়স্ক বাসুদেব চাপেকার ও তার এক বন্ধু, ঐ ক্লাবেরই একজন সভ্য, পুনার গবর্নমেণ্ট ওয়ার্কশপ্ (সায়ান্স কলেজ)-এর ছাত্র রানাড়ে, ঐ পুলিস গুপ্তচর গণেশ ও রামচন্দ্রকে শাস্তি দেওয়ার জন্য, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ পাঞ্জাবীর ছদ্মবেশে তাদের বাড়িতে যায় রাত দশটায়। তাঁরা বলেন, তাদের দুই ভাইকে একটি জরুরী-কাজের জন্য পুলিস সাহেব এখনই ডাকছেন। তারা তখন তাস খেলছিল। তারা বলে, খেলাটা শেষ হলেই যাবে; পাঞ্জাবী দুজনকে নীচে অপেক্ষা করতে বলে। একটু পরে দোতলা থেকে ঐ দুই ভাই নেমে নীচে আসা মাত্র বাসুদেব ও রানাড়ে তাদের গুলি করেন। তারা পড়ে যায়। ঘটনার পর বাসুদেব ও রানাড়ে সরে পড়তে সক্ষম হন। গণেশ ও রামচন্দ্রের মৃত্যু হয় যথাক্রমে ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ তারিখে।

১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ বাসুদেব ও রানাড়েকে থানায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে নেওয়া হয়। তাঁরা দুজনেই গুলি ভরা রিভলবার নিয়ে থানায় যান। জিজ্ঞাসাবাদের সময় বাসুদেব পুলিস সুপারকে গুলি করতে উদ্যত হলে পুলিস সুপার ধাক্কা দিয়ে বাসুদেবের রিভলবার ফেলে দেন ও তাঁকে ধরে ফেলেন। রানাড়েও গ্রেপ্তার হন। র‍্যাণ্ড ও আয়ার্স্টের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে বাসুদেব ও রানাড়ের সম্পর্ক ধরতে পুলিসের বহু সময় লাগে। বাসুদেব ও রানাড়ের সেসন্স কোর্টে

বিচার শুরু হয় ২ মার্চ ১৮৯৯ সালে। ১৮৯৯ সালের ৩১ মার্চ হাইকোর্ট উভয়ের ফাঁসির হুকুম অনুমোদন করেন। বাসুদেবকে যখন ফাঁসি দেবার জন্য বালকৃষ্ণের সেলের সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তখন বাসুদেব বলে ওঠেন— "দাদা বিদায়, আমি যাচ্ছি।" বালকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন, "এসো, আমিও পরশু-দিন তোমাকে অনুসরণ করব।" বাসুদেব চাপেকার শান্ত সমাহিত ভাবে ফাঁসির দড়ি গলায় দেন— ৮ মে ১৮৯৯ সালে। ১০ মে ১৮৯৯ দুঃসাহসী রানাড়ের ফাঁসি হয়। আর ১২ মে ১৮৯৯ বালকৃষ্ণ চাপেকারের ফাঁসি হয়। সব ফাঁসিগুলিই যারবেদা জেলে হয়। এই শহীদদের রক্তে যারবেদা জেল পুণ্যতীর্থে পরিণত হয়েছে। পরে ভগিনী নিবেদিতা শহীদ চাপেকার ভাইদের মার সঙ্গে দেখা করেছিলেন পুনায়। সেই ধর্মপ্রাণ শান্ত মহিলার অবিচল ভাব দেখে নিবেদিতা অভিভূত হয়ে যান, তাঁকে প্রণাম করে আসেন। কারণ, চাপেকার ভাইদের মা ভগিনী নিবেদিতাকে বলেন— আমার আরো একটি সন্তান থাকলে তাকেও দেশের কাজে দিতাম। ভগিনী নিবেদিতা ভাবলেন— কাকে আমি সান্ত্বনা দিতে এসেছি!

১৮৯৭ সালের জুন মাসের ঘটনার পর পুলিস খুব তৎপর হয়ে ওঠে। কাথিয়া-বাড়ের শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা একজন উচ্চশিক্ষিত স্বদেশপ্রেমী— গ্রেপ্তার এড়িয়ে লণ্ডনে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তিনি তখন থেকেই ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় বিপ্লবী-দের একত্রিত করে বৈপ্লবিক কাজকর্ম চালাবার চেষ্টা করতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা একটি অপরিহার্য নাম।

১৮৯৯ সালে পুনার "মিত্রমেলা"— সশস্ত্র বিপ্লবই স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র পথ বলে ঘোষণা করে, সর্ব প্রথম।

বাংলার বিপ্লবপ্রচেষ্টা

বাংলাতেও বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০২ সালে সতীশচন্দ্র বোস "অনুশীলন সমিতি" প্রতিষ্ঠা করেন। নেতৃত্বে থাকেন ব্যারিস্টার পি. মিত্র (প্রমথ মিত্র)। এর পর বরোদা থেকে অরবিন্দ ঘোষের দ্বারা বাংলায় প্রেরিত হন তাঁর ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। ১৯০৪ সালে বারীন ঘোষ দ্বিতীয়বার বাংলায় আসার পর গুপ্ত সমিতির কাজ জোরদার হয়। ব্যারিস্টার পি. মিত্র, অরবিন্দ ঘোষ, রাজা সুবোধ মল্লিক, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সিস্টার নিবেদিতা প্রমুখের চেষ্টায় ও সহযোগিতায়। অচিরাৎ বাংলায় এই গুপ্ত সমিতি ও আত্মোন্নতি প্রভৃতি আরো কয়েকটি গুপ্ত সমিতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বাংলা বিভাগ, দেশের জাতীয়তাবোধকে দৃঢ় করতে ও সারা বাংলায় গুপ্ত সমিতি ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে। বোমা তৈরি চেষ্টা হতে থাকে ও অস্ত্র সংগ্রহও চলতে থাকে। ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে লেঃ গবর্নরের ট্রেন বিস্ফোরকের সাহায্যে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন বারীন ঘোষরা। ট্রেনের ইঞ্জিনের কিছু ক্ষতি হয়, আর কিছু হয় নি। পুলিস প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে সন্দেহ করতে পারে নি। কয়েকজন সাধারণ কুলীকে অভিযুক্ত করা হয় এবং তাদের বিভিন্ন মেয়াদের জেল হয়। ২৩ ডিসেম্বর ১৯০৭ সালে ঢাকায় একজন প্রাক্তন ইউরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেটকে বিপ্লবীরা গুলিবিদ্ধ করেন। চন্দননগরের মেয়র ১৩ ডিসেম্বর ১৯০৭ বোমা দ্বারা আক্রান্ত হন তাঁর বাড়িতে। এই কাজে ইন্দুভূষণ ও নরেন গোস্বামী জড়িত ছিলেন।

এই সময় উল্লাসকর দত্ত বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর খুব শক্তিশালী বোমা তৈরি করতে সক্ষম হন। সেই বোমা পরীক্ষা করার জন্য দেওঘরের দিঘীরিয়া পাহাড়ের উপরে, বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র-চক্রবর্তী, বিভূতিভূষণ সরকার, নলিনীকান্ত গুহ প্রভৃতি ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে যান। প্রফুল্ল চক্রবর্তী বোমাটি ফাটান— সেটি মাটিতে পড়বার আগে শূন্যেই ফেটে

যায়। বোমার আঘাতে প্রফুল্লর একটি চোখসহ কপালের এক অংশ উড়ে যায়। তিনি তৎক্ষণাৎ মারা যান। তাঁর দেহ সেইখানে পাথরের উপর পড়ে থাকে। কারণ সৎকার, বা সমাধিস্থ করার অসুবিধা ছিল। পরের দিন তাঁরা সেইখানেই প্রফুল্ল চক্রবর্তীর দেহ দেখতে পান। কিন্তু তার পরদিন তাঁরা সেখানে গিয়ে মৃত-দেহ দেখতে পান না। বহু অনুসন্ধানেও প্রফুল্ল চক্রবর্তীর মৃতদেহ বা পরিচ্ছদের কোনো অংশ তাঁরা বের করতে পারেন নি। বাংলায় বিপ্লববাদের প্রথম বলি—প্রফুল্ল চক্রবর্তী।

সারা ভারতের সব জাতীয়তাবাদী ও সাময়িক পত্রিকাগুলি এবং বাংলার পত্রিকাগুলিও, বিশেষ করে বিপ্লবীদের দ্বারা প্রকাশিত 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা', 'বন্দেমাতরম্' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি দেশের যুবসমাজের নৈতিক চরিত্র গঠনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই পত্রিকাগুলি খোলাখুলি ভাবে রক্তাক্ত বিপ্লবের ডাক দেয়। দেশবাসী ও যুবকগণ ইংরেজসরকারের অত্যাচারের প্রতিবাদে একতাবদ্ধ হতে থাকে, দেশে স্বাদেশিকতার জোয়ার বইতে থাকে।

এমনি সময় ইংরেজ সরকারের রুদ্র রোষ পড়ে ঐ পত্রিকাগুলির উপর। যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক, স্বামী বিবেকানন্দর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা শুরু হয় ২২ জুলাই ১৯০৭-এ। যুগান্তরের ১৬ জুন ১৯০৭ সংখ্যায় তাঁর দুটি নিবন্ধ "ভয় ভঙ্গ" ও "লাঠ্যৌষধি" প্রকাশের জন্য বিচারে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর এক বছর জেল হয়।

'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক স্বনামধন্য ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় গ্রেপ্তার হন ৩ সেপ্টেম্বর ১৯০৭। 'সন্ধ্যার' ১৩ আগস্ট ১৯০৭-এর সংখ্যায় তাঁর লেখা "এখন ঠেকেছি প্রেমের দায়ে" প্রবন্ধের জন্য বিচার শুরু হয় অক্টোবর ১৯০৭-এ। হার্নিয়া রোগে অসুস্থ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ক্যাম্পবেল হাসপাতালে (বর্তমানে নীলরতন সরকার হাসপাতাল) ভর্তি হন চিকিৎসার জন্য। সরকার পক্ষ তাঁকে আরো রাজদ্রোহাত্মক লেখার জন্য তিন-চারটি মামলায় আসামী করা সাব্যস্ত করে ও তাঁর আগের জামিন নাকচ হয়। তাঁর হার্নিয়া অপারেশন হয়। ২৭ অক্টোবর ১৯০৭ বেলা নয়টার ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ধনুষ্টঙ্কারে মারা যান। তিনি বলেছিলেন 'ব্রিটিশ সরকার আমাকে জেল দিতে পারবে না।' কার্যত তাই হল— কোনো জেলখানাই তাঁকে আটকাতে পারে নি।

'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়। ২৬ আগস্ট

১৯০৭ সালে এই মামলার সরকার পক্ষ শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র পালকে আসামী অরবিন্দ ঘোষের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য মানে। বিপিন পাল মহাশয় কোর্টে শপথ নিয়ে অরবিন্দর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় কোর্ট অবমাননার দায়ে অন্য একটি মামলায় ছয় মাসের কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন। ২৬ আগস্ট ১৯০৭ যখন ঐ মামলা চলতে থাকে তখন কোর্টে ও বাহিরে প্রচুর জনসমাগম হয়। পুলিস জনতাকে লাঠি দিয়ে প্রহার করতে থাকলে সুশীল সেন নামে ১৫ বছর বয়স্ক একজন বিপ্লবী এক পুলিস সার্জেণ্টের লাঠির আঘাতের প্রত্যাঘাত ক'রে তাকে ঘুসির পর ঘুসি মারে। সুশীলের বিরুদ্ধে মামলা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট সুশীলকে প্রকাশ্যে পনেরো ঘা বেত্রদণ্ডের হুকুম দেন ও তা পালন করা হয়। সারা দেশ ইংরেজ সরকারের এই ঔদ্ধত্য ও বর্বরতায় রোষে ফেটে পড়ে। সুশীল সেনের প্রতি সম্মান দেখাবার জন্য ন্যাশানাল কলেজ একদিন বন্ধ থাকে। ২৮ আগস্ট ১৯০৭ কলেজ স্কোয়ারে এক বিরাট জন-সভা হয় সুশীলের সংবর্ধনায়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিপ্লবী বীরকে সম্মানিত করার জন্য একটি সোনার মেডেল পাঠিয়ে দেন। মিটিঙের পর সুশীল সেনকে একটি ঘোড়ার গাড়িতে চড়িয়ে এক শোভাযাত্রা কলকাতা পরিক্রমা করে— গান গাওয়া হতে থাকে— 'যায় যাবে জীবন চলে, জগৎমাঝে তোমার কাজে, বন্দেমাতরম্ বলে, / বেত মেরে কি মা ভোলাবি, আমরা কি মায়ের সেই ছেলে।'

সব পত্রিকাগুলির রাজদ্রোহাত্মক মামলা হয় ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের কোর্টে। কিংসফোর্ডের দম্ভ, অহেতুক আক্রোশ ও বিচারের প্রহসনের জন্য দেশবাসী তাঁর উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ। বিপ্লবীরা কিংসফোর্ডের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হন। শোভাবাজারে রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ির ভিতরে একটি রুদ্ধদ্বার কক্ষে গুপ্ত সমিতির সর্বোচ্চ নেতাদের— (ব্যারিস্টার পি. মিত্র, অরবিন্দ ঘোষ ও রাজা সুবোধ মল্লিক) এক বৈঠক হয়। বাহিরে দরজায় পাহারা থাকেন বারীন ঘোষ নিজে। মিটিং শেষে নেতারা পিছনের দরজা দিয়ে চলে যান। অরবিন্দ দরজা খুলে বারীন ঘোষকে বলেন, **"Unanimous decision—Kingsford must die ; do the needful !"**

বারীন ঘোষ কাজে লেগে গেলেন। এই সময় কিংসফোর্ডকে মারার জন্য একটি বড়ো বই-এর মধ্যে বোমা রেখে তাঁর কাছে পাঠানো হয়। বইটি খুললেই বোমা ফেটে যেত এমন ব্যবস্থা করা ছিল। কিন্তু কিংসফোর্ড বইটি খোলেন নি। শোনা যায় সেই সুশীলই এটা পাঠিয়েছিলেন।

সরকার পক্ষও সাবধানতা অবলম্বন করে। কিংসফোর্ডকে মজঃফরপুরে সেসন্স-জজ পদে কলকাতা থেকে বদলী করা হয় ২৮ মার্চ ১৯০৮।

১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য বারীন ঘোষ, মেদিনীপুরের ক্ষুদিরাম বসু ও বগুড়া-রংপুরের প্রফুল্ল চাকী (তখন দীনেশচন্দ্র রায় নাম নিয়েছেন)-কে মজঃফরপুরে পাঠান। তাঁরা সেখানে এক ধর্মশালায় থাকেন ও সুযোগ খুঁজতে থাকেন। তাঁদের সঙ্গে তিনটি রিভলবার ও একটি শক্তিশালী বোমা ছিল।

১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিলের সন্ধ্যা ৮টায় ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী কিংস-ফোর্ডের বাড়ির কাছে একটি গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকেন। কিংসফোর্ড, তাঁর স্ত্রী এবং মিসেস কেনেডি ও মিস কেনেডি ক্লাব থেকে তাস খেলে ফিরছিলেন— দুইটি একই রকম এক ঘোড়ায় টানা খোলা ফিটন গাড়িতে। গাড়ি দুইটি কিংস-ফোর্ডের বাড়ির কাছাকাছি এলে, ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসেন। ক্ষুদিরাম কিংসফোর্ডের গাড়ি মনে করে কেনেডিদের গাড়িতে বোমা মারেন। প্রচণ্ড শব্দ হয়, গাড়িটি চুরমার হয়— মিসেস ও মিস কেনেডি গুরুতর আহত হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে মারা যান। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী দুজন দুই রাস্তা ধরেন।

প্রফুল্ল চাকী সমস্তিপুরে এসে (১ মে ১৯০৮) মোকামা ঘাটের টিকিট কিনে ট্রেনে চাপেন। তাঁকে ট্রেনে দেখে নন্দলাল ব্যানার্জি বলে একজন পুলিস সাব-ইন্‌সপেক্টারের সন্দেহ হয়। মোকামা ঘাট স্টেশনে প্রফুল্ল চাকী গ্রেপ্তার হন। চেষ্টা করে মুক্ত হয়ে তিনি প্ল্যাটফরম দিয়ে দৌড়তে থাকেন— প্ল্যাটফরমের শেষ প্রান্তে এসে দেখেন যে দুজন কনস্টেবল সেখানে আছে। পালানোর কোনো উপায় না দেখে তিনি ফিরে পুলিসের দিকে রিভলবারে গুলি ছোড়েন, গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তাঁকে পুলিস কনস্টেবলরা এসে ধরে ফেলে। কোনোরকমে ডান হাত মুক্ত করে তিনি রিভলবার দিয়ে নিজদেহে দুইটি গুলি করেন। একটি গুলি তাঁর চিবুকের নীচ দিয়ে ও আর একটি তাঁর বাঁ কাঁধের কলার বোনের নীচে লাগে। সঙ্গে সঙ্গেই প্রফুল্ল চাকীর মৃত্যু হয়— ১ মে ১৯০৮ সালের বিকাল ৬টায়। বিপ্লবের আর-একটি বলি হল। প্রফুল্ল চাকীকে সনাক্ত করার জন্য দেহ থেকে তাঁর মাথা কেটে নিয়ে স্পিরিটের জারে ডুবিয়ে কলকাতায় আনা হয়।

ক্ষুদিরাম খালি পায়ে মজঃফরপুর থেকে ২৪ মাইল দূরে ওয়াইনি স্টেশনে এসে

উপস্থিত হন। পরিশ্রমে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত ক্ষুদিরাম একটু দূরে বাজারে গিয়ে এক দোকানের কাছে চিড়ে খাচ্ছিলেন। এমন সময় সকাল ৮টায় তিনি গ্রেপ্তার হন ১লা মে ১৯০৮ সালে। সেইদিন সন্ধ্যার ট্রেনে ক্ষুদিরামকে মজঃফরপুরে আনা হয়। তাঁকে দেখার জন্য স্টেশনে খুব ভিড় হয়। ২১ মে ১৯০৮ মামলা হয়। ৮ জুন ১৯০৮-এ সেসন্স কোর্টে মামলা শুরু হয়। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসির হুকুম হয়। হাইকোর্টে আপিল হয়। হাইকোর্টে মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকে ১৩ জুলাই ১৯০৮-এ। ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট ভোর ৬টায়— মজঃফরপুর জেলে ক্ষুদি-রামের ফাঁসি হয়। ফাঁসির মঞ্চে তিনে হাসতে হাসতে ওঠেন। ফাঁসির আগে যখন তাঁর মাথায় টুপি পরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল তখনো তিনি হাসছিলেন। স্বাধীনতার অঙ্গনে আরো একটি বলি হল সেদিন।

আলিপুর বোমার মামলা :

ক্ষুদিরাম ধরা পড়ার পর ১৯০৮ সালের ২ মে কলকাতায় কতকগুলি জায়গায় পুলিস তল্লাসী করে, যথা : (১) ৩২ নং মুরারিপুকুর রোড, মানিকতলা বাগান, (২) ৩৪-৪, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, (৩) ১৫ নং গোপী মোহন দত্ত লেন, (৪) ১৩৪, হ্যারিসন রোড, আর তল্লাসী হয় 'শীল লজ', দেওঘর, শ্রীহট্টে ও মালদহে। প্রচুর বিস্ফোরক, বোমা, অস্ত্র, রিভলবার ও রাইফেল, বৈপ্লবিক ইস্তাহার ও কাগজপত্র, কাগজে লেখা বোমা তৈরি করার পদ্ধতি প্রভৃতি আবিষ্কার হয়।

সেদিন মানিকতলা বাগানে গ্রেপ্তার হন একচল্লিশ জন— বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অবিনাশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি। অরবিন্দ ঘোষও গ্রেপ্তার হন কলকাতায় অন্যত্র। কয়দিন পরে আরো অনেকে গ্রেপ্তার হন। তাঁদের বিরুদ্ধে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য ষড়যন্ত্র মামলা ও অন্যান্য ধারার মামলা রুজু হয়। আসামীদের দুই ভাগে বিচার হয়। প্রথম ভাগের ৩৮ জনের বিচার শুরু হয় ৪ মে ১৯০৮-এ আলিপুর কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ও চলে ১৮ আগস্ট ১৯০৮ সাল পর্যন্ত। উভয় দলের সকলকেই আলিপুর সেসন্স কোর্টে বিচারের জন্য পাঠানো হয়। আলিপুর সেসন্স কোর্টে বিচার শুরু হয় ১৯ অক্টোবর ১৯০৮ সালে। ১৯০৯ সালের ৬ মে আলিপুর সেসন্স কোর্টের রায় বের হয়। রায়ে বারীন্দ্র ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তর ফাঁসির হুকুম হয়।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো)-সহ দশ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় ও সাতজনের বিভিন্ন মেয়াদের জেল হয়। হাইকোর্টের আপিলে ২৩ নভেম্বর ১৯০৯এ বারীন্দ্র ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তের ফাঁসির হুকুম রদ হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। উপেন্দ্রনাথ ও হেমচন্দ্রের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বহাল থাকে, অন্যান্য সাজাও কম হয়ে যায়। পাঁচ জন আসামীর দণ্ড সম্বন্ধে হাইকোর্টের জজরা দ্বিমত হওয়ায়, তৃতীয় একজন জজের কাছে তাঁদের মামলা পেশ হয়। ১৯১০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারির রায়ে তিনজন খালাস পান, দুজনের সাজা বহাল থাকে। মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে সেই সুশীল সেনের বড়ো ভাই হেম সেন ও তিনি নিজে ছিলেন। সুশীল সেনের অপর বড়ো ভাই বীরেন সেনের দশ বছর জেল হয়। অরবিন্দ ঘোষ খালাস পান। আসামী পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন ব্যারিস্টার সি. আর. দাশ (দেশবন্ধু ও অন্যান্যরা)। বন্দীগণ বিচারকালে নির্ভীক ও নির্লিপ্ত থাকতেন। তাঁরা যেন জানতেনই কী হবে বিচারে। তাঁদের যখন ঘোড়ায় টানা বড়ো গাড়িতে পুলিস পাহারায় শৃঙ্খলিত অবস্থায় কোর্টে আনা হত ও কোর্ট থেকে আলিপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হত তখন তাঁরা— 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিতেন ও বিপ্লবের গান গাইতেন— 'আও মর্দানা, জঙ্গী জওয়ানা। জল্‌দী জল্‌দী লেও হাতিয়ার' প্রভৃতি। শেষ হল ইংরেজ উচ্ছেদের এক পর্ব। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও দীর্ঘ মেয়াদের বন্দীদের আন্দামান দণ্ডোপনিবেশে পাঠানোর ব্যবস্থা হতে লাগল। কিন্তু এর মধ্যেকার একটি ঘটনার কথা স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে লেখা রয়েছে। সেই ঘটনার উল্লেখ প্রসঙ্গত একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করি।

বিশ্বাসঘাতকের পুরস্কার :

আলিপুর বোমার মামলায় কানাইলাল দত্ত (চন্দননগর) গ্রেপ্তার হন ১৯০৮ সালের ২ মে, কলকাতায় ১৫নং গোপীমোহন লেন থেকে। শ্রীরামপুর থেকে গ্রেপ্তার হন নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ৫ মে ১৯০৮-এ। আর মেদিনীপুর থেকে গ্রেপ্তার হন সত্যেন্দ্রনাথ বোস। তিনি তখন অস্ত্র আইনের একটি মামলায় জেল খাটছিলেন। পুলিসের প্রলোভন ও প্ররোচনায় নরেন গোস্বামী সরকার পক্ষে রাজসাক্ষী হন। নরেন গোস্বামী ২৪, ২৫, ২৯ জুন এবং ৩ জুলাই ১৯০৮-এ

রাজসাক্ষী হিসাবে সরকার পক্ষে সাক্ষী দেন। তাঁর সাক্ষ্যে আরো অনেক গোপনে কথা প্রকাশ হতে লাগল। বন্দীরা বিচলিত হয়ে উঠলেন। নরেন গোস্বামীকে আলিপুর জেলে এই মামলায় অন্যান্য আসামীদের থেকে আলাদা করে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে রাখা হত। সত্যেন্দ্রনাথ বোস ক্ষয়রোগগ্রস্ত ছিলেন। তিনি ২৭ জুলাই ১৯০৮-এ জেল হাসপাতালে ভর্তি হন। ৩০ আগস্ট ১৯০৮ সালে সত্যেন্দ্র-নাথের সঙ্গে জেল গেটে তাঁর পরিচিত লোকদের দুবার সাক্ষাৎকার হয়। ঐ ৩০ তারিখের সন্ধ্যায় কানাইলাল দত্ত পেটের ব্যথার জন্য জেল হাসপাতালে ভর্তি হন ও তাঁকে হাসপাতালে অন্য ওয়ার্ডে রাখা হয়। সত্যেন্দ্রনাথ নরেন গোস্বামীকে জানান যে তিনিও নরেনের মতো সব স্বীকার করে রাজসাক্ষী হবেন— কেননা জেলের কষ্ট তাঁর আর সহ্য হচ্ছে না। পরে তাকে আরো জানান যে কানাইলালও স্বীকারোক্তি করবে। নরেন গোস্বামী জেল সুপারের সম্মতি নিয়ে ২৯ আগস্ট ১৯০৮-এ সন্ধ্যায় সত্যেন্দ্রর সঙ্গে দেখা করে। তার পরদিনও উভয়ের মধ্যে দেখা ও কথাবার্তা হয়। পরদিন ৩১ আগস্ট ১৯০৮-এ সকালে উভয়ের মধ্যে আবার কথা হবে ঠিক হয়। সেদিন 'হিগিন' নামে একজন কয়েদী ওভারসীয়ারের পাহারায় নরেন গোস্বামী সত্যেন্দ্রর সঙ্গে দেখা করতে আসে। সেই সময় কানাইলাল এসে পড়েন। নরেন গোস্বামী হাসপাতালের ডিস্পেনসারি ঘরে আসে প্রায় সকাল সাতটায়। কানাইলাল ও সত্যেন্দ্র ঐ ঘরে আসেন। 'হিগিন'কে ঘরে রেখে তিনজন বারান্দায় এসে কথা বলতে থাকেন। দশ মিনিটের মধ্যে গুলির শব্দ শোনা গেল। নরেন্দ্র চিৎকার করতে করতে ডিস্পেনসারি ঘরে ঢুকে পড়ে— পিছনে পিছনে সত্যেন্দ্র ও কানাইলাল আসেন রিভলবার হাতে। 'হিগিন' কানাইলালকে বাধা দিতে গেলে ডান হাতে কানাইলালের ছোঁড়া গুলি লাগে। নরেন্দ্র ডিস্পেনসারি থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামতে থাকে, কানাইলাল ও সত্যেন রিভলবার থেকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে তার পিছনে দৌড়ে আসেন। একটি গুলি নরেন্দ্রর কোমরে লাগে পেছন থেকে, নরেন্দ্র জেল গেটের দিকে দৌড়তে থাকলে, একজন কয়েদী ওভারসীয়র লিন্টন— সত্যেন্দ্রকে মাটিতে ফেলে দেয়, কানাইলালকে জাপটে ধরে ফেললে কানাইলাল তাঁর হাত মুক্ত করে খুব কাছ থেকে নরেন্দ্রকে গুলি করেন। নরেন্দ্র গুলি খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে পড়ে যায় জেল গেটের কাছাকাছি। শরীরের অর্ধেক ড্রেনে আর বাকী অর্ধেক মাটিতে পড়ে থাকে প্রাণহীন অবস্থায়। বিশ্বাসঘাতক তার পুরস্কার পেল— সেদিন

৩১ আগস্ট ১৯০৮-এ আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। কানাইলালের রিভলবারে ৫টি গুলি ছিল ও সত্যেনের রিভলবারে ৪টি গুলি ছিল : দুজনের সব গুলিই নিঃশেষ করা হয়েছিল।

কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বোসের বিরুদ্ধে সেসন্স কোর্টে মামলা হল, হত্যার অপরাধে। কানাইলাল তাঁর পক্ষে কোনো আইনজীবী নিযুক্ত করতে বা মামলায় কোনো অংশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। বিচার আরম্ভ হয় ৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৮ সালে। জুরীরা সকলেই কানাইলালকে দোষী সাব্যস্ত করে ও সত্যেন্দ্রনাথকে অধিকাংশ জুরী (৫ জনের মধ্যে ৩ জন) নির্দোষ বলেন। ফলে কানাইলালের মৃত্যুদণ্ডের হুকুম হয় ও সত্যেন্দ্রর মামলা হাইকোর্টে পাঠানো হয়। ২১ অক্টোবর ১৯০৮ সালে হাইকোর্ট কানাইলাল ও সত্যেন্দ্র, উভয়কেই মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত করেন। দুজনেই নির্ভীক ভাবে, নির্বিকার চিত্তে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকলেন। সে সময় কানাইলালের শরীরের ওজন ১৬ পাউণ্ড বেড়ে যায়। ফাঁসির আগের দিন রাত্রে কানাইলাল খুব ঘুমিয়েছিলেন। ভোরবেলা জেলের অফিসাররা তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে তোলেন ফাঁসির জন্য প্রস্তুত হতে। চার জন ইউরোপীয় গার্ড তাঁকে ফাঁসির মঞ্চ পর্যন্ত পাহারা দিয়ে নিয়ে যায়। তিনি দৃঢ় পদে হেঁটে যান। ফাঁসির মঞ্চে নিজেই ওঠেন নির্ভীক ভাবে। শহীদ হলেন কানাইলাল দত্ত— ১৯০৮ সালের ১০ নভেম্বর সকাল প্রায় ৭ টায়, আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে।

কানাইলালের দেহ দাহ করার জন্য কালীঘাটের কেওড়াতলা মহাশ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। জেল গেট থেকে স্বতঃস্ফূর্ত কয়েক হাজার লোকের এক শোভা-যাত্রা মরদেহ নিয়ে আসেন। শ্মশানেও কয়েকহাজার লোক অপেক্ষা করছিল। কানাইলালের দেহ দৃষ্টিগোচর হওয়ামাত্র সেই বিশাল জনতা কান্নায় ভেঙে পড়ে। সেই স্থানেই তৎক্ষণাৎ চাঁদা তুলে এক ভদ্রলোক বেশ কয়েক মন চন্দন কাঠ কিনে আনলেন দাহ করার জন্য। স্থানীয় পুষ্পব্যবসায়ীরা বিনামূল্যে তাঁদের সব ফুল মৃতদেহের ওপর ঢেলে দিলেন। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি ও কান্নার মধ্য দিয়ে কানাইলালের দেহ সৎকার হবার পর, তাঁর দেহের ছোটো ছোটো হাড়ের টুকরা পবিত্র স্মৃতি হিসাবে অনেকে নিয়ে গেলেন। কানাইলালের দেহভস্মাবশেষ ছাই গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া সম্ভব হয় নি। অনেকেই নানা পাত্রে, রুপার কৌটা প্রভৃতিতে সেই পবিত্র দেহভস্ম নিয়ে গেলেন। ছোটো ছোটো কাগজের প্যাকেটেও তা

কলকাতার বাইরে সব শহরে শহরে পার্শেল করে পাঠানো হয়। সেদিন বিকালে কলেজ স্কোয়ার থেকে কানাইলালের সম্মানে একটি শোভাযাত্রা বের হয়। গান হতে থাকে : "যায় যাবে জীবন চলে··· ।"

সত্যেন্দ্রনাথ বোসের ফাঁসি হয় আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে ২১ নভেম্বর ১৯০৮ সালের সকালে। ঐ জেলের মধ্যেই তাঁর দেহ দাহ করা হয়। কানাইলালের মরদেহ নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে যে উত্তেজনা দেখা গিয়েছিল, সরকার তাতে ভীত হয়ে জেল আইন সংশোধন করে (১৭ নভেম্বর ১৯০৮) সত্যেন্দ্রনাথের মরদেহ জেলের বাইরে কারো হাতে তুলে দিতে সাহসী হয় নি। চলে গেলেন—'ফাঁসির সত্যেন'। দেশমাতৃকার পাদমূলে আরো দুটির প্রাণ নিবেদিত হল।

আন্দামান সেলুলার জেলযাত্রী গুপ্তসমিতির প্রথম বিপ্লবীদল :

আলিপুর বোমার মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত দশজনকে আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠানো হল ডিসেম্বর ১৯০৯ সালে। যাঁদের আন্দামানে নিয়ে যাওয়া হল, তাঁরা হলেন— (১) বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, (২) উল্লাসকর দত্ত, (৩) উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (৪) হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো) —প্রত্যেকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। (৫) ইন্দুভূষণ রায় (৬) বিভূতিভূষণ সরকার, (৭) হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল —প্রত্যেকের দশ বছর করে কারাদণ্ড। (৮) সুধীরকুমার সরকার, (৯) অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, (১০) বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন —প্রত্যেকের আট বছর করে কারাদণ্ড।

এঁদের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুধীরকুমার সরকার অসুস্থ থাকায়, প্রথম দলের আর-সকলকে আন্দামানে নিয়ে যাবার ছয় সপ্তাহের মধ্যে, তাঁদের আন্দামানে নিয়ে যাওয়া হয়।

বারীন ঘোষ প্রভৃতি প্রথম দলের আট জনকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ী ও প্রত্যেককে একসঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে, পুলিস প্রহরায় খিদিরপুর ডকে নিয়ে গিয়ে ওঠানো হয়—এস. এস. 'মহারাজা' জাহাজে। আন্দামানের সঙ্গে ভারতের একমাত্র যোগাযোগ-রক্ষাকারী যান। জাহাজের খোলের মধ্যে মোটা লোহার শিক দিয়ে ঘেরা ঘরে হাতে হাতকড়ি ও পায়ে বেড়ী দেওয়া অবস্থায় তাঁদের রাখা হয়— খেতে দেওয়া হয় শুধু কিছু চিড়া ও গুড়। সমুদ্রের ভীষণ দোলানিতে মাথা-ঘোরা ও বমি হয় সব বন্দীদের। এই

ভাবে তাঁদের আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারে পৌঁছাতে সময় লাগে ৩ রাত ৩ দিন। আন্দামানে পোর্ট ব্লেয়ারের জেটিতে জাহাজ ভিড়বার পর তাঁদের নামানো হয় পায়ে বেড়ী ও একজনের হাতের সঙ্গে আর-এক জনের হাতে হাতকড়ি দেওয়া ও কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায়। জেটি থেকে তাঁদের হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় অনতিদূরে সেলুলার জেলের দিকে। তাঁদের মাথায় জামাকাপড়ের পুঁটুলি ও হাতে থালা-বাটি নিয়ে যেতে হয়। জেলে পৌঁছতেই তাঁদের ফটক খুলে জেলখানার ভিতরে ঢোকানো হল। উলঙ্গ করে তল্লাসী চালানোর পর তাঁদের আন্দামান সেলুলার জেলের কয়েদীদের জাঙ্গিয়া কুর্তা পরানো হয়। গলায় লোহার হাঁসুলীতে তাঁদের সেলুলার জেলের কয়েদী নম্বর দেওয়া হয়। আন্দামান সেলুলার জেল এইভাবে তার প্রথম রাজনৈতিক বন্দীদের অভ্যর্থনা করল। তাঁদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা সেলে রাখা হল। তাঁদের পরস্পরের সঙ্গে কথা বলা নিষেধ ছিল। ঢোকার পরই আন্দামান সেলুলার জেলের জেলার ব্যারি [Barry] সাহেবের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়। অত্যাচারী ব্যারীর পরিচয় তাঁরা তখনই পান। আহারের ব্যবস্থা ছিল— রেঙ্গুন চালের মোটা ভাত (পোকা ও কাঁকড় মিশ্রিত) ও মোটা রুটি। তরকারী হল কচুর গোড়া, ডাঁটাপাতা, চুপড়ী আলু, (চুপরীতে করে আনার সময় শুকিয়ে আমলকীর মতো), খোসা সমেত কাঁচা কলা ও পুঁই শাক, কাঁকড় ও ইঁদুরের নাদি সহ সিদ্ধ করা একটি বস্তু। দু বেলাই এই ব্যবস্থা। এ ছাড়া সপ্তাহে দুদিন দই বা একটু করে ঘোলের জল দেওয়া হত। আর মাঝে মাঝে সমুদ্রের মাছের ঘণ্ট রান্না হত। কিন্তু আঁশ ও কাঁটা শুদ্ধ রান্না হওয়ায় তা অখাদ্য হত। আর সকালে ভারতবর্ষের জেলের 'লাপসি'র-আন্দামানি সংস্করণ— —'কঞ্জি'—ফেনভাত।

সে সময় আন্দামান সেলুলার জেলে বন্দীদের দিয়ে যে-সব কাজ করানো হত, তার মধ্যে কতকগুলি হল— নারকেলের ছোবড়া পিটিয়ে তার বের করা, সেই তার দিয়ে দড়ি পাকানো ; সরিষা ঘানিতে পিষে তেল বের করা ; নারকেল ঘানিতে পিষে তেল বের করা ; নারকেলের মালা দিয়ে হুকা তৈরি করা ; জেলের বাইরে বনবিভাগের অধীনে জঙ্গল পরিষ্কার করা; ইঁট তৈরি করা ; বাঁধ বাঁধা প্রভৃতি। সবই কঠোর পরিশ্রম ও কষ্টের কাজ। "সকাল বেলা উঠিয়া শৌচকর্মের কিঞ্চিৎ পরেই সকলকে 'অন্ন' বা 'কঞ্জি' গলাধঃকরণ করিয়া 'ল্যাঙ্গোটী' আঁটিয়া ছোবড়া পিটিতে বসিয়া যাইতে হয়। প্রত্যেককে বিশটি নারিকেলের শুষ্ক ছোবড়া দেওয়া হয়।

একখণ্ড কাঠের উপর এক-একটি ছোবড়া রাখিয়া কাঠের মুগুর দিয়া পিটিতে পিটিতে ছোবড়াটি নরম হইয়া আসে, ছোবড়াগুলি পিটিয়া নরম হইলে তাহাদের উপরকার খোসা উঠাইয়া ফেলিতে হয়। তাহার পর সেইগুলি জলে ভিজাইয়া পুনরায় পিটিতে হয়। পিটিতে পিটিতে ভিতরকার ভুষি ঝরিয়া গিয়া কেবলমাত্র তার-গুলিই অবশিষ্ট থাকে। সেই তারগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া পরিষ্কার করিয়া প্রত্যহ একসেরের একটি গোছা প্রস্তুত করিতে হয়।" —উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নির্বাসিতের আত্মকথা', পৃ. ৭৯। খুবই কষ্টকর কাজ— ছোবড়া পিটতে পিটতে সারা হাতে ফোস্কা পড়ে যায়। আর বেলা তিনটার মধ্যে জেলার বা ডেপুটি জেলারের কাছে, এক সের এই নারকেলের তার জমা দিতে হয়, না পারলে প্রথম দিকে গালাগালি ও পরে শাস্তি পেতে হত। শাস্তি ছিল— বেত, পেনাল ডায়েট— দৈনিক ভাতের বদলে একপোয়া করে চাল গুড়া সেদ্ধ, হাতে পায়ে বেড়ী লাগানো অবস্থায় সেলে বন্ধ করে রাখা। সেলের দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো হাতকড়িতে হাত বাঁধা অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা প্রভৃতি।

ঘানিতে সরিষা পেষা কাজটি সবচেয়ে কঠিন। "ঘানি ছিল দুই প্রকার। একটির নাম হাত-কলু ও অপরটির নাম পা-কলু। হাত-কলু বা হাত-ঘানি থাকে সেলের বাইরে দেওয়ালের গায়ে, শুধু হাতলটি থাকে কুঠুরীর মধ্যে। কুঠুরীর ভেতর থেকে এই হাতল ঘোরাতে হয়। পা-কলু আমাদের দেশের ঘানির মতো। ঘানি-সংলগ্ন কাঠে বুক লাগিয়ে চক্রাকারে দৌড়ে দৌড়ে তেল পিষতে হয়। শুধু পার্থক্য এই যে, যে কাজ কলুর বলদ করে সে কাজ করতে হয় কয়েদীদের।"— সুধীরচন্দ্র দে, 'সাগর ঘেরা পাথর কারা'। প্রথম প্রথম ঘানি ঘোরাতে কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু তেল যতই কমে আসতে থাকে, ঘানি ততই শক্ত হয়ে ওঠে। হাত-ঘানির কাছে কয়েকজন সাধারণ কয়েদী হাতে ছোটো ছোটো লাঠি নিয়ে থাকত। ঘানি শক্ত হয়ে গেলে এরা হাতের ঐ লাঠি দিয়ে ঘানির ঐ শক্ত ডেলাটি ভেঙে ভেঙে দিত, আর জোরে হাতল ঘোরাতে বলত। হাতল ঘোরাবার সাহায্য তারা করতে পারত না। কেননা হাতল কুঠুরীর মধ্যে থেকে ঘোরাতে হয় আর সেটি থাকে তালা-বন্ধ। তেল পড়ার পাত্রটি থাকত বাইরে। সেলের মধ্যে যে কয়েদী হাতল ঘোরাত সে তেল দেখতে পেত না। ফলে বাইরে যে-সব সাহায্যকারী সাধারণ কয়েদী থাকত তারা তাদের পেয়ারের কয়েদীদের পাত্রে ঐ তেল ঢেলে দিয়ে তাদের কাজ পুরা করে দিত। কয়েদীদের সায়েস্তা করবার জন্যও এটা করা হত। ঘানিতে হাতল

ঘোরাতে ঘোরাতে হাতে ফোস্কা পড়ে যায় ; রক্ত বের হয়। মাথা ঘোরে, শরীর আড়ষ্ট হয়ে যায়। অমানুষিক পরিশ্রম।

পা-কলু ঘোরানো আরো কঠিন কাজ। "...কিছুদিন পরেই আমাদের জন-কতককে ঘানিতে দিয়া তেল পিষাইবার ব্যবস্থা করিলেন। উল্লাসকরকে যে সরিষা পিষিবার ঘানিতে জোড়া হইল তাহা অনেকটা আমাদের কলুর বাড়ির দেশী ঘানির মতো, আর হেমচন্দ্র, সুধীর, ইন্দু প্রভৃতি বাকী কয়েকজনকে যে ঘানিতে পাঠান হইল তাহা হাত দিয়া ঘুরাইতে হয়। প্রত্যহ এক-এক জনকে দশ পাউণ্ড সরিষায় তেল বা ত্রিশ পাউণ্ড নারিকেল তেল পিষিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। মোটা মোটা পালোয়ান লোকও ঘানি ঘুরাইতে হিমশিম খাইয়া যায়, আর আমাদের যে কি দশা হইল তাহা মুখে অবর্ণনীয়। জেলের যে অংশে তেলপেষা হয়, দুইজন পাঠান পেটি অফিসার ৫/৭ বছর জেল খাটা কয়েদী তখন সেখানকার হর্তাকর্তা। সেখানে ঢুকিবামাত্র তাহাদের মধ্যে একজন তাহার বদ্ধমুষ্টি আমাদের নাকের উপর রাখিয়া বেশ জোর গলায় বুঝাইয়া দিল যে কাজকর্ম ঠিক ঠিক না করিতে পারিলে সে আমাদের নাকগুলি ঘুসার চোটে থ্যাবড়া করিয়া দিবে। কিন্তু নাকের ভবিষ্যৎ দুর্দশার কথা ভাবিয়া সময় নষ্ট করিবার উপায় নাই। তাড়াতাড়ি কাঁধের উপর পঞ্চাশ পাউণ্ড নারিকেলের বস্তা ও হাতে একটা বালতি লইয়া তেতলায় চড়িয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। আর সে ত কাজ নয়, রীতিমত মল্ল যুদ্ধ। আট দশ মিনিটের মধ্যেই দম চড়িয়া জিভ শুকাইতে আরম্ভ হইল। এক ঘণ্টার মধ্যেই গা হাত পা যেন আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। রাগের চোটে মনে মনে সুপারিন্টেনডেণ্ট সাহেবের পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম, কিন্তু সে নিষ্ফল আক্রোশ। একবার মনে হইল ডাক ছাড়িয়া কাঁদিলে বুঝিবা জ্বালা মিটিবে, কিন্তু লজ্জায় তাহাও পারিলাম না। দশটার ঘণ্টার পর যখন আহার করিতে নীচে নামিলাম, তখন হাতে ফোস্কা পড়িয়াছে, চোখে সরিষার ফুল ফুটিতেছে আর কানে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকিতেছে।...একে ত আন্দামান নিকোবর ম্যানুয়েল অনুসারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর মানে পঁচিশ বৎসর এইরূপ কর্মভোগ, তাহার পরও খালাস পাওয়া সরকার বাহাদুরের ইচ্ছাধীন। মনে হইতে লাগিল গলায় এক গাছা দড়ি লইয়া নাহয় ঝুলিয়া পড়ি। কিন্তু সাহসে কুলাইল না। কাজে কাজেই যথা সাধ্য তেল পিষিয়া সরকারের তেলের গুদাম ভরতি করিতে লাগিলাম।"

—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নির্বাসিতের আত্মকথা', পৃ. ৮২-৮৩

বলদের বদলে কয়েদীকে দিয়ে ঘানি ঘোরানো হলে, তাকে ঘানির সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হত। বুকে ঘানির কাঠ ঠেকিয়ে সেই ঘানি ঘোরাতে হত। ভীষণ পরিশ্রম—অল্পক্ষণের মধ্যেই কয়েদীদের মাথা ঘুরত, বমি ভাব হত ও অজ্ঞান হয়ে পড়ত। কিন্তু পেটি অফিসারদের অকথ্য গালাগালি ও মারের চোটে কয়েদী আবার খাড়া হয়ে ঘানির সঙ্গে ঘুরত। প্রহারের ভয়ে অজ্ঞান হওয়াও চলত না।

এইভাবে আন্দামান সেলুলার জেলে আলিপুর বোমার মামলায় রাজনৈতিক বন্দীদের দিন কাটতে থাকে।

"এইরূপে ছয় মাস যাইতে না যাইতে নাসিক, খুলনা ও এলাহাবাদ হইতে দশ বারোজন রাজনৈতিক কয়েদী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সর্বসমেত আমাদের সংখ্যা হইল প্রায় বিশ-বাইশ জন।"

—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নির্বাসিতের আত্মকথা', পৃ. ৮১

অভিনব ভারত সোসাইটি—গণেশ সাভারকর—
জ্যাক্‌সন হত্যা—বীর সাভারকর—
নাসিক-ষড়যন্ত্র মামলা

ভারতের পশ্চিম অংশেই প্রথম বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়। পূর্বে উল্লিখিত নাসিকের "মিত্রমেলা", যা পরে "অভিনব ভারত সোসাইটিতে" পরিণত হয়, তার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ভি. ডি. সাভারকর-এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডি. জি সাভারকর—বিনায়ক গণেশ সাভারকর। "অভিনব ভারত সোসাইটি" খোলাখুলি ভাবে সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক দেয় ও বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ের করণীয় হিসাবে ইংরেজ ও ভারতীয় অফিসারদের হত্যার কথা প্রচার করতে থাকে। বস্তুত, গণেশ সাভারকরই এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। **"In Ganesh Savarkar was epitomised all that was Patriotic and noble for the Country." —K. C. Ghosh. *The Roll of Honour*, p 216**। অচিরেই "অভিনব ভারত সোসাইটি" বোম্বাই, নাসিক, পুনা, পেন, ঔরঙ্গাবাদ, হায়দ্রাবাদ, গোয়ালিয়র প্রভৃতি ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে কাজ করতে থাকে। ইংরেজ সরকার গণেশ সাভারকরকে শাস্তি দেবার মতলব আঁটতে থাকে। এই সময় গণেশ সাভারকর 'লঘু অভিনব ভারতমেলা' নামে একটি দেশাত্মবোধক কবিতা পুস্তক ছাপিয়ে প্রচার করেন। গবর্নমেণ্ট এই পুস্তকটি বাজেয়াপ্ত করেন ও গণেশ সাভারকরের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা হয়। ১৯০৯ সালের ৯ জুন এই মামলায় গণেশ সাভারকরের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। বিচারক ছিলেন নাসিকের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জ্যাক্‌সন (**Jackson**)। সারা দেশে এই বিচারের প্রহসন ও কঠিন শাস্তির সমালোচনা হতে থাকে। দেশবাসী ক্ষুব্ধ হয়। নাসিকের "অভিনব ভারত সোসাইটি"র সভ্যদের মধ্যে কয়েকজন জ্যাক্‌সন সাহেবকে হত্যা করে এর প্রতিবাদ জানাবার সংকল্প করেন।

ঔরঙ্গাবাদের অনন্ত লক্ষ্মণ কানহেরী, নাসিকের বিনায়ক নারায়ণ দেশপাণ্ডে

(একজন শিক্ষক), কৃষ্ণগোপাল কার্ভে ও আরো কয়েকজন এই পরিকল্পনা সফল করার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। ইতিমধ্যে জ্যাক্‌সনের নাসিক থেকে পুনায় বদলীর হুকুম হয়। জ্যাক্‌সনকে বিদায় সংবর্ধনা দেবার জন্য নাসিকের বিজয়ানন্দ থিয়েটার হলে একটি সভা ও জলসার আয়োজন করেন নাসিকের জনসাধারণ ২১ ডিসেম্বর ১৯০৯ সালে। কানহেরী একটি পিস্তল, একটি রিভলবার ও এক প্যাকেট আর্সেনিক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে ঐ থিয়েটার হলে, জ্যাক্‌সনের বসার নির্দিষ্ট আসনের কাছাকাছি বসে থাকেন। এই দুই কাজে তিন জন হলে উপস্থিত থাকেন। জ্যাক্‌সনের আসনের খুব কাছে একজন বসেন। কানহেরী কৃতকার্য হতে না পারলে তিনি অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করবেন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিও কৃতকার্য হতে না পারলে দেশপাণ্ডে যাতে জ্যাক্‌সনকে মারতে পারেন সেই রকমভাবে প্রস্তুতি নিয়ে দেশপাণ্ডেও কাছাকাছি বসে থাকেন। যথাসময়ে জ্যাক্‌সন এসে তাঁর আসনের কাছাকাছি পৌঁছতেই, কানহেরী উঠে জ্যাক্‌সনের সামনে আসেন ও জ্যাক্‌সনকে পরপর পিস্তলের ছয়টি গুলি করেন। জ্যাক্‌সনের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। কানহেরী ধৃত হন, আর্সেনিক মুখে দিয়ে আত্মহত্যা করায় সুযোগ পেলেন না। এই ঘটনার অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সকলেই ধরা পড়েন। জ্যাক্‌সনকে হত্যা ও হত্যার চক্রান্তের দায়ে তাঁদের বিচার হয়। হাইকোর্টে ২৯ মার্চ ১৯১০ সালে কানহেরী, কার্ভে ও দেশপাণ্ডের ফাঁসির হুকুম হয়; অন্য তিনজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও একজনের দুই বছরের জেল হয়। ১৯ এপ্রিল ১৯১০ সালে সকাল সাতটায় থানা স্পেশাল জেলে অনন্ত লক্ষ্মণ কানহেরী, কৃষ্ণগোপাল কার্ভে ও বিনায়ক নারায়ণ দেশপাণ্ডের ফাঁসি হয়। দেশমাতৃকার চরণে নিবেদিত হল আরো কয়েকটি প্রাণ।

এর পরেই প্রথম নাসিক-ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়, আটাত্রিশ জন আসামীকে নিয়ে। বন্দী গণেশ সাভারকরও তাঁদের মধ্যে একজন। ২৪ ডিসেম্বর ১৯১০ এই ঐতিহাসিক মামলার রায়ে গণেশ সাভারকর ও বামন যোশী বা দাজী-র যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। বাকী সকল আসামীরই বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়।

গণেশ সাভারকরের অন্যতম ভ্রাতা—বিনায়ক দামোদর সাভারকর লণ্ডনে ব্যারিস্টারি পড়েছিলেন। সেখানকার ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে তিনিও একজন। ভারতের "অভিনব ভারত সোসাইটি"কে বিশেষ করে, বহু পিস্তল, রিভলবার ইংলণ্ড থেকে পাঠিয়ে তিনি নানা সহায়তা করছিলেন।

পয়লা জুলাই ১৯০৯-এ লণ্ডনে মদনলাল ধিংড়া উইলি (Willey) সাহেবকে হত্যা করেন রিভলবার দিয়ে। লণ্ডনের পেন্‌টনভেলি জেলে ১৭ আগস্ট ১৯০৯ সালে মদনলাল ধিংড়ার ফাঁসি হয়। সাভারকর তখন প্যারিসে ছিলেন। সেখান থেকে ১৯১০ সালের ১৩ মার্চ তিনি লণ্ডনে আসেন। ভিক্টোরিয়া স্টেশনে ট্রেন পৌঁছানো মাত্র তিনি গ্রেপ্তার হন। "এস এস মোরিয়া" জাহাজ সাভারকরকে নিয়ে ভারতে রওনা হয়। ৭ জুলাই ১৯১০-এ জাহাজটি মার্সাই-এর কাছে নোঙর করে। ভোরবেলা জাহাজের বাথরুমের পোর্ট হোল দিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন সাভারকর। গুলি বর্ষণের মধ্যেও সাঁতরে বন্দরের খাড়া দেওয়ালের কাছে তিনি পৌঁছান; অতিকষ্টে তীরে পৌঁছে তিনি দৌড়াতে থাকেন। কিন্তু ব্রিটিশ পুলিস ফরাসী পুলিসের সহায়তায় সাভারকরকে আবার গ্রেপ্তার করে জাহাজে নিয়ে আসে। ২২ জুলাই ১৯১০এ জাহাজ তাঁকে নিয়ে বোম্বাই পৌঁছায়। নাসিক জেলে তাঁকে রাখা হয়। সরকার দ্বিতীয় নাসিক-ষড়যন্ত্র মামলা রুজু করে। সাভারকারের বিরুদ্ধে তিনটি মামলা হয়। স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যাল গঠিত হয়— গবর্নমেণ্টের হুকুম: সেখানে জুরী থাকবে না, রায়ের বিরুদ্ধে আপিলও চলবে না। প্রথম মামলায় ২৩ ডিসেম্বর ১৯১০-এ সাভারকরের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। জ্যাক্‌সন-হত্যার প্ররোচনা ও সাহায্য করার অপরাধের মামলায় সাভারকরের দ্বিতীয়বার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয় ৩১ জানুয়ারি ১৯১১ সালে। শুধু ভারতীয় নয় পৃথিবীর বিপ্লবীদের মধ্যে বিরল ঘটনা দুই সাভারকর ভাই— গণেশ সাভারকর ও বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে একই সঙ্গে পরপর দুবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের হুকুম দেওয়া হয়— পঁচিশ বছর, ক'রে এক-এক জনের মোট পঞ্চাশ বছর। আগেই গণেশ সাভারকার ও বামন যোশী বা দাজীকে আন্দামান সেলুলার জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯১১ সালের ৪ জুলাই এস. এস. মহারাজা, জাহাজ বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে আন্দামান সেলুলার জেলে পৌঁছে দেয়।

খুলনা-ষড়যন্ত্র মামলা

আলিপুর বোমার মামলা রায়ের পর, বাংলার বিভিন্ন জেলায় সরকার বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ডাকাতি ও রাজদ্রোহমূলক ষড়যন্ত্র মামলা রুজু করে। তার মধ্যে খুলনা-ষড়যন্ত্র মামলায় এগারোজনের বিরুদ্ধে স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল বিচার

শুরু হয় ১৮ জুলাই ১৯১০ সালে। ৩০ আগস্ট ১৯১০-এর রায়ে পাঁচ জনের সাত বছর, দুই জনের তিন বছর ও তিন জনের পাঁচ বছর করে জেল হয়। একজন খালাস পান। কারাদণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে ছিলেন অশ্বিনীকুমার বসু, ভূপেন্দ্রনাথ দে, সুধীরচন্দ্র দে, অবনী চক্রবর্তী, সতীশ চ্যাটার্জি, শচীন বাবু প্রভৃতি। অল্প-দিনের মধ্যেই তাঁদেরও স্থান হয় আন্দামান সেলুলার জেলে।

'স্বরাজ্য পত্রিকা' ও আন্দামান সেলুলার জেল

বাংলায় বিপ্লবপন্থী কাগজগুলির মতো মহারাষ্ট্রের 'কাল' পত্রিকা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। যুক্তপ্রদেশেও এই ধরনের কিছু পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। তার মধ্যে 'স্বরাজ্য'-ই বিশেষ নাম করে। 'স্বরাজ্য' উর্দু পাক্ষিক পত্রিকা, প্রথম বের হয় এলাহাবাদ থেকে (৯ নভেম্বর ১৯০৭)। প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শান্তিনারায়ণ ভাটনগর। চার মাসের মধ্যেই "ক্ষুদিরামের মাতার আক্ষেপ"-সূচক একটি কবিতা 'স্বরাজ্যে' ছাপানোর জন্য শান্তিনারায়ণ ভাটনগরের বিরুদ্ধে এলাহাবাদ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ১২৪ক ধারার মামলা হয়। শান্তিনারায়ণের সাড়ে তিন বছর জেল এবং একহাজার টাকা জরিমানা হয়; অনাদায়ে আরো ছমাস জেল। তারপর 'স্বরাজ্যে'র সম্পাদক হন— রামদাস সুরালিয়া। তিনি পত্রিকাটির দুই সংখ্যা মাত্র বের করার পর শান্তিনারায়ণ ভাটনগরের নির্দিষ্ট জরিমানার টাকা আদায়ের জন্য সরকার স্বরাজ্য প্রেস নিলাম করে। সুরালিয়া গ্রেপ্তার এড়িয়ে অজ্ঞাতবাসে থাকেন। তার পর 'স্বরাজ্যে'র নতুন প্রেস হল— সম্পাদক হলেন সদ্য ইংলণ্ড-প্রত্যাগত, হরিয়ানার হোতিলাল ভার্মা। তিনি কয়েক সংখ্যা 'স্বরাজ্য' বের করার পর তাঁর বিরুদ্ধে ১২৪ক ধারার মামলা হয়। হোতিলালের দশ বছর দ্বীপান্তর কারাবাসের হুকুম হল। এর পর বাবু রামহরি 'স্বরাজ্যে'র সম্পাদক হন। তাঁর দ্বারা সম্পাদিত 'স্বরাজ্য'র প্রথম সংখ্যা "সিপাহীযুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পূর্তি" সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়, বাবু রামহরি মাত্র ১১টি সংখ্যা প্রকাশ করতে পেরে-ছিলেন। রাজদ্রোহাত্মক সম্পাদকীয় লেখার জন্য তাঁর সাত বছর জেল হয়। তখন 'স্বরাজ্যে'র সম্পাদক হওয়া একটি গৌরবের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় ও অনেকেই 'স্বরাজ্যের' সম্পাদক হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। লাহোরে 'সাহিক' পত্রিকার সম্পাদক মুন্সি রামসেবক 'স্বরাজ্য'র সম্পাদক হওয়ার জন্য এলাহাবাদে এলেন। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ঘোষণাপত্র (Declaration) জমা দেবার সময় 'সাহিক'-এ

রাজদ্রোহাত্মক রচনা লেখার জন্য তিনি গ্রেপ্তার হয়ে লাহোরে প্রেরিত হন। তাঁর সাত বছর জেল হয়। তার পর 'স্বরাজ্য'-এর সম্পাদক হন লাহোরের 'ইনক্লাব' পত্রিকার সম্পাদক নন্দগোপাল চোপরা, বার-অ্যাট-ল। 'ইনক্লাবে' রাজদ্রোহমূলক লেখার জন্য তাঁর আগেই চার বছর জেল হয়। সেই মামলায় আপিল করায় তিনি এই সময় জামিনে মুক্ত ছিলেন। 'স্বরাজ্য'র প্রায় বারোটি সংখ্যা তাঁর সম্পাদনায় বের হবার পর, নন্দগোপাল রাজদ্রোহাত্মক রচনার জন্য পুনরায় গ্রেপ্তার হন। তাঁর দশ বছর দ্বীপান্তর কারাবাসের হুকুম হয়। তার পর লাহোরে 'ভারত মাতা' পত্রিকার সম্পাদক শ্যামদাস বর্মা 'স্বরাজ্য'র সম্পাদক হন। কিন্তু সুফী অম্বাপ্রসাদ ও সর্দার অজিত সিং পারস্যে পালিয়ে যাওয়ায় বিশেষ জরুরী কাজের জন্য তাঁকে লাহোরে চলে যেতে হয়। তাঁর জায়গায় সম্পাদক হলেন— লোধারাম কাপুর। এই সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে বারো জন পত্রিকাটির সম্পাদক হবার জন্য আবেদন করেছিলেন। লোধারাম তখন সবেমাত্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে এসেছেন। কয়েক সংখ্যা 'স্বরাজ্য' সম্পাদনার পর রাজদ্রোহমূলক লেখার জন্য তাঁরও দশ বছর দ্বীপান্তর কারাবাসের হুকুম হল। এর পর পণ্ডিত অমীর চাঁদ বম্বেওয়ালা 'স্বরাজ্য'র সম্পাদক হন। কিন্তু এই সময় সংবাদপত্র আইন (Press Act) প্রয়োগ করে গবর্নমেণ্ট ১৯১০ সালের ২২ অক্টোবর 'স্বরাজ্য' পত্রিকার প্রকাশ চিরতরে বন্ধ করে দেয়।

এর পর পণ্ডিত রামচন্দ্র লাল শর্মা—ঘুরে ঘুরে রাস্তায় রাস্তায় বক্তৃতা দিয়ে 'স্বরাজ্য' পত্রিকায় অংশবিশেষ ও কলকাতার 'যুগান্তর' কাগজের কিছু কিছু অংশ পড়ে শোনাতে থাকেন। তাতে জনসাধারণের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা হতে থাকে। গবর্নমেণ্ট রামচন্দ্র লালকে গ্রেপ্তার করে দশ বছর জেল দেয়।

'স্বরাজ্য' পত্রিকায় সকল সম্পাদকের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলায় ভূতপূর্ব কংগ্রেস সভাপতি পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন আসামী পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন; শুধু বিনা পারিশ্রমিকে নয়, তিনি নিজেও তাঁদের টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য-এর ব্যক্তিগত অনুরোধে তিনি এ কাজে সম্মত হয়েছিলেন। হোতিলাল ভার্মা, বাবু রামহরি, নন্দগোপাল চোপরা, লোধারাম কাপুর, রামচন্দ্র লাল শর্মা দ্বীপান্তর কারাবাসের জন্য অচিরেই আন্দামান সেলুলার জেলে এসে উপস্থিত হলেন। এইভাবে প্রথম পর্যায়ে ২০/২২ জন রাজনৈতিক বন্দী আন্দামান সেলুলার জেলে দণ্ড ভোগ করবার জন্য এসে পৌঁছলেন।

আন্দামান সেলুলার জেলের প্রথম রাজনৈতিক বন্দীদের নরকযন্ত্রণা ভোগ

আন্দামান সেলুলার জেলে রাজনৈতিক বন্দীগণ কঠোর পরিশ্রম করে শাস্তি ভোগ করতে লাগলেন। আর সহ্য করা যায় না— এমন অবস্থায় নন্দগোপাল চোপড়া ঘানি ঘোরাতে অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন—"আমি কলুর বলদ নই যে দৌড়ে দৌড়ে ঘানি ঘোরাব। ঘানি আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে ঘুরবে। দিনে তো ছয় পয়সার খোরাক পাই না, তা ত্রিশ পাউণ্ড তেল পিষব কি করে?' জেল কর্তৃপক্ষ হুলুস্থুল বাধালো। কিন্তু নির্বিকার নন্দগোপাল হাসিমুখেই রইলেন। তাঁকে দিয়ে ঘানি ঘোরাবার আর কোনো আশা নাই বুঝতে পেরে জেল সুপারিন-টেন্‌ডেণ্ট তাঁর পায়ে বেড়ী দিয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য জেলে বন্ধ করে রাখলেন। হুকুম হল সকলকেই তিন দিন করে ঘানি ঘোরাতে হবে। সব বন্দীই বুঝতে পারলেন, জেলের কাজ সম্বন্ধে একটা সহনীয় পাকা ব্যবস্থা না করতে পারলে— সকলকেই এই সেলুলার জেলে দেহরক্ষা করতে হবে। অনেকেই ঘানিতে কাজ অস্বীকার করলেন। ফলে ধর্মঘট শুরু হল।

জেল-কর্তৃপক্ষ যেন আনন্দে উল্লসিত হল। রাজনৈতিক বন্দীদের সাজার পর সাজা হতে লাগল। চার দিন 'কঞ্জি' ভক্ষণ ও সাত দিন দাঁড়া হাতকড়ি পার হয়ে গিয়েও (জেলের আইন অনুসারে চার দিনের বেশি একসঙ্গে "কঞ্জি" খাওয়াবার নিয়ম ছিল না) উল্লাসকর দত্ত, নন্দগোপাল ও হোতিলালকে বারো-তেরো দিন "কঞ্জি"— গুঁড়া চাল ফুটন্ত জলে দিয়ে, দিনে দুইবার আধ পাউণ্ড করে, খাইয়ে রাখা হল।

বন্দীদের সাজা দেওয়া অব্যাহত রইল। পরে তাঁদের এক-একজনকে তিন-চারটি সেল পরে পরে একটি করে সেলে সারা দিনরাত আটক করে রাখা হত। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলতে পারতেন না। কথা বলার চেষ্টা করলেই আবার সাজা হত। অনেককেই এইভাবে তিন মাসের বেশি বন্দী থাকতে হয়। বন্দীদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে লাগল। জেল-কর্তৃপক্ষ তখন কাজকর্মের একটু পরিবর্তন করল। বন্দীদের মধ্যে বেছে বেছে কিছু ব্যক্তিকে জেলের বাইরে কাজ করতে পাঠানো হল। বারীন ঘোষকে পাঠানো হল রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে মজুরী করতে। উল্লাসকর দত্তকে পাঠানো হল মাটি কেটে ইট তৈরি করতে। কাউকে কাউকে বাইরে জঙ্গল কাটতে পাঠানো হল, কাউকে বা বাঁধ বাঁধতে। এইভাবে ধর্মঘট শেষ হল।

কিন্তু বাইরে যাঁরা কাজ করতে গেলেন, তাঁরা ভীষণ বিপদে পড়লেন। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে, জোঁকের সঙ্গে যুদ্ধ করে, আধপেটা খেয়ে তাঁরা অবসন্ন হয়ে পড়লেন। তাঁদের খাবার জেল কর্মচারীরা জেলের বাইরে গ্রামের লোকের কাছে বিক্রি করে দিতেন। এর কোনো প্রতিকার ছিল না।

এমনি অবস্থায় এক এক করে সকলেই অসুস্থ হয়ে সেলুলার জেলে ফিরে আসতে লাগলেন, জ্বরে ধুঁকতে ধুঁকতে, বিছানা থালা বাটি ঘাড়ে করে পাঁচ-সাত-দশ মাইল পথ হেঁটে। সেলুলার জেলের হাসপাতাল-সংলগ্ন সেলগুলিতে তাঁদের দিনরাত বন্দী করে রাখা হল। জেলখানার বাইরের হাসপাতালগুলিতে তাঁদের চিকিৎসা করানো নিষেধ ছিল।

অন্য সকলের মতো ইন্দুভূষণও বাইরের কাজ থেকে ফিরে এসে সেলে বন্দী হলেন। জেলখানার দৈনন্দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপমানে তিনি ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন। অবশেষে ২৯ এপ্রিল ১৯১২ তারিখ রাত্রেই ইন্দুভূষণ তাঁর কুর্তা ছিঁড়ে দড়ি পাকিয়ে সেলের একমাত্র ঘুলঘুলির সঙ্গে বেঁধে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলেন —দুই বছর চার মাস সেলুলার জেলে জেলখাটার পর। সেই রাত্রে বার বার খবর দেওয়া সত্ত্বেও জেল সুপার আসেন না ; পরদিন সকাল আটটায় আসেন। সেইদিন রাত্রে জেলারের সঙ্গে যে-সব প্রহরী ইন্দুভূষণের সেলে ঢুকেছিল, তাদের সকলেই বলে যে— তাঁর গলার হাঁসুলীতে (জেলের লোহার হাঁসুলী-টিকিট) এক খণ্ড লেখা কাগজ বাঁধা ছিল। কিন্তু সেই কাগজের কোনো হদিসই পাওয়া যায় না। জেলার তা অস্বীকার করে। ভি. ডি. সাভারকর লিখেছেন— "রোজ সন্ধ্যাবেলা দেখতাম ইন্দুভূষণ কলু থেকে ফিরছে— অত্যন্ত ক্লান্ত, সারা শরীর ঘামে ভেজা, মাথা ভরতি ধুলো, পায়ে ভারী বেড়ী। ইন্দুভূষণের পিঠে ছোবড়ার বস্তা, ঘাড়ে সারাদিনের কাজ— তেলের টিন। পিঠ বেঁকে যেত বোঝার ভারে। 'এরকম জীবনের কোন মানে হয় না'— ইন্দু বলত মাঝে মাঝে। আমি বোঝাতাম— সহ্য করো ভাই। তোমার তো দশ বছর মাত্র, তার পর স্বাধীন জীবন। কত কাজ তোমার করতে হবে দেশের জন্য। যেমন করে হোক বেঁচে থাকতেই হবে। দেখছ না পঞ্চাশ বছরের কারাদণ্ড নিয়ে আমি বেঁচে আছি।"

—**V. D. Savarkar,** ***Story of my Transportation for Life.***

"এই সময়ে অনেকেই কাজের তাড়ায় বাহির হইতে ভিতরে চলিয়া আসিতে লাগিলেন। উল্লাসকরও তাহাই করিলেন। তাঁহাকে রৌদ্রে ইট তৈয়ারি করিতে

দেওয়া হইয়াছিল। সেখানকার হাসপাতালের যিনি জুনিয়র মেডিকেল অফিসার তিনি বলিলেন যে— উল্লাসকরের রৌদ্রে কাজ করা সহ্য হইবে না। কিন্তু বাঙালী ডাক্তারের কথা গোরা ওভারসীয়র (Overseer) সাহেব গ্রাহ্য করিবেন কেন? উল্লাসকরকে সেই কার্যেই বহাল রাখা হইল। ফলে তিনি কাজ করিতে অস্বীকৃত হইয়া পুনরায় জেলে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে, 'শুধু পীড়নের ভয়ে কাজ করিতে হইলে মনুষ্যত্ব সঙ্কুচিত হইয়া যায়; সাজার ভয়ে কাজ করিতে তিনি রাজী নহেন, তাঁহার সাতদিন দাঁড়াহাতকড়ির ব্যবস্থা হইল। কিন্তু সাতদিন আর পূর্ণ হইল না। প্রথমদিনই বেলা ৪ টার সময় হাতকড়ি খুলিতে গিয়া পেটি অফিসার দেখিল যে, উল্লাসকর জ্বরে অজ্ঞান হইয়া হাতকড়িতে ঝুলিতেছে। তখনই তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হইল। রাত্রে শরীরের উত্তাপ ১০৬ ডিগ্রী পর্যন্ত চড়ে। প্রাতঃকালে দেখা গেল যে জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে কিন্তু উল্লাসকর আর সে উল্লাসকর নাই। আসন্ন বিপদের মধ্যেও যিনি চিরদিন নির্বিকার, তীব্র যন্ত্রণায় যাঁহার মুখ হইতে কখনও হাসির রেখা মুছে নাই, তিনি আজ উন্মাদরোগগ্রস্ত।"

—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নির্বাসিতের আত্মকথা', পৃ. ৯৬

উল্লাসকর দত্তকে পরে ১৯১৩ সালের জানুয়ারি মাসে আন্দামান সেলুলার জেল থেকে বদলী করে মাদ্রাজ জেলে আনা হয়।

ইন্দুভূষণ ও উল্লাসকর দত্তর ঘটনা দুটি বন্দীদের মনে সেলুলার জেলের প্রকৃত চিত্র ফুটিয়ে তোলে। তাঁরা বুঝলেন কাজের সুরাহা না হলে জেলেই জীবন শেষ হবে তাঁদের। পুষ্টিকর খাদ্য ও পরিধান; পরিশ্রম থেকে অব্যাহতি ও পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা— এই তিনটি দাবিতে তাঁরা ধর্মঘট শুরু করলেন।

এর কিছু আগে ডালহৌসি স্কোয়ার বোমা মামলায় (ঘটনা— ২।৩।১৯১১ ও রায় ২৭।৩।১৯১১) চুঁচুড়ার ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় চোদ্দ বছরের সাজা নিয়ে ও ঢাকা-ষড়যন্ত্র মামলায় (রায়— ২।৪।১৯১১) পুলিন দাস সাত বছরের কারাদণ্ড নিয়ে ও আরো তিন-চার জন আন্দামান সেলুলার জেলে আসেন। ননীগোপাল অল্পবয়স্ক হলেও তাঁকে ঘানিতে তেল পিষতে দেওয়া হয়। তিনিও ধর্মঘটে যোগ দিলেন।

সকলকে আলাদা ব্লকে, চার-পাঁচটি সেল পরে এক-এক জনকে সেলে রাখা হল, যাতে কেউ কারো সঙ্গে কথা বলতে না পারেন। সেজন্য পায়খানার সামনেও প্রহরী থাকত। সেলে বন্দীদের হাতকড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হতে লাগল। কিন্তু

বন্দীরা অবিচল। নন্দগোপাল ও ননীগোপালকে কিছুদিন পরে ভাইপার দ্বীপের একটি জেল ব্যারাকে স্থানান্তরিত করা হল। সেখানে ননীগোপাল অনশন শুরু করলেন। চার দিন অনশনের পর ননীগোপালকে আবার সেলুলার জেলে ফিরিয়ে আনা হয়। নাকে নল লাগিয়ে তাঁকে অল্প অল্প দুধ খাওয়ানো হতে থাকে।

সেবারের ধর্মঘটের বোঝা ননীগোপাল, বীরেন সেন প্রভৃতি তিন-চারজনের উপর দিয়ে যায়। আর সকলে সাজার পর সাজা পেয়ে একে একে ধর্মঘট ছাড়েন। কিন্তু ননীগোপাল গোঁ ছাড়লেন না। তিনি দেড় মাসকাল অনশন চালিয়ে যেতে থাকেন। সেই অবস্থাতেও তাঁকে সেলের মধ্যে হাতকড়ি দিয়ে বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখা হত। ফলে আবার সকলে অনশন শুরু করেন। আন্দামান সেলুলার জেলের বন্দীদের কথা, ইন্দুভূষণ রায়ের আত্মহত্যা, উল্লাসকর দত্তর মানসিক রোগ-গ্রস্ত হওয়ার ঘটনা ভারতে এসে পৌঁছায়। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এই নিয়ে বিশেষ আলোচনা হতে থাকে। গবর্নমেণ্ট ড. লুইসকে (Dr Lewis) আন্দামানে তদন্তের জন্য পাঠায়। ননীগোপালকেও তাঁর বন্ধুবান্ধবরা বুঝিয়ে অনশন ভঙ্গ করান। এইভাবে শেষ হয় অনশন পর্ব। এ হল ১৯১২ সালের শেষ ও ১৯১৩ সালের প্রথমদিকের কথা।

যাঁদের জেলের বাইরে নারকেল গাছ পাহারা প্রভৃতির কাজে পাঠানো হয়েছিল তাঁরাও আস্তে আস্তে কাজ ছেড়ে জেলে ফিরতে লাগলেন। সে সময় তাঁদের বিরুদ্ধে জেল-কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হয় যে তাঁরা নাকি বাইরে গোপনে বোমা তৈরি করছিলেন, ভারতের খবরের কাগজে আন্দামানের সব খবর পাঠাচ্ছিলেন। দেশের কাগজে কাগজে এই বন্দীদের সম্বন্ধে আলোচনা ক্রমেই বাড়তে থাকে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গলী' কাগজে এ-সব খবর নিয়ে খুব আলোচনা হতে থাকায় ও আন্দামান বন্দীদের সম্বন্ধে ভারতীয় লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে সুরেন্দ্রনাথ অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করায়, ভারত সরকার, গবর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের হোম মেম্বার স্যার রেজিন্যাল ক্র্যাডক (Sir Reginal Craddock)-কে সরজমিনে দেখার জন্য আন্দামানে পাঠান (অক্টোবর ১৯১৩)। তিনি সব দেখেশুনে গেলেন, কিছু সুপারিশ করলেন আন্দামান রাজনৈতিক বন্দীদের সম্বন্ধে। জেল-কর্তৃপক্ষ তাঁর সুপারিশগুলি চেপে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু বন্দীরা আর-একবার অনশন করায় জেল-কর্তৃপক্ষ সেগুলি কার্যকর করতে বাধ্য হল। বন্দীরা যে-সমস্ত সুবিধা পেল তা হল— যাবজ্জীবনের কম দণ্ডে দণ্ডিত সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের দেশে

ফিরিয়ে এনে নিজ নিজ প্রদেশের জেলে রাখা হবে, যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের ১৪ বছর পর্যন্ত জেলে আটক রাখা হবে— তার পর বাইরে পাঠিয়ে হাল্কা কাজ দেওয়া হবে, জেলে তাঁদের ভালো খাবার, ভালো পরিধেয় দেওয়া হবে। ঘানি ঘোরাবার মতো কঠিন ও অপমানজনক কাজের বদলে তাঁদের হাল্কা ধরনের কাজ করতে দেওয়া হবে, পড়ার জন্য বই দেওয়া হবে ইত্যাদি।[১]

এই ব্যবস্থার ফলে যাঁদের দেশে ফিরিয়ে আনা হল, তাঁরা হলেন :

(যে মামলায় অভিযুক্ত এবং দণ্ডাদেশের মেয়াদ বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল)

১	বিভূতিভূষণ সরকার—	আলিপুর বোমা মামলা	(১০ বছর)
২	হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল—	ঐ	(১০ বছর)
৩	সুধীরকুমার সরকার—	ঐ	(৭ বছর)
৪	অবিনাশ ভট্টাচার্য—	ঐ	(৭ বছর)
৫	বীরেন্দ্রকুমার সেন—	ঐ	(৭ বছর)

১ সম্প্রতি আনন্দবাজার পত্রিকা-র ১৩৯৩ শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীঅশোক-কুমার মুখোপাধ্যায়ের— 'চার্লস টেগার্ট ও আন্দামান-বিপ্লবীরা' শিরোনামায় একটি সুদীর্ঘ রচনা প্রকাশিত হয়েছে। রচনাটিতে আমরা জানতে পারি টেগার্ট আন্দামানে গিয়ে আলিপুর বোমা মামলায় অভিযুক্ত বিপ্লবীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতের উদ্দেশ্য— দণ্ডপ্রাপ্ত বিপ্লবীদের কাছ থেকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পিক্‌রিক অ্যাসিড বোমা বিস্ফোরণের খবর সংগ্রহ করা এবং এ সম্বন্ধে যাঁরা সঠিক খবর সরবরাহ করবেন— বিনিময়ে ব্রিটিশ সরকার খুড়োর কলের টোপ দিলেন— তাঁদের দণ্ডাদেশ যথেষ্ট পরিমাণ হ্রাস করা হবে। তদনুযায়ী টেগার্ট সাহেব আন্দামানে গেলেন এবং আলিপুর বোমার মামলার আসামীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করলেন। রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে একমাত্র হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো) টেগার্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি, অপর সকলে দেখা ক'রে তাঁদের জ্ঞাতব্য গোপন তথ্য অকপটে বলে যান। এখানে মনে প্রশ্ন জাগে— বর্তমান গ্রন্থ লিখতে গিয়ে যে-সমস্ত প্রামাণিক পুস্তকের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে তার কোনোটিতেই টেগার্টের আন্দামানে যাওয়ার সামান্যতম উল্লেখ পাওয়া যায় নি। অন্তত বীর সাভারকর, যিনি কাউকে তোয়াক্কা করে তথ্য গোপন করেন না, ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে তাঁর বইতে উল্লেখ থাকা স্বাভাবিক ছিল।

৬	অবনী চক্রবর্তী—	খুলনা ষড়যন্ত্র মামলা	(৭ বছর)
৭	বিধুভূষণ দে—	ঐ	(৭ বছর)
৮	শচীন্দ্রলাল মিত্র—	ঐ	(৭ বছর)
৯	অশ্বিনীকুমার বোস—	ঐ	(৭ বছর)
১০	নগেন্দ্র চন্দ্র—	ঐ	(৭ বছর)
১১	সুধীরকুমার দে—	ঐ	(৫ বছর)
১২	ননীগোপাল মুখার্জি—	ডালহৌসি বোমা মামলা	(১৪ বছর)
১৩	পুলিনবিহারী দাস—	ঢাকা-ষড়যন্ত্র মামলা	(৭ বছর)
১৪	জ্যোতির্ময় রায়—	ঐ	(৬ বছর)
১৫	বাবু রামহরি—	'স্বরাজ্য'-মামলা	(৭ বছর)
১৬	নন্দগোপাল চোপড়া	ঐ	(১০ বছর)
১৭	লোধারাম—	ঐ	(১০ বছর)
১৮	হোতিলাল ভার্মা—	ঐ	(১০ বছর)
১৯	রামচন্দ্র লাল—	যুগান্তর-মামলা	(১০ বছর)

আন্দামান সেলুলার জেলের এই বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার কাজ আরম্ভ হয় ১৯১৪ সালের মে মাসের শেষ ভাগ থেকে আর কাজ শেষ হয় ১৯১৪ সালের

তা হলে কি এটি একটি কল্পিত রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছিল এবং টেগার্টের নিজস্ব গুরুত্ব প্রমাণের প্রচেষ্টা মাত্র ? কারণ এই প্রসঙ্গে তুলনীয় আরেকটি রিপোর্ট পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করা যায়— রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে 'TEGART REPORT'—অনেক উদ্ভট ও অসংলগ্ন মনগড়া তথ্য (?) দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে একটি বিষয়ই কেবল উল্লেখ করব— ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে— '...She was not looked upon with much favour by the respectable Indians of Calcutta, as from all accounts she did not bear a good moral character and was living in a house with a number of young Bengalis. Her expenses were apparently met by the Ram Krishna Mission...' শঙ্করীপ্রসাদ বসু মহাশয়ের তীক্ষ্ণ মন্তব্য— "এ ব্যাপারটা পুলিশী গোয়েন্দাদের অনুমান নিবেদিতার নৈতিক চরিত্রদোষের জন্যই ঘটেছিল— টেগার্টের মতো চরিত্রের লোকের কাছে তা স্বতঃই গ্রাহ্য বিবেচিত

সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি। আর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর কারাদণ্ডে দণ্ডিত যে ক'জন বন্দী আন্দামান সেলুলার জেলে রয়ে গেলেন, তাঁরা হলেন :

১	বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—	আলিপুর বোমা-মামলা
২	হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো)—	ঐ
৩	উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—	ঐ
৪	সুরেশচন্দ্র সেন—	রাজেন্দ্রপুর ট্রেন ডাকাতি মামলা
৫	বিনায়ক দামোদর সাভারকর—	নাসিক-ষড়যন্ত্র মামলা
৬	গণেশ দামোদর সাভারকর—	ঐ
৭	বামন যোশী ওরফে দাজী—	ঐ

হয়েছিল। এই উদ্ভট কথার মতো আর একটি ভ্রান্ত কথা— নিবেদিতার খরচ রামকৃষ্ণ মিশন বহন করত।"— ('বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—খণ্ড ৬, পৃ. ২৫৫ ও ২৭৩)। এরকমই যদি টেগার্টের রিপোর্টের নমুনা হয় তা হলে আন্দামানে বিপ্লবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার কতখানি গ্রহণীয়। একে আমরা টেগার্ট-কর্তৃক বিপ্লবীদের চরিত্রহননের ইচ্ছাকৃত অপচেষ্টা বলে মনে করতে পারি না কি ? যেভাবে দলিল-দস্তাবেজের ফোটো কপি দিয়ে উক্ত রচনায় প্রকাশিত হয়েছে তাতে সন্দেহ করার অবকাশ নেই রিপোর্টটির সত্যতা সম্বন্ধে। কিন্তু যেটা জিজ্ঞাস্য— তা হল ইতিহাসের নিবন্ধে যাচাই করার যা পদ্ধতি আছে তা করা হয়েছে কিনা— অর্থাৎ প্রকৃতই বিপ্লবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটেছিল কিনা। আর এ বিষয়টি প্রকাশ পেল এখন যখন তদানীন্তন আন্দামান সেলুলার জেলের আর একটি বন্দীও বোধকরি জীবিত নাই। পরবর্তীকালে আন্দামান সেলুলার জেলে যাঁরা বন্দী ছিলেন তাঁদের যখন জিজ্ঞেস করেছি এ সম্বন্ধে— তৎক্ষণাৎ তাঁদের উত্তর— এই আজ জানলাম টেগার্ট আন্দামানে গিয়েছিল এবং বন্দীদের কাছ থেকে জবানবন্দী আদায় করেছিল। তবে রিপোর্ট প্রকাশ করার অনলস প্রচেষ্টায় লেখক অভিনন্দনযোগ্য। কেবলমাত্র লেখকের আনুমানিক নিজস্ব মন্তব্যগুলি প্রশ্নাতীত নয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও আন্দামান বন্দী

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার পরই আন্দামান সম্বন্ধে সরকারকে পূর্বকার নীতির পরিবর্তন করতে হল।

বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে ভারতের গুপ্ত সমিতির কার্যকলাপও বেড়ে যেতে থাকে। রাসবিহারী বসু প্রভৃতির চেষ্টায় ভারতে একই দিনে দেশীয় সৈন্য বিদ্রোহ করতে তৎপর হয়ে ওঠে। পূর্বাঞ্চলে ও বাংলায় প্রচুর জার্মান অস্ত্র আমদানী হওয়ার ব্যবস্থা হল। আর সেই অস্ত্র নিয়ে একই দিনে বাংলায় বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠবে ঠিক হল। কিন্তু "মেভারিক" জাহাজ জার্মান অস্ত্রসহ ইংরেজদের হাতে ধরা পড়ায়. অস্ত্র এসে পৌঁছতে পারল না। উত্তর ভারতেও সৈন্যদের বিদ্রোহ করার কথা বিশ্বাসঘাতকতার ফলে প্রকাশ পায়— সরকার কড়া ব্যবস্থা নিয়ে বিদ্রোহ দমন করে। বহু দেশীয় সৈন্য গ্রেপ্তার হলেন— 'গদর' পার্টির বহুকর্মী ধরা পড়লেন— আর বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মামলায় বহু লোক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও বিভিন্ন মেয়াদের দণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপৎ রায়কে ভারতে ঢুকতে দেওয়া হল না, সেই সময় তিনি বহির্ভারতে অবস্থান করেছিলেন। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রাজা সুবোধ মল্লিক প্রমুখ নেতাদের ১৮১৮ সালের ৩ আইনে গ্রেপ্তার করে রাজবন্দীরূপে (স্টেট প্রিজনার) পেশওয়ারে এক দুর্গে আটকে রাখা হল। দেশের বহু রাজনৈতিক কর্মী ভারত-রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হলেন। বিভিন্ন মামলায় আরো অনেককে জেল-বন্দী করা হল।

একমাত্র প্রথম লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলার ২৮ জনের (গদর পার্টির) ফাঁসি হল। আর এই মামলায় বহু ব্যক্তির ফাঁসির হুকুম রদ হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের হুকুম হয়— আপিলে বহু ব্যক্তির বিভিন্ন মেয়াদের জেল হল। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও দীর্ঘ মেয়াদের কারাদণ্ড নিয়ে প্রথম লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলার পঞ্চাশ জন বন্দী আন্দামান সেলুলার জেলে অন্তরীত হলেন।

বাংলায়ও বিভিন্ন মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ও বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ডিত বহু বন্দীকে আবার আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠানো হল।

রেঙ্গুন, বসরা, সিঙ্গাপুর, প্রভৃতি যুদ্ধ ফ্রণ্টে যেতে অস্বীকৃত বহু ভারতীয় সৈন্য ও রেঙ্গুনে যে-সমস্ত ভারতীয় সৈন্য বিদ্রোহ করার চেষ্টা করে তাদের বহু ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে আন্দামানে পাঠানো হয়। আর আমেদাবাদের সামরিক মামলারও কিছু বন্দীকে আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠানো হল। পূর্বের ক'জন রাজনৈতিক বন্দীকে নিয়ে এখন আন্দামান সেলুলার জেলে রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা ১৩৩ থেকে ১৫০ জন দাঁড়াল।

গদর পার্টি ও কজন বিশিষ্ট আন্দামান বন্দী :

১৯১৪ সালে সানফ্রান্‌সিসকোতে গদর পার্টি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। পার্টির মুখপত্রের নাম ছিল 'গদর'। গদর মানে বিপ্লব। প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেণ্ট বাবা সোহনসিং ভাকলা ভারতে আসেন এবং প্রথম লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়। আপিলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় ও আন্দামান সেলুলার জেলে প্রেরিত হন। গদর পার্টির নেতৃত্বে ভারতে ও ব্রিটিশ-অধিকৃত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, বর্মা, মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর এমন-কি শ্যাম বা থাইল্যাণ্ডেও বহু গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটে। হাজার হাজার ব্যক্তিকে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট গ্রেপ্তার করে— সবসুদ্ধ ন্যূনতম ১৪৫ জন গদর বিপ্লবীর ফাঁসি হয়, আর এঁদের ৩০৫ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। তাঁদেরই মধ্য থেকে কিছু ব্যক্তিকে আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠানো হয়। অন্যেরা বিভিন্ন জেলে দণ্ড ভোগ করেন।

এই সময় ১৯১৬ সাল থেকে গদর পার্টির যাঁরা আন্দামান সেলুলার জেলে ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়জন :

১. বাবা পৃথ্বী সিং আজাদ

গদর পার্টির একজন প্রতিষ্ঠাতা সভ্য। ১৯১৫ সালে প্রথম লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসির হুকুম হয়। আপিলে মৃত্যুদণ্ড রদ হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের হুকুম হয়। আন্দামান সেলুলার জেলে প্রেরিত হন। সেখান থেকে সব বন্দীকে দেশে ফিরিয়ে আনার পর মাদ্রাজ জেল থেকে কলকাতার কোনো জেলে নিয়ে যাওয়ার পথে ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে পালাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পরদিনই ধরা পড়েন।

ঘোরাতে ঘোরাতে হাতে ফোস্কা পড়ে যায় ; রক্ত বের হয়। মাথা ঘোরে, শরীর আড়ষ্ট হয়ে যায়। অমানুষিক পরিশ্রম।

পা-কলু ঘোরানো আরো কঠিন কাজ। "...কিছুদিন পরেই আমাদের জন-কতককে ঘানিতে দিয়া তেল পিষাইবার ব্যবস্থা করিলেন। উল্লাসকরকে যে সরিষা পিষিবার ঘানিতে জোড়া হইল তাহা অনেকটা আমাদের কলুর বাড়ির দেশী ঘানির মতো, আর হেমচন্দ্র, সুধীর, ইন্দু প্রভৃতি বাকী কয়েকজনকে যে ঘানিতে পাঠান হইল তাহা হাত দিয়া ঘুরাইতে হয়। প্রত্যহ এক-এক জনকে দশ পাউণ্ড সরিষার তেল বা ত্রিশ পাউণ্ড নারিকেল তেল পিষিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। মোটা মোটা পালোয়ান লোকও ঘানি ঘুরাইতে হিমশিম খাইয়া যায়, আর আমাদের যে কি দশা হইল তাহা মুখে অবর্ণনীয়। জেলের যে অংশে তেলপেষা হয়, দুইজন পাঠান পেটি অফিসার ৫/৭ বছর জেল খাটা কয়েদী তখন সেখানকার হর্তাকর্তা। সেখানে ঢুকিবামাত্র তাহাদের মধ্যে একজন তাহার বদ্ধমুষ্টি আমাদের নাকের উপর রাখিয়া বেশ জোর গলায় বুঝাইয়া দিল যে কাজকর্ম ঠিক ঠিক না করিতে পারিলে সে আমাদের নাকগুলি ঘুসার চোটে থ্যাবড়া করিয়া দিবে। কিন্তু নাকের ভবিষ্যৎ দুর্দশার কথা ভাবিয়া সময় নষ্ট করিবার উপায় নাই। তাড়াতাড়ি কাঁধের উপর পঞ্চাশ পাউণ্ড নারিকেলের বস্তা ও হাতে একটা বালতি লইয়া তেতলায় চড়িয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। আর সে ত কাজ নয়, রীতিমত মল্ল যুদ্ধ। আট দশ মিনিটের মধ্যেই দম চড়িয়া জিভ শুকাইতে আরম্ভ হইল। এক ঘণ্টার মধ্যেই গা হাত পা যেন আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। রাগের চোটে মনে মনে সুপারিন্টেনডেণ্ট সাহেবের পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম, কিন্তু সে নিষ্ফল আক্রোশ। একবার মনে হইল ডাক ছাড়িয়া কাঁদিলে বুঝিবা জ্বালা মিটিবে, কিন্তু লজ্জায় তাহাও পারিলাম না। দশটার ঘণ্টার পর যখন আহার করিতে নীচে নামিলাম, তখন হাতে ফোস্কা পড়িয়াছে, চোখে সরিষার ফুল ফুটিতেছে আর কানে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকিতেছে।...একে ত আন্দামান নিকোবর ম্যানুয়েল অনুসারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর মানে পঁচিশ বৎসর এইরূপ কর্মভোগ, তাহার পরও খালাস পাওয়া সরকার বাহাদুরের ইচ্ছাধীন। মনে হইতে লাগিল গলায় এক গাছা দড়ি লইয়া নাহয় ঝুলিয়া পড়ি। কিন্তু সাহসে কুলাইল না। কাজে কাজেই যথা সাধ্য তেল পিষিয়া সরকারের তেলের গুদাম ভরতি করিতে লাগিলাম।"

—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নির্বাসিতের আত্মকথা', পৃ. ৮২-৮৩

বলদের বদলে কয়েদীকে দিয়ে ঘানি ঘোরানো হলে, তাকে ঘানির সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হত। বুকে ঘানির কাঠ ঠেকিয়ে সেই ঘানি ঘোরাতে হত। ভীষণ পরিশ্রম—অল্পক্ষণের মধ্যেই কয়েদীদের মাথা ঘুরত, বমি ভাব হত ও অজ্ঞান হয়ে পড়ত। কিন্তু পেটি অফিসারদের অকথ্য গালাগালি ও মারের চোটে কয়েদী আবার খাড়া হয়ে ঘানির সঙ্গে ঘুরত। প্রহারের ভয়ে অজ্ঞান হওয়াও চলত না।

এইভাবে আন্দামান সেলুলার জেলে আলিপুর বোমার মামলায় রাজনৈতিক বন্দীদের দিন কাটতে থাকে।

"এইরূপে ছয় মাস যাইতে না যাইতে নাসিক, খুলনা ও এলাহাবাদ হইতে দশ বারোজন রাজনৈতিক কয়েদী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সর্বসমেত আমাদের সংখ্যা হইল প্রায় বিশ-বাইশ জন।"

—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নির্বাসিতের আত্মকথা', পৃ. ৮১

অভিনব ভারত সোসাইটি—গণেশ সাভারকর—
জ্যাক্সন হত্যা—বীর সাভারকর—
নাসিক-ষড়যন্ত্র মামলা

ভারতের পশ্চিম অংশেই প্রথম বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়। পূর্বে উল্লিখিত নাসিকের "মিত্রমেলা", যা পরে "অভিনব ভারত সোসাইটিতে" পরিণত হয়, তার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ভি. ডি. সাভারকর-এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডি. জি সাভারকর—বিনায়ক গণেশ সাভারকর। "অভিনব ভারত সোসাইটি" খোলাখুলি ভাবে সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক দেয় ও বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ের করণীয় হিসাবে ইংরেজ ও ভারতীয় অফিসারদের হত্যার কথা প্রচার করতে থাকে। বস্তুত, গণেশ সাভারকরই এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। **"In Ganesh Savarkar was epitomised all that was Patriotic and noble for the Country." —K. C. Ghosh. *The Roll of Honour*, p 216**। অচিরেই "অভিনব ভারত সোসাইটি" বোম্বাই, নাসিক, পুনা, পেন, ঔরঙ্গাবাদ, হায়দ্রাবাদ, গোয়ালিয়র প্রভৃতি ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে কাজ করতে থাকে। ইংরেজ সরকার গণেশ সাভারকরকে শাস্তি দেবার মতলব আঁটতে থাকে। এই সময় গণেশ সাভারকর 'লঘু অভিনব ভারতমেলা' নামে একটি দেশাত্মবোধক কবিতা পুস্তক ছাপিয়ে প্রচার করেন। গবর্নমেন্ট এই পুস্তকটি বাজেয়াপ্ত করেন ও গণেশ সাভারকরের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা হয়। ১৯০৯ সালের ৯ জুন এই মামলায় গণেশ সাভারকরের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। বিচারক ছিলেন নাসিকের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জ্যাক্সন (**Jackson**)। সারা দেশে এই বিচারের প্রহসন ও কঠিন শাস্তির সমালোচনা হতে থাকে। দেশবাসী ক্ষুব্ধ হয়। নাসিকের "অভিনব ভারত সোসাইটি"র সভ্যদের মধ্যে কয়েকজন জ্যাক্সন সাহেবকে হত্যা করে এর প্রতিবাদ জানাবার সংকল্প করেন।

ঔরঙ্গাবাদের অনন্ত লক্ষ্মণ কানহেরী, নাসিকের বিনায়ক নারায়ণ দেশপাণ্ডে

(একজন শিক্ষক), কৃষ্ণগোপাল কার্ভে ও আরো কয়েকজন এই পরিকল্পনা সফল করার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। ইতিমধ্যে জ্যাক্‌সনের নাসিক থেকে পুনায় বদলীর হুকুম হয়। জ্যাক্‌সনকে বিদায় সংবর্ধনা দেবার জন্য নাসিকের বিজয়ানন্দ থিয়েটার হলে একটি সভা ও জলসার আয়োজন করেন নাসিকের জনসাধারণ ২১ ডিসেম্বর ১৯০৯ সালে। কানহেরী একটি পিস্তল, একটি রিভলবার ও এক প্যাকেট আর্সেনিক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে ঐ থিয়েটার হলে, জ্যাক্‌সনের বসার নির্দিষ্ট আসনের কাছাকাছি বসে থাকেন। এই দুই কাজে তিন জন হলে উপস্থিত থাকেন। জ্যাক্‌সনের আসনের খুব কাছে একজন বসেন। কানহেরী কৃতকার্য হতে না পারলে তিনি অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করবেন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিও কৃতকার্য হতে না পারলে দেশপাণ্ডে যাতে জ্যাক্‌সনকে মারতে পারেন সেই রকমভাবে প্রস্তুতি নিয়ে দেশপাণ্ডেও কাছাকাছি বসে থাকেন। যথাসময়ে জ্যাক্‌সন এসে তাঁর আসনের কাছাকাছি পৌঁছতেই, কানহেরী উঠে জ্যাক্‌সনের সামনে আসেন ও জ্যাক্‌সনকে পরপর পিস্তলের ছয়টি গুলি করেন। জ্যাক্‌সনের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। কানহেরী ধৃত হন, আর্সেনিক মুখে দিয়ে আত্মহত্যা করায় সুযোগ পেলেন না। এই ঘটনার অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সকলেই ধরা পড়েন। জ্যাক্‌সনকে হত্যা ও হত্যার চক্রান্তের দায়ে তাঁদের বিচার হয়। হাইকোর্টে ২৯ মার্চ ১৯১০ সালে কানহেরী, কার্ভে ও দেশপাণ্ডের ফাঁসির হুকুম হয়; অন্য তিনজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও একজনের দুই বছরের জেল হয়। ১৯ এপ্রিল ১৯১০ সালে সকাল সাতটায় থানা স্পেশাল জেলে অনন্ত লক্ষ্মণ কানহেরী, কৃষ্ণগোপাল কার্ভে ও বিনায়ক নারায়ণ দেশপাণ্ডের ফাঁসি হয়। দেশমাতৃকার চরণে নিবেদিত হল আরো কয়েকটি প্রাণ।

এর পরেই প্রথম নাসিক-ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়, আটত্রিশ জন আসামীকে নিয়ে। বন্দী গণেশ সাভারকরও তাঁদের মধ্যে একজন। ২৪ ডিসেম্বর ১৯১০ এই ঐতিহাসিক মামলার রায়ে গণেশ সাভারকর ও বামন যোশী বা দাজী-র যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। বাকী সকল আসামীরই বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়।

গণেশ সাভারকরের অন্যতম ভ্রাতা—বিনায়ক দামোদর সাভারকর লণ্ডনে ব্যারিস্টারি পড়েছিলেন। সেখানকার ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে তিনিও একজন। ভারতের "অভিনব ভারত সোসাইটি"কে বিশেষ করে, বহু পিস্তল, রিভলবার ইংলণ্ড থেকে পাঠিয়ে তিনি নানা সহায়তা করছিলেন।

পয়লা জুলাই ১৯০৯-এ লণ্ডনে মদনলাল ধিংড়া উইলি (Willey) সাহেবকে হত্যা করেন রিভলবার দিয়ে। লণ্ডনের পেন্‌টনভেলি জেলে ১৭ আগস্ট ১৯০৯ সালে মদনলাল ধিংড়ার ফাঁসি হয়। সাভারকর তখন প্যারিসে ছিলেন। সেখান থেকে ১৯১০ সালের ১৩ মার্চ তিনি লণ্ডনে আসেন। ভিক্টোরিয়া স্টেশনে ট্রেন পৌঁছানো মাত্র তিনি গ্রেপ্তার হন। "এস এস মোরিয়া" জাহাজ সাভারকরকে নিয়ে ভারতে রওনা হয়। ৭ জুলাই ১৯১০-এ জাহাজটি মার্সাই-এর কাছে নোঙর করে। ভোরবেলা জাহাজের বাথরুমের পোর্ট হোল দিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন সাভারকর। গুলি বর্ষণের মধ্যেও সাঁতরে বন্দরের খাড়া দেওয়ালের কাছে তিনি পৌঁছান; অতিকষ্টে তীরে পৌঁছে তিনি দৌড়াতে থাকেন। কিন্তু ব্রিটিশ পুলিস ফরাসী পুলিসের সহায়তায় সাভারকরকে আবার গ্রেপ্তার করে জাহাজে নিয়ে আসে। ২২ জুলাই ১৯১০এ জাহাজ তাঁকে নিয়ে বোম্বাই পৌঁছায়। নাসিক জেলে তাঁকে রাখা হয়। সরকার দ্বিতীয় নাসিক-ষড়যন্ত্র মামলা রুজু করে। সাভারকারের বিরুদ্ধে তিনটি মামলা হয়। স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যাল গঠিত হয়— গবর্নমেণ্টের হুকুম: সেখানে জুরী থাকবে না, রায়ের বিরুদ্ধে আপিলও চলবে না। প্রথম মামলায় ২৩ ডিসেম্বর ১৯১০-এ সাভারকরের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। জ্যাক্‌সন-হত্যার প্ররোচনা ও সাহায্য করার অপরাধের মামলায় সাভারকরের দ্বিতীয়বার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয় ৩১ জানুয়ারি ১৯১১ সালে। শুধু ভারতীয় নয় পৃথিবীর বিপ্লবীদের মধ্যে বিরল ঘটনা দুই সাভারকর ভাই— গণেশ সাভারকর ও বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে একই সঙ্গে পরপর দুবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের হুকুম দেওয়া হয়— পঁচিশ বছর, ক'রে এক-এক জনের মোট পঞ্চাশ বছর। আগেই গণেশ সাভারকার ও বামন যোশী বা দাজীকে আন্দামান সেলুলার জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯১১ সালের ৪ জুলাই এস. এস. মহারাজা, জাহাজ বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে আন্দামান সেলুলার জেলে পৌঁছে দেয়।

খুলনা-ষড়যন্ত্র মামলা

আলিপুর বোমার মামলা রায়ের পর, বাংলার বিভিন্ন জেলায় সরকার বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ডাকাতি ও রাজদ্রোহমূলক ষড়যন্ত্র মামলা রুজু করে। তার মধ্যে খুলনা-ষড়যন্ত্র মামলায় এগারোজনের বিরুদ্ধে স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল বিচার

শুরু হয় ১৮ জুলাই ১৯১০ সালে। ৩০ আগস্ট ১৯১০-এর রায়ে পাঁচ জনের সাত বছর, দুই জনের তিন বছর ও তিন জনের পাঁচ বছর করে জেল হয়। একজন খালাস পান। কারাদণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে ছিলেন অশ্বিনীকুমার বসু, ভূপেন্দ্রনাথ দে, সুধীরচন্দ্র দে, অবনী চক্রবর্তী, সতীশ চ্যাটার্জি, শচীন বাবু প্রভৃতি। অল্প-দিনের মধ্যেই তাঁদেরও স্থান হয় আন্দামান সেলুলার জেলে।

'স্বরাজ্য পত্রিকা' ও আন্দামান সেলুলার জেল

বাংলায় বিপ্লবপন্থী কাগজগুলির মতো মহারাষ্ট্রের 'কাল' পত্রিকা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। যুক্তপ্রদেশেও এই ধরনের কিছু পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। তার মধ্যে 'স্বরাজ্য'-ই বিশেষ নাম করে। 'স্বরাজ্য' উর্দু পাক্ষিক পত্রিকা, প্রথম বের হয় এলাহাবাদ থেকে (৯ নভেম্বর ১৯০৭)। প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শান্তিনারায়ণ ভাটনগর। চার মাসের মধ্যেই "ক্ষুদিরামের মাতার আক্ষেপ"-সূচক একটি কবিতা 'স্বরাজ্যে' ছাপানোর জন্য শান্তিনারায়ণ ভাটনগরের বিরুদ্ধে এলাহাবাদ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ১২৪ক ধারার মামলা হয়। শান্তিনারায়ণের সাড়ে তিন বছর জেল এবং একহাজার টাকা জরিমানা হয়; অনাদায়ে আরো ছমাস জেল। তারপর 'স্বরাজ্যে'র সম্পাদক হন— রামদাস সুরালিয়া। তিনি পত্রিকাটির দুই সংখ্যা মাত্র বের করার পর শান্তিনারায়ণ ভাটনগরের নির্দিষ্ট জরিমানার টাকা আদায়ের জন্য সরকার স্বরাজ্য প্রেস নিলাম করে। সুরালিয়া গ্রেপ্তার এড়িয়ে অজ্ঞাতবাসে থাকেন। তার পর 'স্বরাজ্যে'র নতুন প্রেস হল— সম্পাদক হলেন সদ্য ইংলণ্ড-প্রত্যাগত, হরিয়ানার হোতিলাল ভার্মা। তিনি কয়েক সংখ্যা 'স্বরাজ্য' বের করার পর তাঁর বিরুদ্ধে ১২৪ক ধারার মামলা হয়। হোতিলালের দশ বছর দ্বীপান্তর কারাবাসের হুকুম হল। এর পর বাবু রামহরি 'স্বরাজ্যে'র সম্পাদক হন। তাঁর দ্বারা সম্পাদিত 'স্বরাজ্য'র প্রথম সংখ্যা "সিপাহীযুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পূর্তি" সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়, বাবু রামহরি মাত্র ১১টি সংখ্যা প্রকাশ করতে পেরে-ছিলেন। রাজদ্রোহাত্মক সম্পাদকীয় লেখার জন্য তাঁর সাত বছর জেল হয়। তখন 'স্বরাজ্যে'র সম্পাদক হওয়া একটি গৌরবের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় ও অনেকেই 'স্বরাজ্যের' সম্পাদক হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। লাহোরে 'সাহিক' পত্রিকার সম্পাদক মুন্সি রামসেবক 'স্বরাজ্য'র সম্পাদক হওয়ার জন্য এলাহাবাদে এলেন। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ঘোষণাপত্র (Declaration) জমা দেবার সময় 'সাহিক'-এ

রাজদ্রোহাত্মক রচনা লেখার জন্য তিনি গ্রেপ্তার হয়ে লাহোরে প্রেরিত হন। তাঁর সাত বছর জেল হয়। তার পর 'স্বরাজ্য'-এর সম্পাদক হন লাহোরের 'ইনক্লাব' পত্রিকার সম্পাদক নন্দগোপাল চোপরা, বার-অ্যাট-ল। 'ইনক্লাবে' রাজদ্রোহমূলক লেখার জন্য তাঁর আগেই চার বছর জেল হয়। সেই মামলায় আপিল করায় তিনি এই সময় জামিনে মুক্ত ছিলেন। 'স্বরাজ্য'র প্রায় বারোটি সংখ্যা তাঁর সম্পাদনায় বের হবার পর, নন্দগোপাল রাজদ্রোহাত্মক রচনার জন্য পুনরায় গ্রেপ্তার হন। তাঁর দশ বছর দ্বীপান্তর কারাবাসের হুকুম হয়। তার পর লাহোরে 'ভারত মাতা' পত্রিকার সম্পাদক শ্যামদাস বর্মা 'স্বরাজ্য'র সম্পাদক হন। কিন্তু সুফী অম্বাপ্রসাদ ও সর্দার অজিত সিং পারস্যে পালিয়ে যাওয়ায় বিশেষ জরুরী কাজের জন্য তাঁকে লাহোরে চলে যেতে হয়। তাঁর জায়গায় সম্পাদক হলেন— লোধারাম কাপুর। এই সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে বারো জন পত্রিকাটির সম্পাদক হবার জন্য আবেদন করেছিলেন। লোধারাম তখন সবেমাত্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে এসেছেন। কয়েক সংখ্যা 'স্বরাজ্য' সম্পাদনার পর রাজদ্রোহমূলক লেখার জন্য তাঁরও দশ বছর দ্বীপান্তর কারাবাসের হুকুম হল। এর পর পণ্ডিত অমীর চাঁদ বম্বেওয়ালা 'স্বরাজ্য'র সম্পাদক হন। কিন্তু এই সময় সংবাদপত্র আইন (Press Act) প্রয়োগ করে গবর্নমেণ্ট ১৯১০ সালের ২২ অক্টোবর 'স্বরাজ্য' পত্রিকার প্রকাশ চিরতরে বন্ধ করে দেয়।

এর পর পণ্ডিত রামচন্দ্র লাল শর্মা—ঘুরে ঘুরে রাস্তায় রাস্তায় বক্তৃতা দিয়ে 'স্বরাজ্য' পত্রিকায় অংশবিশেষ ও কলকাতার 'যুগান্তর' কাগজের কিছু কিছু অংশ পড়ে শোনাতে থাকেন। তাতে জনসাধারণের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা হতে থাকে। গবর্নমেণ্ট রামচন্দ্র লালকে গ্রেপ্তার করে দশ বছর জেল দেয়।

'স্বরাজ্য' পত্রিকায় সকল সম্পাদকের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলায় ভূতপূর্ব কংগ্রেস সভাপতি পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন আসামী পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন; শুধু বিনা পারিশ্রমিকে নয়, তিনি নিজেও তাঁদের টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য-এর ব্যক্তিগত অনুরোধে তিনি এ কাজে সম্মত হয়েছিলেন। হোতিলাল ভার্মা, বাবু রামহরি, নন্দগোপাল চোপরা, লোধারাম কাপুর, রামচন্দ্র লাল শর্মা দ্বীপান্তর কারাবাসের জন্য অচিরেই আন্দামান সেলুলার জেলে এসে উপস্থিত হলেন। এইভাবে প্রথম পর্যায়ে ২০/২২ জন রাজনৈতিক বন্দী আন্দামান সেলুলার জেলে দণ্ড ভোগ করবার জন্য এসে পৌঁছলেন।

আন্দামান সেলুলার জেলের প্রথম রাজনৈতিক বন্দীদের নরকযন্ত্রণা ভোগ

আন্দামান সেলুলার জেলে রাজনৈতিক বন্দীগণ কঠোর পরিশ্রম করে শাস্তি ভোগ করতে লাগলেন। আর সহ্য করা যায় না— এমন অবস্থায় নন্দগোপাল চোপড়া ঘানি ঘোরাতে অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন— "আমি কলুর বলদ নই যে দৌড়ে দৌড়ে ঘানি ঘোরাব। ঘানি আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে ঘুরবে। দিনে তো ছয় পয়সার খোরাক পাই না, তা ত্রিশ পাউণ্ড তেল পিষব কি করে?' জেল কর্তৃপক্ষ হুলুস্থুল বাধালো। কিন্তু নির্বিকার নন্দগোপাল হাসিমুখেই রইলেন। তাঁকে দিয়ে ঘানি ঘোরাবার আর কোনো আশা নাই বুঝতে পেরে জেল সুপারিন-টেন্‌ডেণ্ট তাঁর পায়ে বেড়ী দিয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য জেলে বন্ধ করে রাখলেন। হুকুম হল সকলকেই তিন দিন করে ঘানি ঘোরাতে হবে। সব বন্দীই বুঝতে পারলেন, জেলের কাজ সম্বন্ধে একটা সহনীয় পাকা ব্যবস্থা না করতে পারলে— সকলকেই এই সেলুলার জেলে দেহরক্ষা করতে হবে। অনেকেই ঘানিতে কাজ অস্বীকার করলেন। ফলে ধর্মঘট শুরু হল।

জেল-কর্তৃপক্ষ যেন আনন্দে উল্লসিত হল। রাজনৈতিক বন্দীদের সাজার পর সাজা হতে লাগল। চার দিন 'কঞ্জি' ভক্ষণ ও সাত দিন দাঁড়া হাতকড়ি পার হয়ে গিয়েও (জেলের আইন অনুসারে চার দিনের বেশি একসঙ্গে "কঞ্জি" খাওয়াবার নিয়ম ছিল না) উল্লাসকর দত্ত, নন্দগোপাল ও হোতিলালকে বারো-তেরো দিন "কঞ্জি"— গুঁড়া চাল ফুটন্ত জলে দিয়ে, দিনে দুইবার আধ পাউণ্ড করে, খাইয়ে রাখা হল।

বন্দীদের সাজা দেওয়া অব্যাহত রইল। পরে তাঁদের এক-একজনকে তিন-চারটি সেল পরে পরে একটি করে সেলে সারা দিনরাত আটক করে রাখা হত। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলতে পারতেন না। কথা বলার চেষ্টা করলেই আবার সাজা হত। অনেককেই এইভাবে তিন মাসের বেশি বন্দী থাকতে হয়। বন্দীদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে লাগল। জেল-কর্তৃপক্ষ তখন কাজকর্মের একটু পরিবর্তন করল। বন্দীদের মধ্যে বেছে বেছে কিছু ব্যক্তিকে জেলের বাইরে কাজ করতে পাঠানো হল। বারীন ঘোষকে পাঠানো হল রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে মজুরী করতে। উল্লাসকর দত্তকে পাঠানো হল মাটি কেটে ইট তৈরি করতে। কাউকে কাউকে বাইরে জঙ্গল কাটতে পাঠানো হল, কাউকে বা বাঁধ বাঁধতে। এইভাবে ধর্মঘট শেষ হল।

কিন্তু বাইরে যাঁরা কাজ করতে গেলেন, তাঁরা ভীষণ বিপদে পড়লেন। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে, জোঁকের সঙ্গে যুদ্ধ করে, আধপেটা খেয়ে তাঁরা অবসন্ন হয়ে পড়লেন। তাঁদের খাবার জেল কর্মচারীরা জেলের বাইরে গ্রামের লোকের কাছে বিক্রি করে দিতেন। এর কোনো প্রতিকার ছিল না।

এমনি অবস্থায় এক এক করে সকলেই অসুস্থ হয়ে সেলুলার জেলে ফিরে আসতে লাগলেন, জ্বরে ধুঁকতে ধুঁকতে, বিছানা থালা বাটি ঘাড়ে করে পাঁচ-সাত-দশ মাইল পথ হেঁটে। সেলুলার জেলের হাসপাতাল-সংলগ্ন সেলগুলিতে তাঁদের দিনরাত বন্দী করে রাখা হল। জেলখানার বাইরের হাসপাতালগুলিতে তাঁদের চিকিৎসা করানো নিষেধ ছিল।

অন্য সকলের মতো ইন্দুভূষণও বাইরের কাজ থেকে ফিরে এসে সেলে বন্দী হলেন। জেলখানার দৈনন্দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপমানে তিনি ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন। অবশেষে ২৯ এপ্রিল ১৯১২ তারিখ রাত্রেই ইন্দুভূষণ তাঁর কুর্তা ছিঁড়ে দড়ি পাকিয়ে সেলের একমাত্র ঘুলঘুলির সঙ্গে বেঁধে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলেন —দুই বছর চার মাস সেলুলার জেলে জেলখাটার পর। সেই রাত্রে বার বার খবর দেওয়া সত্ত্বেও জেল সুপার আসেন না; পরদিন সকাল আটটায় আসেন। সেইদিন রাত্রে জেলারের সঙ্গে যে-সব প্রহরী ইন্দুভূষণের সেলে ঢুকেছিল, তাদের সকলেই বলে যে— তাঁর গলার হাঁসুলীতে (জেলের লোহার হাঁসুলী-টিকিট) এক খণ্ড লেখা কাগজ বাঁধা ছিল। কিন্তু সেই কাগজের কোনো হদিসই পাওয়া যায় না। জেলার তা অস্বীকার করে। ভি. ডি. সাভারকর লিখেছেন— "রোজ সন্ধ্যাবেলা দেখতাম ইন্দুভূষণ কলু থেকে ফিরছে— অত্যন্ত ক্লান্ত, সারা শরীর ঘামে ভেজা, মাথা ভরতি ধুলো, পায়ে ভারী বেড়ী। ইন্দুভূষণের পিঠে ছোবড়ার বস্তা, ঘাড়ে সারাদিনের কাজ— তেলের টিন। পিঠ বেঁকে যেত বোঝার ভারে। 'এরকম জীবনের কোন মানে হয় না'— ইন্দু বলত মাঝে মাঝে। আমি বোঝাতাম— সহ্য করো ভাই। তোমার তো দশ বছর মাত্র, তার পর স্বাধীন জীবন। কত কাজ তোমার করতে হবে দেশের জন্য। যেমন করে হোক বেঁচে থাকতেই হবে। দেখছ না পঞ্চাশ বছরের কারাদণ্ড নিয়ে আমি বেঁচে আছি।"

—V. D. Savarkar, *Story of my Transportation for Life.*

"এই সময়ে অনেকেই কাজের তাড়ায় বাহির হইতে ভিতরে চলিয়া আসিতে লাগিলেন। উল্লাসকরও তাহাই করিলেন। তাঁহাকে রৌদ্রে ইট তৈয়ারি করিতে

দেওয়া হইয়াছিল। সেখানকার হাসপাতালের যিনি জুনিয়র মেডিকেল অফিসার তিনি বলিলেন যে— উল্লাসকরের রৌদ্রে কাজ করা সহ্য হইবে না। কিন্তু বাঙালী ডাক্তারের কথা গোরা ওভারসীয়র (Overseer) সাহেব গ্রাহ্য করিবেন কেন? উল্লাসকরকে সেই কার্যেই বহাল রাখা হইল। ফলে তিনি কাজ করিতে অস্বীকৃত হইয়া পুনরায় জেলে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে, 'শুধু পীড়নের ভয়ে কাজ করিতে হইলে মনুষ্যত্ব সঙ্কুচিত হইয়া যায়; সাজার ভয়ে কাজ করিতে তিনি রাজী নহেন, তাঁহার সাতদিন দাঁড়াহাতকড়ির ব্যবস্থা হইল। কিন্তু সাতদিন আর পূর্ণ হইল না। প্রথমদিনই বেলা ৪ টার সময় হাতকড়ি খুলিতে গিয়া পেটি অফিসার দেখিল যে, উল্লাসকর জ্বরে অজ্ঞান হইয়া হাতকড়িতে ঝুলিতেছে। তখনই তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হইল। রাত্রে শরীরের উত্তাপ ১০৬ ডিগ্রী পর্যন্ত চড়ে। প্রাতঃকালে দেখা গেল যে জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে কিন্তু উল্লাসকর আর সে উল্লাসকর নাই। আসন্ন বিপদের মধ্যেও যিনি চিরদিন নির্বিকার, তীব্র যন্ত্রণায় যাঁহার মুখ হইতে কখনও হাসির রেখা মুছে নাই, তিনি আজ উন্মাদরোগগ্রস্ত।"

—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নির্বাসিতের আত্মকথা', পৃ. ৯৬

উল্লাসকর দত্তকে পরে ১৯১৩ সালের জানুয়ারি মাসে আন্দামান সেলুলার জেল থেকে বদলী করে মাদ্রাজ জেলে আনা হয়।

ইন্দুভূষণ ও উল্লাসকর দত্তর ঘটনা দুটি বন্দীদের মনে সেলুলার জেলের প্রকৃত চিত্র ফুটিয়ে তোলে। তাঁরা বুঝলেন কাজের সুরাহা না হলে জেলেই জীবন শেষ হবে তাঁদের। পুষ্টিকর খাদ্য ও পরিধান; পরিশ্রম থেকে অব্যাহতি ও পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা— এই তিনটি দাবিতে তাঁরা ধর্মঘট শুরু করলেন।

এর কিছু আগে ডালহৌসি স্কোয়ার বোমা মামলায় (ঘটনা— ২।৩।১৯১১ ও রায় ২৭।৩।১৯১১) চুঁচুড়ার ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় চোদ্দ বছরের সাজা নিয়ে ও ঢাকা-ষড়যন্ত্র মামলায় (রায়— ২।৪।১৯১১) পুলিন দাস সাত বছরের কারা-দণ্ড নিয়ে ও আরো তিন-চার জন আন্দামান সেলুলার জেলে আসেন। ননী-গোপাল অল্পবয়স্ক হলেও তাঁকে ঘানিতে তেল পিষতে দেওয়া হয়। তিনিও ধর্মঘটে যোগ দিলেন।

সকলকে আলাদা ব্লকে, চার-পাঁচটি সেল পরে এক-এক জনকে সেলে রাখা হল, যাতে কেউ কারো সঙ্গে কথা বলতে না পারেন। সেজন্য পায়খানার সামনেও প্রহরী থাকত। সেলে বন্দীদের হাতকড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হতে লাগল। কিন্তু

বন্দীরা অবিচল। নন্দগোপাল ও ননীগোপালকে কিছুদিন পরে ভাইপার দ্বীপের একটি জেল ব্যারাকে স্থানান্তরিত করা হল। সেখানে ননীগোপাল অনশন শুরু করলেন। চার দিন অনশনের পর ননীগোপালকে আবার সেলুলার জেলে ফিরিয়ে আনা হয়। নাকে নল লাগিয়ে তাঁকে অল্প অল্প দুধ খাওয়ানো হতে থাকে।

সেবারের ধর্মঘটের বোঝা ননীগোপাল, বীরেন সেন প্রভৃতি তিন-চারজনের উপর দিয়ে যায়। আর সকলে সাজার পর সাজা পেয়ে একে একে ধর্মঘট ছাড়েন। কিন্তু ননীগোপাল গোঁ ছাড়লেন না। তিনি দেড় মাসকাল অনশন চালিয়ে যেতে থাকেন। সেই অবস্থাতেও তাঁকে সেলের মধ্যে হাতকড়ি দিয়ে বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখা হত। ফলে আবার সকলে অনশন শুরু করেন। আন্দামান সেলুলার জেলের বন্দীদের কথা, ইন্দুভূষণ রায়ের আত্মহত্যা, উল্লাসকর দত্তর মানসিক রোগ-গ্রস্ত হওয়ার ঘটনা ভারতে এসে পৌঁছায়। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এই নিয়ে বিশেষ আলোচনা হতে থাকে। গবর্নমেণ্ট ড. লুইসকে (Dr Lewis) আন্দামানে তদন্তের জন্য পাঠায়। ননীগোপালকেও তাঁর বন্ধুবান্ধবরা বুঝিয়ে অনশন ভঙ্গ করান। এইভাবে শেষ হয় অনশন পর্ব। এ হল ১৯১২ সালের শেষ ও ১৯১৩ সালের প্রথমদিকের কথা।

যাঁদের জেলের বাইরে নারকেল গাছ পাহারা প্রভৃতির কাজে পাঠানো হয়েছিল তাঁরাও আস্তে আস্তে কাজ ছেড়ে জেলে ফিরতে লাগলেন। সে সময় তাঁদের বিরুদ্ধে জেল-কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হয় যে তাঁরা নাকি বাইরে গোপনে বোমা তৈরি করছিলেন, ভারতের খবরের কাগজে আন্দামানের সব খবর পাঠাচ্ছিলেন। দেশের কাগজে কাগজে এই বন্দীদের সম্বন্ধে আলোচনা ক্রমেই বাড়তে থাকে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গলী' কাগজে এ-সব খবর নিয়ে খুব আলোচনা হতে থাকায় ও আন্দামান বন্দীদের সম্বন্ধে ভারতীয় লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে সুরেন্দ্রনাথ অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করায়, ভারত সরকার, গবর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের হোম মেম্বার স্যার রেজিন্যাল ক্র্যাডক (Sir Reginal Craddock)-কে সরজমিনে দেখার জন্য আন্দামানে পাঠান (অক্টোবর ১৯১৩)। তিনি সব দেখেশুনে গেলেন, কিছু সুপারিশ করলেন আন্দামান রাজনৈতিক বন্দীদের সম্বন্ধে। জেল-কর্তৃপক্ষ তাঁর সুপারিশগুলি চেপে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু বন্দীরা আর-একবার অনশন করায় জেল-কর্তৃপক্ষ সেগুলি কার্যকর করতে বাধ্য হল। বন্দীরা যে-সমস্ত সুবিধা পেল তা হল— যাবজ্জীবনের কম দণ্ডে দণ্ডিত সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের দেশে

ফিরিয়ে এনে নিজ নিজ প্রদেশের জেলে রাখা হবে; যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের ১৪ বছর পর্যন্ত জেলে আটক রাখা হবে— তার পর বাইরে পাঠিয়ে হাল্কা কাজ দেওয়া হবে, জেলে তাঁদের ভালো খাবার, ভালো পরিধেয় দেওয়া হবে। ঘানি ঘোরাবার মতো কঠিন ও অপমানজনক কাজের বদলে তাঁদের হাল্কা ধরনের কাজ করতে দেওয়া হবে, পড়ার জন্য বই দেওয়া হবে ইত্যাদি।[১]

এই ব্যবস্থার ফলে যাঁদের দেশে ফিরিয়ে আনা হল, তাঁরা হলেন :

(যে মামলায় অভিযুক্ত এবং দণ্ডাদেশের মেয়াদ বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল)

১	বিভূতিভূষণ সরকার—	আলিপুর বোমা মামলা	(১০ বছর)
২	হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল—	ঐ	(১০ বছর)
৩	সুধীরকুমার সরকার—	ঐ	(৭ বছর)
৪	অবিনাশ ভট্টাচার্য—	ঐ	(৭ বছর)
৫	বীরেন্দ্রকুমার সেন—	ঐ	(৭ বছর)

১ সম্প্রতি আনন্দবাজার পত্রিকা-র ১৩৯৩ শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীঅশোককুমার মুখোপাধ্যায়ের— 'চার্লস টেগার্ট ও আন্দামান-বিপ্লবীরা' শিরোনামায় একটি সুদীর্ঘ রচনা প্রকাশিত হয়েছে। রচনাটিতে আমরা জানতে পারি টেগার্ট আন্দামানে গিয়ে আলিপুর বোমা মামলায় অভিযুক্ত বিপ্লবীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতের উদ্দেশ্য— দণ্ডপ্রাপ্ত বিপ্লবীদের কাছ থেকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পিক্‌রিক অ্যাসিড বোমা বিস্ফোরণের খবর সংগ্রহ করা এবং এ সম্বন্ধে যাঁরা সঠিক খবর সরবরাহ করবেন— বিনিময়ে ব্রিটিশ সরকার খুড়োর কলের টোপ দিলেন— তাঁদের দণ্ডাদেশ যথেষ্ট পরিমাণ হ্রাস করা হবে। তদনুযায়ী টেগার্ট সাহেব আন্দামানে গেলেন এবং আলিপুর বোমার মামলার আসামীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করলেন। রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে একমাত্র হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো) টেগার্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি, অপর সকলে দেখা ক'রে তাঁদের জ্ঞাতব্য গোপন তথ্য অকপটে বলে যান। এখানে মনে প্রশ্ন জাগে— বর্তমান গ্রন্থ লিখতে গিয়ে যে-সমস্ত প্রামাণিক পুস্তকের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে তার কোনোটিতেই টেগার্টের আন্দামানে যাওয়ার সামান্যতম উল্লেখ পাওয়া যায় নি। অন্তত বীর সাভারকর, যিনি কাউকে তোয়াক্কা করে তথ্য গোপন করেন না, ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে তাঁর বইতে উল্লেখ থাকা স্বাভাবিক ছিল।

৬	অবনী চক্রবর্তী—	খুলনা ষড়যন্ত্র মামলা	(৭ বছর)
৭	বিধুভূষণ দে—	ঐ	(৭ বছর)
৮	শচীন্দ্রলাল মিত্র—	ঐ	(৭ বছর)
৯	অশ্বিনীকুমার বোস—	ঐ	(৭ বছর)
১০	নগেন্দ্র চন্দ্র—	ঐ	(৭ বছর)
১১	সুধীরকুমার দে—	ঐ	(৫ বছর)
১২	ননীগোপাল মুখার্জি—	ডালহৌসি বোমা মামলা	(১৪ বছর)
১৩	পুলিনবিহারী দাস—	ঢাকা-ষড়যন্ত্র মামলা	(৭ বছর)
১৪	জ্যোতির্ময় রায়—	ঐ	(৬ বছর)
১৫	বাবু রামহরি—	'স্বরাজ্য'-মামলা	(৭ বছর)
১৬	নন্দগোপাল চোপড়া	ঐ	(১০ বছর)
১৭	লোধারাম—	ঐ	(১০ বছর)
১৮	হোত্তিলাল ভার্মা—	ঐ	(১০ বছর)
১৯	রামচন্দ্র লাল—	যুগান্তর-মামলা	(১০ বছর)

আন্দামান সেলুলার জেলের এই বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার কাজ আরম্ভ হয় ১৯১৪ সালের মে মাসের শেষ ভাগ থেকে আর কাজ শেষ হয় ১৯১৪ সালের

তা হলে কি এটি একটি কল্পিত রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছিল এবং টেগার্টের নিজস্ব গুরুত্ব প্রমাণের প্রচেষ্টা মাত্র ? কারণ এই প্রসঙ্গে তুলনীয় আরেকটি রিপোর্ট পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করা যায়— রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে 'TEGART REPORT'—অনেক উদ্ভট ও অসংলগ্ন মনগড়া তথ্য (?) দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে একটি বিষয়ই কেবল উল্লেখ করব— ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে— '...She was not looked upon with much favour by the respectable Indians of Calcutta, as from all accounts she did not bear a good moral character and was living in a house with a number of young Bengalis. Her expenses were apparently met by the Ram Krishna Mission...' শঙ্করীপ্রসাদ বসু মহাশয়ের তীক্ষ্ণ মন্তব্য— "এ ব্যাপারটা পুলিশী গোয়েন্দাদের অনুমান নিবেদিতার নৈতিক চরিত্রদোষের জন্যই ঘটেছিল— টেগার্টের মতো চরিত্রের লোকের কাছে তা স্বতঃই গ্রাহ্য বিবেচিত

সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি। আর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর কারাদণ্ডে দণ্ডিত যে ক'জন বন্দী আন্দামান সেলুলার জেলে রয়ে গেলেন, তাঁরা হলেন :

১	বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—	আলিপুর বোমা-মামলা
২	হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো)—	ঐ
৩	উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—	ঐ
৪	সুরেশচন্দ্র সেন—	রাজেন্দ্রপুর ট্রেন ডাকাতি মামলা
৫	বিনায়ক দামোদর সাভারকর—	নাসিক-ষড়যন্ত্র মামলা
৬	গণেশ দামোদর সাভাবকর—	ঐ
৭	বামন যোশী ওরফে দাজী—	ঐ

হয়েছিল। এই উদ্ভট কথার মতো আর একটি ভ্রান্ত কথা— নিবেদিতার খরচ রামকৃষ্ণ মিশন বহন করত।"— ('বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—খণ্ড ৬, পৃ. ২৫৫ ও ২৭৩)। এরকমই যদি টেগার্টের রিপোর্টের নমুনা হয় তা হলে আন্দামানে বিপ্লবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার কতখানি গ্রহণীয়। একে আমরা টেগার্ট-কর্তৃক বিপ্লবীদের চরিত্রহননের ইচ্ছাকৃত অপচেষ্টা বলে মনে করতে পারি না কি ? যেভাবে দলিল-দস্তাবেজের ফোটো কপি দিয়ে উক্ত রচনায় প্রকাশিত হয়েছে তাতে সন্দেহ করার অবকাশ নেই রিপোর্টটির সত্যতা সম্বন্ধে। কিন্তু যেটা জিজ্ঞাস্য— তা হল ইতিহাসের নিবন্ধে যাচাই করার যা পদ্ধতি আছে তা করা হয়েছে কিনা— অর্থাৎ প্রকৃতই বিপ্লবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটেছিল কিনা। আর এ বিষয়টি প্রকাশ পেল এখন যখন তদানীন্তন আন্দামান সেলুলার জেলের আর একটি বন্দীও বোধকরি জীবিত নাই। পরবর্তীকালে আন্দামান সেলুলার জেলে যাঁরা বন্দী ছিলেন তাঁদের যখন জিজ্ঞেস করেছি এ সম্বন্ধে— তৎক্ষণাৎ তাঁদের উত্তর— এই আজ জানলাম টেগার্ট আন্দামানে গিয়েছিল এবং বন্দীদের কাছ থেকে জবানবন্দী আদায় করেছিল। তবে রিপোর্ট প্রকাশ করার অনলস প্রচেষ্টায় লেখক অভিনন্দনযোগ্য। কেবলমাত্র লেখকের আনুমানিক নিজস্ব মন্তব্যগুলি প্রশ্নাতীত নয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও আন্দামান বন্দী

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার পরই আন্দামান সম্বন্ধে সরকারকে পূর্বকার নীতির পরিবর্তন করতে হল।

বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে ভারতের গুপ্ত সমিতির কার্যকলাপও বেড়ে যেতে থাকে। রাসবিহারী বসু প্রভৃতির চেষ্টায় ভারতে একই দিনে দেশীয় সৈন্য বিদ্রোহ করতে তৎপর হয়ে ওঠে। পূর্বাঞ্চলে ও বাংলায় প্রচুর জার্মান অস্ত্র আমদানী হওয়ার ব্যবস্থা হল। আর সেই অস্ত্র নিয়ে একই দিনে বাংলায় বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বিপ্লবের আগুন জলে উঠবে ঠিক হল। কিন্তু "মেভারিক" জাহাজ জার্মান অস্ত্রসহ ইংরেজদের হাতে ধরা পড়ায়. অস্ত্র এসে পৌঁছতে পারল না। উত্তর ভারতেও সৈন্যদের বিদ্রোহ করার কথা বিশ্বাসঘাতকতার ফলে প্রকাশ পায়—সরকার কড়া ব্যবস্থা নিয়ে বিদ্রোহ দমন করে। বহু দেশীয় সৈন্য গ্রেপ্তার হলেন—'গদর' পার্টির বহুকর্মী ধরা পড়লেন— আর বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মামলায় বহু লোক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও বিভিন্ন মেয়াদের দণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপৎ রায়কে ভারতে ঢুকতে দেওয়া হল না, সেই সময় তিনি বহির্ভারতে অবস্থান করেছিলেন। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রাজা সুবোধ মল্লিক প্রমুখ নেতাদের ১৮১৮ সালের ৩ আইনে গ্রেপ্তার করে রাজবন্দীরূপে (স্টেট প্রিজনার) পেশওয়ারে এক দুর্গে আটকে রাখা হল। দেশের বহু রাজনৈতিক কর্মী ভারত-রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হলেন। বিভিন্ন মামলায় আরো অনেককে জেল-বন্দী করা হল।

একমাত্র প্রথম লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলার ২৮ জনের (গদর পার্টির) ফাঁসি হল। আর এই মামলায় বহু ব্যক্তির ফাঁসির হুকুম রদ হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের হুকুম হয়— আপিলে বহু ব্যক্তির বিভিন্ন মেয়াদের জেল হল। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও দীর্ঘ মেয়াদের কারাদণ্ড নিয়ে প্রথম লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলার পঞ্চাশ জন বন্দী আন্দামান সেলুলার জেলে অন্তরীত হলেন।

বাংলায়ও বিভিন্ন মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ও বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ডিত বহু বন্দীকে আবার আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠানো হল।

রেঙ্গুন, বসরা, সিঙ্গাপুর, প্রভৃতি যুদ্ধ ফ্রণ্টে যেতে অস্বীকৃত বহু ভারতীয় সৈন্য ও রেঙ্গুনে যে-সমস্ত ভারতীয় সৈন্য বিদ্রোহ করার চেষ্টা করে তাদের বহু ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে আন্দামানে পাঠানো হয়। আর আমেদাবাদের সামরিক মামলারও কিছু বন্দীকে আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠানো হল। পূর্বের ক'জন রাজনৈতিক বন্দীকে নিয়ে এখন আন্দামান সেলুলার জেলে রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা ১৩৩ থেকে ১৫০ জন দাঁড়াল।

গদর পার্টি ও কজন বিশিষ্ট আন্দামান বন্দী :

১৯১৪ সালে সানফ্রান্সিসকোতে গদর পার্টি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। পার্টির মুখপত্রের নাম ছিল 'গদর'। গদর মানে বিপ্লব। প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেণ্ট বাবা সোহনসিং ভাকনা ভারতে আসেন এবং প্রথম লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়। আপিলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় ও আন্দামান সেলুলার জেলে প্রেরিত হন। গদর পার্টির নেতৃত্বে ভারতে ও ব্রিটিশ-অধিকৃত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, বর্মা, মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর এমন-কি শ্যাম বা থাইল্যাণ্ডেও বহু গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটে। হাজার হাজার ব্যক্তিকে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট গ্রেপ্তার করে— সবসুদ্ধ ন্যূনতম ১৪৫ জন গদর বিপ্লবীর ফাঁসি হয়, আর এঁদের ৩০৫ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। তাঁদেরই মধ্য থেকে কিছু ব্যক্তিকে আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠানো হয়। অন্যেরা বিভিন্ন জেলে দণ্ড ভোগ করেন।

এই সময় ১৯১৬ সাল থেকে গদর পার্টির যাঁরা আন্দামান সেলুলার জেলে ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়জন :

১. বাবা পৃথ্বী সিং আজাদ

গদর পার্টির একজন প্রতিষ্ঠাতা সভ্য। ১৯১৫ সালে প্রথম লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসির হুকুম হয়। আপিলে মৃত্যুদণ্ড রদ হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের হুকুম হয়। আন্দামান সেলুলার জেলে প্রেরিত হন। সেখান থেকে সব বন্দীকে দেশে ফিরিয়ে আনার পর মাদ্রাজ জেল থেকে কলকাতার কোনো জেলে নিয়ে যাওয়ার পথে ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে পালাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পরদিনই ধরা পড়েন।

পরের বছর রাজমহেন্দ্রী জেল থেকে তাঁকে যখন নাগপুর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হচ্ছিল তখন পুনরায় তিনি একটি চলন্ত মেল ট্রেন থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন ২৯.১১.১৯২২ তারিখে। তার পর থেকে তিনি ১৬ বছর আত্মগোপন করে থাকেন। ১৯৩৮ সালে মহাত্মা গান্ধীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন স্বেচ্ছায়। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট তাঁকে গ্রেপ্তার করে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

[সম্প্রতি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ২১.৮.১৯৮৭ তারিখে প্রকাশিত একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ বাবা পৃথ্বীসিং প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য :

"বিশ্বের বয়োবৃদ্ধ অ্যাথলিট

জলন্ধর, ১৯ আগস্ট— আগামী ২৮ নভেম্বর থেকে মেলবোর্নে অনুষ্ঠেয় ভেটারান অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের জন্য ভারত যে ২২ জনের দল গড়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ অ্যাথলিট ৯৫ বছর বয়সী। বাবা পৃথ্বী সিং আজাদ। স্বাধীনতা সংগ্রামী পৃথ্বী সিং এখন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বয়সী অ্যাথলিটসও।

—ইউ. এন. আই."]

২. বাবা মঙ্গল সিং

১ম লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন ; আপিলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। আন্দামান সেলুলার জেলে প্রেরিত হন। সেখানেই তাঁর জীবনাবসান হয়।

৩. ভাই ভান সিং

প্রথম লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আন্দামান সেলুলার জেলে আসেন (মামলার রায়— ১৩.৯.১৯১৫)। ভান সিং ঘানি টানতে অস্বীকার করায় তাঁকে হাতকড়া দিয়ে ঘানির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে ঘুরতে বাধ্য করে জেল-কর্তৃপক্ষ। পরদিন তিনি যখন সেলে বন্ধ ছিলেন তখন জেল সুপার জেল পরিদর্শনে এলে ভান সিং-এর সঙ্গে খুব কথা কাটাকাটি হয়। সুপার অপমানিত হন। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য জেল সুপারের আদেশে ভান সিংকে অন্য সকলের থেকে আলাদা করে তিন নম্বর ইয়ার্ডের ১৫৬নং সেলে আটক করা হয়। পরে রাত্রে এক সময় সেই সেলের তালা খুলে যোয়ান যোয়ান প্রহরী ও কয়েদীরা লাঠি দিয়ে ভান সিংকে প্রহার করতে করতে মেঝেতে ফেলে দেয়—

অমানুষিক প্রহার করে। এই নির্মম অকথ্য অত্যাচারে ভান সিং রক্ত বমি করতে থাকেন— জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। ক'দিন পর তিনি মারা যান। সকলে শুনল যে ভান সিং রক্ত আমাশয়ে মারা গেছেন।

৪. পণ্ডিত জগৎরাম

গদর পার্টির সভ্য। পার্টির মুখপত্র 'গদর'-এর সম্পাদকদের মধ্যে একজন। প্রথম লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলায় মৃত্যুদণ্ড হয়। আপিলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। আন্দা-মান সেলুলার জেলে প্রেরিত হন।

৫. কেহর সিং

গদর পার্টির সভ্য। প্রথম লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড নিয়ে আন্দামান সেলুলার জেলে আসেন। সেখানে ১৯২০ সালে তিনি মারা যান।

৬. সর্দার গুরমুখ সিং

গদর পার্টির সভ্য। হংকং-এর ব্যবসায়ী ছিলেন। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ যখন গদর পার্টির সভ্যদের কানাডা ত্যাগের আদেশ দেয় তখন তাঁরা হংকং-এ আসেন। সর্দার গুরমুখ সিং তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করে একটি জাহাজে (জাহাজটির নাম 'কামাগাটামারু') ঐ-সব বিপ্লবীদের নিয়ে ভারতে আসেন কলকাতার বজবজে। ব্রিটিশ সরকার তাঁদের তীরে নেমে ভারতে ঢুকতে দিতে অস্বীকার করে। তাঁরা জাহাজে অনশন শুরু করেন। ক'দিন পর সরকারের সঙ্গে ব্যবস্থা হয়— প্রত্যেককে যার যার জেলায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সৈন্য পাহারায় তাঁদের তীরে নামানো হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিপ্লবীদের সঙ্গে সৈন্যবাহিনীর সংঘর্ষ বাধে। সৈন্যরা গুলি চালায়। বহু বিপ্লবী মারা যান। অনেক আহত হন। তাঁদের গ্রেপ্তার করা হল। সর্দার গুরমুখ সিংও গ্রেপ্তার হন। প্রথম লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলায় অনেকের সঙ্গে সর্দার গুরমুখ সিং-এর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। তাঁকে আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠানো হয়। সেলুলার জেলের অত্যাচারে নিপীড়িতদের প্রথমদলের তিনি একজন। তার পর যুদ্ধ শেষে ১৯২০-২১ সালে যখন রাজনৈতিক বন্দীগণকে আন্দামান সেলুলার জেল থেকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়, তিনিও তাঁদের মধ্যে ছিলেন। ১৯২২ সালে এক জেল থেকে

অন্য জেলে বদলি করার সময় তিনি একটি চলন্ত ট্রেন থেকে পালিয়ে যান। আত্মগোপন করা অবস্থায় তিনি আফগানিস্থান হয়ে মস্কো পৌঁছান। মস্কোতে প্রাচ্যের মেহনতী জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি একটি শিক্ষাক্রম শেষ করেন। আবার দীর্ঘকাল পর আত্মগোপন করে তিনি পাঞ্জাবে ফিরে আসেন ও কৃষকসংগঠনের কাজ শুরু করেন। ১৯৩৬ সালে সহকর্মীর বিশ্বাসঘাতকতায় সর্দার গুরমুখ সিং আবার ধরা পড়েন। আগের দণ্ডের বাকী অংশটির দণ্ড ভোগ করার জন্য তাঁকে আবার আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠানো হয়। ১৯৩৭ সালের আন্দামান-বন্দীদের ঐতিহাসিক অনশন হয় সর্দার গুরমুখ সিং-এর পরামর্শেই। অবশেষে ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়— মুক্তি পান ১৯৪৫ সালে। অমায়িক, সিদ্ধান্তে ও কার্যে অবিচল, বিরাট বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের অধিকারী এই বিপ্লবী সর্দার গুরমুখ সিং সত্তরের দশকের শেষভাগে মারা যান।

৭. ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ)

অনুশীলন সমিতির শীর্ষস্থানীয় কিংবদন্তী নেতা। আত্মগোপনকালীন ছদ্মনাম— 'মহারাজ' নামেই প্রসিদ্ধ। ১৯০৮ সালে প্রথমে ছয় মাসের জন্য কারারুদ্ধ হন। ১৯১২ সালেও গ্রেপ্তার হন। ১৯১৪ সালে বরিশাল-ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হন ও মদন ভৌমিক (১০ বছর সাজা) ও খগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (১০ বছর সাজা)-র সঙ্গে ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ১৫ বছরের সাজা নিয়ে আন্দামান সেলুলার জেলে আসেন। ১৯২১ সালে তাঁকে আন্দামান থেকে ভারতের জেলে আনা হয়। ১৯২২ সালে তিনি মুক্তি পান। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত বিনা বিচারে আটক থাকেন। আবার ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত বিনাবিচারে আটক থাকেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আবার তিনি গ্রেপ্তার হয়ে বিনাবিচারে আটক হন— ১৯৪৫ সালে মুক্তি পান। তিনি ব্রিটিশ জেলে ত্রিশ বছরেরও বেশি আটক থাকেন। দেশ বিভক্ত হওয়ার পরও দীর্ঘকাল তিনি পূর্ব পাকিস্তান জেলে আটক থাকেন। চিকিৎসার্থে ভারতে এসে দিল্লীতে ৯ আগস্ট, ১৯৭০ এই মহান বিপ্লবীর জীবনাবসান হয়।

৮. শচীন্দ্রনাথ সান্যাল

কাশীর বাসিন্দা। ১৯০৭ সালে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। বিপ্লবী নেতা

রাসবিহারী বোসের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ১৯১৪ সালে বেনারস-ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আন্দামান সেলুলার জেলে প্রেরিত হন। ১৯২০ সালে মুক্তি পান। ১৯২০ সালে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের একজন প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২৫ সালের প্রথম দিকে কাঁকোরী ট্রেন ডাকাতি মামলায় কলকাতায় গ্রেপ্তার হন। এই মামলায় তাঁর আবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। বন্দী থাকাকালীন ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হন ও ১৯৩৭ সালে মুক্তি পান। আবার ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় গ্রেপ্তার হন ও অসুস্থ থাকায় তাঁকে গোরক্ষ-পুরে অন্তরীণ করে রাখা হয়। অন্তরীণ থাকা অবস্থায় ১৯৪২ সালে তিনি মারা যান।

৯. পণ্ডিত রামরক্ষা

গদর পার্টির সভ্য। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় দলের নির্দেশে তিনি বর্মায় যান। নিরলস কর্মী। সিঙ্গাপুরের ভারতীয় সৈন্যদের দিয়ে তাঁর বিদ্রোহের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯১৭ সালে অতিরিক্ত মান্দালয়-ষড়যন্ত্র মামলায় পণ্ডিত রামরক্ষার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় এবং অন্যান্যদের সঙ্গে আন্দামান সেলুলার জেলে প্রেরিত হন। উপরন্তু তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেখানকার অত্যাচারের প্রতিবাদে ও আন্দামান জেলে তাঁর উপবীত কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে তিনি আমরণ অনশন (প্রায় তিনমাস) করে আন্দামান সেলুলার জেলে প্রাণত্যাগ করেন।

১০. জ্যোতিশচন্দ্র পাল

উড়িষ্যায় বালেশ্বরের বুড়ীবালামের তীরে ১৯১৫ সালে ৯ সেপ্টেম্বর বিপ্লবীবীর বাঘা যতীন ও তাঁর সঙ্গীদের ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে যে যুদ্ধ হয় তাতে— চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী ঘটনাস্থলেই গুলিতে নিহত হন। বাঘা যতীন গুলিতে গুরুতর আহত হয়ে ১০ সেপ্টেম্বর ১৯১৫তে আত্মাহুতি দেন। বিচারে মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও নীরেন্দ্র দাসগুপ্তের ফাঁসি হয়, জ্যোতিশচন্দ্র পালের চৌদ্দ বছর জেল হয়। তাঁকে আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি উন্মাদরোগগ্রস্ত হন। তাঁকে বহরমপুর জেলে আনা হয় চিকিৎসার জন্য। তাঁর অবস্থার কিছু উন্নতিও হয়েছিল। কিন্তু মুক্তি পাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে ৪ ডিসেম্বর ১৯২৪ সালে হঠাৎ রহস্যজনকভাবে জেলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

অনশন ও প্রত্যাবর্তন

আন্দামান সেলুলার জেলে জেলারের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা ও হাতাহাতি করার জন্য ঝাঁসীর প্রখ্যাত বিপ্লবী পণ্ডিত পরমানন্দকে শাস্তিস্বরূপ কুড়ি ঘা বেত মারা হয়। কতজন কত রকমভাবে শাস্তি ভোগ করলেন, অত্যাচারিত হলেন তার ইয়ত্তা নাই। নারকেলের ছোবড়া পেটাই ও অন্যান্য কাজ করতে করতে বন্দীরা অবসন্ন হয়ে যাচ্ছিলেন। বন্দীদের মৃত্যু সংখ্যাও বাড়ছিল।

সর্দার ভান সিং ও পণ্ডিত রামরক্ষার মৃত্যু আন্দামান সেলুলার জেলের বন্দীদের মধ্যে ভীষণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই অত্যাচার অবিচারের প্রতিবাদে জেলের সত্তরজন বন্দী একসঙ্গে কর্মবিরতি ঘোষণা করেন। কর্মবিরতির পর শুরু হল অনশন। একশো জন বন্দী অনশন শুরু করলেন। কিছুদিন এই অনশন চলতে থাকে। ইতিমধ্যে ভারতের খবরের কাগজে কাগজে আন্দামান বন্দীদের অবস্থার কথা প্রচারিত হয়ে যায়। সেলুলার জেলের সুপার ও জেলার অত্যাচারী ব্যারি সাহেব বদলী হল। নূতন সুপার ও জেলার বন্দীদের সঙ্গে একটা রফা করেন ভারত গবর্নমেণ্টের পরামর্শে। সরকার অধিকাংশ দাবি মেনে নেওয়ায় বন্দীরা অনশন ভঙ্গ করেন। সাভারকর তাঁর গ্রন্থে বলেছেন— একমাত্র ইংলণ্ডের রাজনৈতিক বন্দীদের মতন মর্যাদা পাওয়ার দাবি ছাড়া বন্দীদের সব দাবিই সরকার মেনে নেয়। আন্দামানের বন্দীদের ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক সব ভারী কাজ থেকে রেহাই দিয়ে সকলকে লঘু কাজ দেওয়া হল। কিন্তু বন্দীরা তখনো জানতেন না যে তাঁদের দুঃখের দিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড রিফরম্ প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সালে। সেই অনুযায়ী আন্দামানে সেলুলার জেল পরিদর্শনে যায় 'জেল কমিটি'। ঐ 'জেলকমিটির' সুপারিশে ভারত সরকার ভবিষ্যতে আন্দামান সেলুলার জেলে আর কোনো রাজনৈতিক বন্দী প্রেরণ না করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং রাজনৈতিক বন্দীদের ১৯২০ সাল থেকে শুরু করে ১৯২১ সালের মধ্যে দেশে নিয়ে আসা হয়। আন্দামান সেলুলার জেলের বিভীষিকার উপর যবনিকাপাত হল। সকলের শেষে আন্দামান সেলুলার জেল থেকে ভি. ডি. সাভারকরকে ভারতের জেলে ফিরিয়ে আনা হয়, আর আগে আনা হয় গণেশ সাভারকরকে।

ভারত সরকার এই সময় সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়ায় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেও, কিছু বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হল না ; তাঁরা সাজা খাটতেই

লাগলেন। তাঁদের মধ্যে ভি. ডি. সাভারকর অন্যতম। নাসিকের একটি বাড়িতে তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখা হল। বাড়ির চার দিকে প্রহরী, তিনি কোনো সময়েই বাড়ির বাইরে যেতে পারবেন না ; তবে পরিবারের সকলেই সেই বাড়িতে বাস করতে থাকেন। এইভাবে অন্তরীণ হয়ে বীর সাভারকরকে থাকতে হয় বহুদিন, বহুকাল। ১৯৩৭ সালে তিনি মুক্তি পান। নিরবচ্ছিন্ন ভাবে— একটানা এতদীর্ঘ কাল আর কেউ বন্দী ছিলেন না।

আন্দামান সেলুলার জেলে বন্দী

প্রথম পর্যায় ১৯০৯/১০-১৯২১

বাংলাদেশ

২ অবিনাশ ভট্টাচার্য
৩ অমৃতলাল হাজরা
৪ আশুতোষ লাহিড়ী
৫ অশ্বিনীকুমার বসু
৬ বারীন্দ্রকুমার ঘোষ
৭ ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ
৮ বিভূতিভূষণ সরকার
৯ বিধুভূষণ দে
১০ বিধুভূষণ সরকার
১১ বীরেন্দ্রনাথ সেন
১২ ব্রজেন্দ্রনাথ দত্ত
১৩ গোবিন্দচন্দ্র কর
১৪ গোপেন্দ্রলাল রায়
১৫ হরেন্দ্র ভট্টাচার্য
১৬ হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো)
১৭ হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল
১৮ ইন্দুভূষণ রায়
১৯ যতীন্দ্রনাথ নন্দী
২০ জ্যোতিশচন্দ্র পাল
২১ কালিদাস ঘোষ
২২ খগেন্দ্রনাথ চৌধুরী ওরফে সুরেশচন্দ্র
২৩ কিনুরাম পাল ওরফে প্রিয়নাথ
২৪ ক্ষিতীশচন্দ্র সান্যাল
২৫ মদনমোহন ভৌমিক
২৬ নগেন্দ্রনাথ চন্দ
২৭ নগেন্দ্রনাথ সরকার
২৮ ননীগোপাল মুখার্জি
২৯ নরেন ঘোষ চৌধুরী
৩০ নিখিলরঞ্জন গুহরায় (পরে ১৯৩২-৩৮ সালে)
৩১ নিকুঞ্জবিহারী পাল
৩২ নিরাপদ রায়
৩৩ ফণীভূষণ রায়
৩৪ পুলিনবিহারী দাস
৩৫ শচীন্দ্রনাথ দত্ত
৩৬ শচীন্দ্রলাল মিত্র
৩৭ সানুকূল চ্যাটার্জি
৩৮ সতীশচন্দ্র চ্যাটার্জি (ভট্টাচার্য.)
৩৯ সত্যরঞ্জন বসু
৪০ সুধীরচন্দ্র দে
৪১ সুধীরকুমার সরকার

৪২ সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৪৩ সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
৪৪ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ)
৪৫ উল্লাসকর দত্ত
৪৬ উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বোম্বাই

৪৭ বামন যোশী ওরফে দাজী
৪৮ গণেশ দামোদর সাভারকর
৪৯ বিনায়ক দামোদর সাভারকর

উত্তরপ্রদেশ

৫০ গোবিন্দ রাম
৫১ হোতিলাল
৫২ লোধারাম
৫৩ মোক্ষদাবাবু
৫৪ মুজতবা হোসেন
৫৫ নন্দগোপাল চোপড়া
৫৬ পণ্ডিত পরমানন্দ (ঝাঁসি)
৫৭ রামহরি
৫৮ রোশনলাল
৫৯ শচীন্দ্রনাথ সান্যাল

পাঞ্জাব

৬০ আলী আহ্‌মেদ সিদ্দিকী
৬১ অমর সিং
৬২ ভাই পরমানন্দ
৬৩ ভান সিং
৬৪ বিশেন সিং ১ (পিতা জওনা সিং)
৬৫ বিশেন সিং ২ (পিতা কস্তুর সিং)
৬৬ বিশেন সিং ৩
৬৭ বিশেন সিং ৪
৬৮ চন্নন সিং
৬৯ ছত্র সিং ১
৭০ ছত্র সিং ২
৭১ চেতরাম
৭২ চুহের সিং
৭৩ গুরুদাস সিং
৭৪ গুরুদিৎ সিং
৭৫ গুরমুখ সিং ১
(পরে ১৯৩২-৩৮ সালে)
৭৬ গুরমুখ সিং ২
৭৭ হরদিত সিং
৭৮ হরনাম সিং
৭৯ হাজরা সিং
৮০ হিদারাম
৮১ হিরদা সিং
৮২ ইন্দার সিং ১
৮৩ ইন্দার সিং ২
৮৪ জগৎরাম
৮৫ জোয়ান্দ সিং
৮৬ জাওলা সিং
৮৭ জীবন সিং
৮৮ কালা সিং ১ (পিতা বসিতা সিং)
৮৯ কালা সিং ২ (পিতা গুলাব সিং)
৯০ কাপুর সিং
৯১ কর্তার সিং
৯২ খের সিং ১ (পিতা নেহাল সিং)

৯৩ খের সিং ২ (পিতা ভান সিং)
৯৪ কেশর সিং
৯৫ কৃপা সিং
৯৬ কৃপাল সিং
৯৭ লকহন সিং
৯৮ কুশল সিং
৯৯ লাল সিং ১
১০০ লাল সিং ২
১০১ মদন সিং
১০২ মঙ্গল সিং
১০৩ মনোহর সিং
১০৪ মুনসা সিং
১০৫ নন্দ সিং ১
১০৬ নন্দ সিং ২
১০৭ নাধা সিং
১০৮ নেহার সিং
১০৯ নিধান সিং
১১০ পিয়ারা সিং
১১১ পৃথ্বী সিং আজাদ
১১২ রাজারাম
১১৩ রামরক্ষা বাহালী
১১৪ রামশরণ দাস
১১৫ রণবীর সিং
১১৬ রোড়া সিং
১১৭ রুলা সিং
১১৮ রুর সিং
১১৯ সজ্জন সিং
১২০ সাওন সিং
১২১ শের সিং
১২২ সিঙ্গারা সিং
১২৩ শির সিং
১২৪ মোহন সিং
১২৫ সুচা সিং
১২৬ সুরেইন সিং
১২৭ সুরজন সিং
১২৮ তেজা সিং
১২৯ উধম সিং
১৩০ ঠক্কর সিং
১৩১ ওসাকা সিং
১৩২ ওয়াসা সিং

মোপলা বিদ্রোহ ও আন্দামানে মোপলা বন্দী

খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরব থেকে এসে মোপলাগণ মালাবারের স্থানীয় লোকদের সঙ্গে বসবাস করতে থাকেন ও সেইখানেই ঘর-সংসার করে এদেশবাসী হন। চাষ-আবাদই তাঁদের প্রধান কাজ। স্থানীয় জমিদার ও ভূস্বামীদের দ্বারা এঁরা বরাবরই অত্যাচারিত। কালক্রমে মোপলারা সংখ্যায় বিপুল আকার ধারণ ক'রে মালাবারের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা অত্যন্ত স্বাধীনচেতা সম্প্রদায়। অতীতে বহুবার ইংরেজ সরকারের সঙ্গে তাঁদের ছোটোখাটো সংঘর্ষ হয়েছে।

১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন ও আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের খিলাফৎ-আন্দোলন পাশাপাশি চলতে থাকে। কেরল এবং মালাবারেও তার ঢেউ আসে। গান্ধীজি ও মৌলানা সৌকত আলি এখানে আসেন, অসহযোগ ও খিলাফৎ-আন্দোলন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। খিলাফৎ কমিটি গঠিত হয় এখানে। আবাদী জমির বিলি বন্দোবস্ত ও খাজনা প্রভৃতির ব্যাপারে অন্যায় অবিচার, জমিদার মহাজনদের অত্যাচার প্রভৃতি কারণে মোপলারা আগে থেকেই ইংরেজ-সরকার-বিরোধী ছিল। তাঁরা এবার অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রবল আন্দোলন হতে থাকে। আন্দোলনের নেতারা হলেন—তিরাঙ্গানির আলি মৌসাদীয়া (Ali Mausadiya of Terrangani Ali Raji), কুমারণ পাঠোরের শেঠি কয়া থাঙ্গল, (Seethi Koya Thangal of Kumaranpathore), ভেরিয়া কুমাথু কুঞ্জামণ্ডি হাজী (Veriya Kumathu Kunjamandi Hazi) প্রভৃতি।

আন্দোলন চলতে থাকে, পুলিসী জুলুমও বাড়তে থাকে। ১৯২১ সালের আগস্ট মাসে মোপলারা নিলাম্বর রাজার পুকে থুর প্রাসাদ আক্রমণ করে। পুলিস এই ঘটনার নেতা, খিলাফৎ কমিটির সেক্রেটারি বেদাক্কেভিথিল মহম্মদ (Vedakkeveethil Muhammad)-কে গ্রেপ্তার করার জন্য তাঁরা বাড়ি তল্লাশী করে ও মসজিদেও ঢোকে। এতে হাজার হাজার মোপলা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। নেতাকে

পুলিস গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় নি। পুলিসের সঙ্গে মোপলাদের সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনা ঘটে ১৯২১ সালের ২০ আগস্ট।

এর্নাড় এবং ভাল্লুভানাড় (Ernad ও Valluvanad) তালুক দুটি ছিল মোপলাদের দুর্গ। এখানকার মোপলারা বিদ্রোহে জলে উঠল। এ-সব জায়গায় বিদ্রোহী মোপলারা থানা আক্রমণ করে, গবর্নমেণ্টের ট্রেজারি লুট করে, অফিস-আদালতের সব নথীপত্র পুড়িয়ে দেয়। ১৯২৮ সালের ২৮ আগস্টের পর মালাপ্পুরম্ (Malappuram), তিরুরাঙ্গাড়ি (Tirurangadi), মাজের (Majere) ও পেরিন্থালমৌনা (Perinthalmauna)-তে প্রকৃত পক্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। বিদ্রোহী মোপলাগণ বিকল্প সরকার গঠন করেন। ব্রিটিশ সরকার সৈন্য তলব করল— কঠিন সামরিক আইন (Martial law) জারী হল। সীমাহীন ইংরেজ-অত্যাচারের প্রতিরোধ করতে লাগলেন বিদ্রোহী মোপলারা। ১৯২১ সালের ১৯ নভেম্বর ধৃত ১২১ জন মোপলা বান্দীকে সরকার তিভুর (Tivur) থেকে একটি বদ্ধ মালগাড়ির কামরায় বন্দী করে বেলারী নিয়ে যাচ্ছিল। সকাল ৭-১৫ মিনিটে ট্রেন ছেড়ে রাত্রি ১২-৩০ মিনিটে কালিকটের পোদান্নুর (Podanur) পৌছোলে দেখা যায় বন্দীরা মৃতবৎ পড়ে আছে। সেই রাত্রেই ৫৬ জন বন্দীর মৃত্যু হয়, আর ২৬ জন পরে মারা যায়। মোপলা বিদ্রোহীদের সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যের যুদ্ধ চলতে থাকে। যুদ্ধে এই বিদ্রোহের অন্যতম নেতা ভেরিয় কুমাথু কুঞ্জামাণ্ডু হাজী এক সংঘর্ষ ব্রিটিশসৈন্যর হাতে বন্দী হন। ২০ জানুয়ারি ১৯২২ তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। আস্তে আস্তে বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে আসে। পরে ছয় মাস পর্যন্ত সামরিক আইন বজায় থাকে।—

এই মোপলা বিদ্রোহে সরকারী হিসাব অনুযায়ী ২৩৩৯ জন বিদ্রোহী মারা যান ; ১৬৫২ জন আহত হন, ৫৯৫৫ জন বিদ্রোহী গ্রেপ্তার হন। বিদ্রোহের শেষের দিকে ৩৯৩৪৮ জন আত্মসমর্পণ করেন। কয়েক হাজার বন্দীর বিভিন্ন-মেয়াদের কারাদণ্ড হয়। তার মধ্যে ১৪০০ জন মোপলা বিদ্রোহীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে ১৯২২ সাল থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যে আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠানো হয়। প্রায় সাড়ে ছয় মাস সেলুলার জেলে রাখার পর, সরকার এই বন্দীদের দেশ থেকে স্ত্রীপুত্র নিয়ে এসে আন্দামানেই বসতি স্থাপন করে বসবাস করার অনুমতি দেয়। যাঁরা এতে রাজী হবেন না তাঁদের এখানে বা দেশে তাঁদের কারাদণ্ডের মেয়াদ ভোগ করতে হবে। প্রায় সকলেই দেশ থেকে স্ত্রীপুত্র নিয়ে

এসে আন্দামানেই বসবাস করতে থাকেন। ইংরেজসরকার এই-সব বন্দীদের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করে। সে সময়ও এই মোপলা বন্দীদের সঙ্গে সরকার তরফের সংঘর্ষে কিছু বন্দী ও ইংরেজ সরকারী কর্মচারী মারা যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য এই মোপলা বিদ্রোহী বন্দীদের শ্রমেই বর্তমান আন্দামানের বন জঙ্গল সাফাইয়ের কাজ ও জিমখানা ময়দান প্রভৃতি তৈরি সম্ভব হয়েছে। এঁরা আর কেউ দেশে ফিরে আসেন নি।— আন্দামানেই বসবাস করতে থাকেন। ইংরেজ-কর্তৃক মোপলা বিদ্রোহকে সাম্প্রদায়িক লড়াই আখ্যা দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও এই বিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম বলে স্বীকৃত হয়েছে।

১৯২২-১৯২৪ সালে আন্দামানে প্রেরিত কয়েকজন মোপলাবন্দী :

১. নেল্লিপরম্বন আলাভি হাজী (Nelliparamban Alavi Haji)
২. কোলেপোরাম্বন কুঞ্জালারি (Koleparamban Kunjalari)
৩. কোজাহিশ্বেরী কোয়া কুট্টি (Kozahisseri Koya Kutty)
৪. আম্বাট্টুপরম্বন সাইদালিপ্পা (Ambattuparamban Saidalippa)
৫. কায়াকাটিপুরম্বিল কুঞ্জেনি (Kayakatiparambil Kunjeni)
৬. মাচিঙ্গাল রেয়িন (Machingal Rayin)
৭. কুথুকাল্লান কুঞ্জারা (Kuthukallan Kunjara)
৮. চঙ্গাথ আথান (Chungath Athan)
৯. ভারিভথ ভাল্লাপ্পিল আহম্মদ কুট্টি (Varivath Vallappil Ahmmed Kutty)
১০. মাথুম্মল আহম্মদ কুট্টি (Mathummal Ahmmed Kutty)
১১. পুয়িকুন্নান মারাকার (Pooyıkunnan Marakkar)
১২. মাচিঞ্চেরী আলাভি (Machincheri Alavi)
১৩. পোকাত কয়ামি (Pokat Koyami)
১৪. পুথামপীড়িকায়িল কুঞ্জিকাদের মোল্লা (Puthampeedikayil Kunjikader Molla)
১৫. মুক্রি কুঞ্জইয়াম্মু (Mukri Kunjajammu)
১৬. পুলকুন্ডিল কুন্হি ময়দিন্ কুট্টি (Poolakunyyil Kunhi Myideen Kutty)

১৭. পুভাকুন্দিল আলাভি (Poovakundil Alavi)
১৮. নীহিয়িল কুঞ্জিডু (Neehiyel Kunjeedu)
১৯. অরিপ্‌রা পোকার (Aripra Pocker)
২০. মাতুম্মাল মাভাক্কার (Mattummal Mavakkar)
২১. চাক্কুপুরাক্কাল কুট্টি হাসান (Chakkupurakkal Kutty Hasan)

এই মোপলা-বিদ্রোহ সম্পর্কে প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। ১৯২৬ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকার ব্রাহ্মসমাজ প্রাঙ্গণে সুপরিচিতা বিপ্লবী নেত্রী শ্রীমতী লীলা নাগ (রায়) এবং তাঁর পরিচালিত 'দীপালি সংঘ' কর্তৃক আয়োজিত রবীন্দ্র-অভ্যর্থনা সভায় রবীন্দ্রনাথ যা বলেন তা শ্রীমতী লীলা রায়ের ভাষায় : "…ঢাকার কয়েকজন দেশসেবী যুবক এ সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মোপলা-বিদ্রোহ নিয়ে আলোচনা করেন। সেদিন যে নিষ্ঠুরতার সহিত ইংরেজ-শাসক বিদ্রোহী মোপলাদের শায়েস্তা করবার অভিযান শুরু করেছিল, ভারতবর্ষের সচেতন জনমত তাতে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল, যদিও সামগ্রিকভাবে দেশে এ নিয়ে খুব আলোড়ন হয় নি। আলোচনার বিষয় ছিল, কেন সারা দেশ এ নিয়ে আন্দোলন করল না, তার কারণ কবি কি মনে করেন। সেদিন কবি যা বলেছিলেন তার সারমর্ম : দূরকে আমরা ঠিক নিকটের জন হিসেবে দেখতে পারি না। আজ যদি বাঙলায় বাঙালীর উপর ঐ অত্যাচার হত তবে সমস্ত বাঙলা নিঃসন্দেহ সাড়া দিত কিন্তু দূরবর্তী মোপলাদের প্রতি আমাদের এ আত্মীয়তা-বোধ নেই— তাদের অত্যাচার অপমানকে আপন করে দেখতে আমরা পারি নি।"

—"আমাদের রবীন্দ্র তর্পণ", 'জয়শ্রী', লীলা রায় জন্মবার্ষিকী সংখ্যা, শারদীয় ১৩৭৫।

রাম্পা বিদ্রোহ ও সেলুলার জেলে বন্দী রাম্পা বিদ্রোহীগণ

জমির খাজনা, ট্যাক্স, মহাজনের অত্যাচার ও সর্বোপরি ইংরেজ সরকারী কর্মচারী-দের নির্মম নিপীড়নে জর্জরিত, ব্রিটিশ কমিশনারের অধীন রাম্পা গোদাবরী এজেন্সি (Rampa Godavari Agency)র (বস্তার থেকে বা মধ্যপ্রদেশ থেকে বেশিদূরে নয়— তখনকার মাদ্রাজে— বর্তমান কেরলে) কৃষক জনসাধারণ ১৯২২-২৪ সালে ইংরেজ শাসনের অবসানের জন্য সীতারাম রাজুর নেতৃত্বে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করেন।

আল্লুরি সীতারাম রাজু (Alluri Sitaram Raju) বিশাখাপত্তনম জেলার পাইণ্ডি পাট্টা (Paindi Patta) গ্রামের একজন সাধু প্রকৃতির লোক। স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব। লোকে তাঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা করত। দরিদ্র কৃষকদের উপর সরকার ও বড়োলোকদের অত্যাচারে রাজু ব্যথিত ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্রিটিশ শাসনই-এর মূল কারণ। আর এই মূল কারণ রোধ করতে গিয়েই তিনি ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থাকে চরম আঘাতে ভেঙে চুরমার করে দেবার জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষকদের মধ্যে ব্রিটিশ-বিদ্বেষ প্রচার করতে থকেন। কৃষকদের মধ্যে থেকে বাছাই করে তাঁর সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। রাজুর সেনাবাহিনী বৃদ্ধি পেতে থাকে, রণশিক্ষাও চলতে থাকে।

সীতারাম রাজু প্রথম আঘাত হানেন— ১৯২২ সালের ২২ আগস্ট চিন্দা-পাট্টি (Chindapatti) পুলিস স্টেশন আক্রমণ করে। এতে তাঁর দলের ৩০০ কৃষক যোদ্ধা যোগ দেয়, হস্তগত করে বহু অস্ত্র। পর পর তিনটি থানা লুঠ করে তাঁরা আরো অস্ত্র পেলেন।

ক্রমেই রাজুর শক্তি বাড়তে থাকে। দলে দলে কৃষক জনসাধারণ তাঁর বাহিনীতে যোগ দিতে থাকে। এই সময়ে রাজুর সৈন্যবাহিনীতে সশস্ত্র, সাহসী ও সমরকুশল ১২০০ কৃষক যোদ্ধ ছিল। ব্রিটিশ সরকারও রাজুর সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাল। ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে রাজুর বাহিনীর যুদ্ধ হতে থাকে। ১৯২২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর চকিত আক্রমণে রাজুর সৈন্যদল গুজরিঘাট (Gujarighat)-এ ট্রেইমেহেয়ার(Tremeheir) ও বেস্টোয়ান (Bestwon)-এর অধীনস্থ ইংরেজ সৈন্য-

বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে। তড়িৎ গতিতে তীব্র আক্রমণই ছিল রাজুর যুদ্ধের কৌশল। ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২২-এ রাজুর বাহিনী একদল ইংরেজ সৈন্যকে পরাজিত করে তছনছ করে দেয়, ইংরেজ সামরিক অফিসার স্কট্ (Scott) ও হাইটার (Heighter) জীবন হারান। আহতদের ও বহু অস্ত্র ফেলে ইংরেজ সৈন্য প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায়। কৃষক বাহিনীর হাতে প্রচুর রাইফেল প্রভৃতি অস্ত্র আসে। ২২ অক্টোবর ১৯২২-এ রাজুর বাহিনী তাদের তীব্র গতির রণকৌশলে আবার একটি ইংরেজ সৈন্যদলকে পরাজিত করে। ইংরেজ সেনাপতি স্যাণ্ডার্স (Sanders)কে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে হয়। রাজুর সৈন্যবাহিনী এই সময় বিস্তীর্ণ এলাকায় পরিবহন ব্যবস্থা ও টেলিগ্রাফ-টেলিফোন ব্যবস্থা অচল করে দেয়।

ইংরেজ সরকার এবার রাজুর বিরুদ্ধে মেশিনগান ও লুইস গান-এ সজ্জিত সৈন্য-বাহিনী পাঠাল। ৬ ডিসেম্বর ১৯২২ সালের এক যুদ্ধে রাজুর বাহিনী পরাজিত হয়ে পিছু হটে।

এর পর রাজুর সৈন্যবাহিনী ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে বিদ্যুৎ বেগে থানা ও ইংরেজ সৈন্যদলকে আক্রমণ ক'রে চকিতে মিলিয়ে যেত— সেপ্টেম্বর ১৯২৩ সাল পর্যন্ত এইরকম চলতে থাকে।

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯২৩-এ কৃষকবাহিনী গুদেম (Gudem) পুলিস ক্যাম্প আক্রমণ করে সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করে দেয়।

এই সময় ব্রিটিশ সরকার রাজুর মাথার ওপর ১৫০০ টাকা পুরস্কার ও আরো অনেককে ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে।

রাজুর সৈন্যবাহিনীর নেতারা হচ্ছেন— গাম ভ্রাতৃদ্বয় (Gam Brothers) গোকিরি এর্‌রেসু (Gokiri Erresu), আগ্‌গি ডোরা (Aggi Dora), এণ্ডু পাদাল (Endu Padal), পাণ্ডু পাদাল (Pandu Padal), বীরাজ্জা ডোরা (Veerayya Dora), মাল্লু ডোরা, সতী রাজু প্রভৃতি। সাহসে, চরিত্রে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এঁরা অমর। শ্রীমেট্টাদাম বীরাজ্জা ডোরা (Mettadam Veerayya Dora) ও তাঁর পিতা সোবিলোনা ডোরা (Sobelona Dora)— দুই নেতা ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ সমরে প্রাণ দেন। এঁরা সকলেই আত্ম-গোপনে করে আক্রমণ চালাতেন। গ্রামের সাধারণ কৃষকদের কাছ থেকে তাঁরা কোনো জিনিস, এমন-কি খাদ্যদ্রব্যও নিতেন না। যে-সব সরকারী খাদ্য বিভিন্ন

জায়গায় পাঠানো হত, তাঁরা তাই লুঠ করে নিতেন। কৃষকদের তাঁরা সব রকম ভাবে সাহায্য করতেন।

ব্রিটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত রাজুর বাহিনীর বিরুদ্ধে আসাম রাইফেল সৈন্য-বাহিনীকে নিয়োগ করে। বিস্তীর্ণ এলাকা মিলিটারি ঘিরে ফেলে—চরম অত্যাচার চালাতে থাকে। গ্রামে গ্রামে লুঠ, ছিনতাই চলে, আগুন দিয়ে গ্রামগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হতে থাকে।

সীতারাম রাজুর বাহিনীকে ব্রিটিশ বাহিনী ঘিরে ফেলে। ৭ মে ১৯২৪ সালে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় রাজু ইংরেজ সৈন্যর হাতে ধরা পড়েন। তৎক্ষণাৎ তাঁকে ব্রিটিশ সৈন্যক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। দেরি না করে একটি গাছে বেঁধে, আসাম রাইফেল বাহিনীর মেজর গুডওয়াল (Goodwall) রাজুকে গুলি করে মেরে ফেলেন। এইভাবে বিপ্লবীনেতা সীতারাম রাজুর ২৭ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়।

বিদ্রোহ ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসতে থাকে। এর মধ্যেই ২৪ মে ১৯২৪-এ রাজুর এক বিশ্বস্ত সহকর্মী য়েভদের পাণ্ডাল (Yevder Pandal)-কে পুলিস গুলি করে মেরে ফেলে। ক্রমে ক্রমে অনেক কৃষক যোদ্ধা গ্রেপ্তার হলেন। তাঁদের দীর্ঘ মেয়াদের জেল হল। কারো কারো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল। যাবজ্জীবন কারা-দণ্ডপ্রাপ্ত কিছু যোদ্ধাকে আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠানো হল। আন্দামানে যাঁদের পাঠানো হল তাঁদের মধ্যে মাল্লু ভোরা সাড়ে তেরো বছর আন্দামান সেলুলার জেলে বন্দী ছিলেন। তার পরও আরো সাড়ে তিন বছর অন্তরীণ ছিলেন। সতী রাজু বন্দী অবস্থায় আন্দামান সেলুলার জেলে মারা যান।

বোনাঙ্গী পাণ্ডু পাদেল (Bonangi Pandu Padel) এখনও অন্ধ্র ও আন্দামানে একটি খুবই পরিচিত নাম। রাজুর দক্ষিণহস্তস্বরূপ এই কৃষক নেতার মাথার উপর ব্রিটিশ সরকার মোটা টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। রাজুর মৃত্যুর পর তিনি ধরা পড়েন। বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ১৯২৬ সাল পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জেলে ঘোরানোর পর তাঁকে আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠানো হয়। পাঁচ বছর আন্দামান সেলুলার জেলে বন্দীজীবন যাপন করার পর ব্রিটিশ সরকার তাঁকে, বিবাহ করে আন্দামানেই বসবাস করার অনুমতি দেয়। ১৯৭৪ সালে আন্দামানে তিনি মারা যান।

রাম্পা বিদ্রোহীদের মধ্যে ১৯২২-১৯৩২ পর্যন্ত যাঁরা আন্দামান সেলুলার জেলে বন্দী ছিলেন তাঁদের কয়েকজন :—

১ কোটায়া কোররাবু (Kotaya Korrabu)

২ পাণ্ডু পাদাল বোনাঙ্গী (Pandu Padal Bonangi)

৩ সন্ন্যাসসায়া গোলিভিল্লি (Sanyassaya Golivilli)

৪ সন্ন্যাসী কুঞ্চাট্টি (Sanyasi Kunchatti)

৫ সত্যনারায়ণ (সতী) রাজু (Satyanarayan (Sati) Raju)

৬ দিরায্যা ডোরা তাগগী (Dirayya Dora Taggi)

৭ মাল্লু ডোরা (Mallu Dora)

বার্মার থারাওয়াডডি (Tharrawaddy) বিপ্লব : পরিচয়, প্রকৃতি, পরিণতি ও নেতা ড. সায়া সান (Dr. Saya San)

১৮৮৩ সালে বার্মার রাজা থিবকে যুদ্ধে পরাজিত করার পরই সম্পূর্ণ বর্মা ইংরেজের অধীনে আসে। বর্মা তখন থেকে ব্রিটিশ-ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়। বলা হত Government of India and Burma। ১৯৩৫ সালে India Act, 1935 বলে বার্মা ভারত থেকে বিযুক্ত হয়। ইংরেজের অধীনেই থাকে, তবে স্বতন্ত্রভাবে তার শাসনকার্য পরিচালনা হত।

১৮৮৩ সালের যুদ্ধে পরাজিত রাজা থিবর সেনাবাহিনীর কিছু ব্যক্তিকে দণ্ড ভোগ করার জন্য আন্দামান দণ্ডোপনিবেশে পাঠানো হয়। শুধু এইটুকু ছাড়া তাঁদের সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না।

ইংরেজের কর্তৃত্বাধীনে আসার পর থেকেই বার্মার জনসাধারণ ইংরেজের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে এবং বেশ-কিছুকাল পরে তার প্রকাশ ঘটে। ১৯২৮-২৯ সালে সরকারকে Capitanon Tax (মাথাপিছু সম-পরিমাণ কর) দিতে নিম্ন বর্মার জনসাধারণ অস্বীকার করে। নিম্ন বর্মার—থায়েৎ-মাইয়ো (Thayetmyo), থারাওয়াডডি (Tharrawaddy), ইন্‌সিন (Insin), প্রোম (Prome) এবং এর পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ এলাকায় এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকে বর্মার সশস্ত্র বিপ্লবের চেষ্টা শুরু হয়। বর্মার বিপ্লবীদের সঙ্গে বাংলার বিপ্লবীদের সংযোগ হয়। ১৯৩০ সাল থেকে সরকার পক্ষের সেনাবাহিনীর সঙ্গে ছোটোছোটো বর্মী গেরিলা বিপ্লবীদলের সংঘর্ষ বাধতে থাকে। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরে রেঙ্গুনে একটি বড়ো রাজনৈতিক ডাকাতি হয়। অক্টোবরে— অনেক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী যাত্রীসহ একটি ট্রেন ন্যান্নিগ্‌চি ডাংক বা টুঙ্গুতে Nyannigchi-Dank (Γoungoo) উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হয়। থারা-ওয়াডডির কাছে একটি গ্রামে হানা দিয়ে বিপ্লবীরা কিছু বন্দুক নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এই ঘটনায় একজন সরকারী কর্মচারী ও একজন বিপ্লবীর মৃত্যু হয়। তার পর

এর কাছাকাছি দুইটি গ্রাম বিপ্লবীরা সম্পূর্ণ ভাবে লুঠ করে। ইনিওয়ার (Inywa) একটি রেলস্টেশন আক্রান্ত হয় ও সেই রাত্রেই টেলিগ্রাফের যন্ত্রপাতি ও লাইন নষ্ট করা হয়। পুলিস ও মিলিটারি বিপ্লবীদের ধরার চেষ্টা করলে তাঁরা জঙ্গলে আত্মগোপন করতে সক্ষম হন। ১৯৩০ সালের ২৪ ডিসেম্বর বিপ্লবীরা একটি বাংলো অক্রেমণ করে পুড়িয়ে দেয় ও একজন ব্রিটিশ বনবিভাগের ইন্‌জিনিয়ারকে হত্যা করে। মিলিটারির সঙ্গে সংঘর্ষে বিপ্লবীদের চার জন মারা যায়। সেইদিন সন্ধ্যায় বিপ্লবীরা য়েডাইকে (Yedaik) একটি পুলিসফাঁড়ি আক্রমণ করে, উভয় পক্ষে কিছু হতাহত হয়।

১৯৩০-এ দুশো জনের এক বিপ্লবী বাহিনীকে একদল পাঞ্জাবী সৈন্য আক্রমণ করে। এতে এগারো জন বিপ্লবী মারা যান। অনুরূপভাবে পুলিসের সঙ্গে এক বিরাট বিপ্লবী বাহিনীর সংঘর্ষে উভয়পক্ষে বহু হতাহত হয়, বিপ্লবীরা ধরা পড়তে থাকে। মোটের উপর এই বিদ্রোহকে কৃষক-বিদ্রোহ আখ্যা দেওয়া যায়, কারণ কৃষকরাই বেশির ভাগ এই বিদ্রোহের অংশীদার।

আলানটৌঙ্গ-এর (Alantaung) এক জঙ্গলে বিদ্রোহীদের একটি শক্ত ঘাঁটি ইংরেজ সৈন্যবাহিনী ধ্বংস করে পয়লা জানুয়ারি ১৯৩১ সালে, সংঘর্ষে পো-ল্বৌ (Po-Lwie) নামে বিদ্রোহীনেতা ও অপর নয় জন হত হন। অন্যান্য বিদ্রোহীরা তাঁদের নায়ক সহ সকলেই পেগু-র (Pegu) দিকে চলে যান। মিনহাতে (Minha) সরকার পক্ষের সঙ্গে বিপ্লবীদের যুদ্ধ হয়।

থারাওয়াডডিকে কেন্দ্র করে বহু দূরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় পর্যন্ত প্রায় তিনশো বিদ্রোহী মারা পড়ে— বহু আহত হয়, বন্দী হয় অনেকে। বিদ্রোহী বাহিনীর সঙ্গে সরকারী সৈন্যদলের খণ্ডযুদ্ধ চলতে থাকে।

পয়লা মার্চ ইনিওয়া লেথাড-র ১৯৩১ (Inywa Lathadaw) মাঝামাঝি একটি সেতু ও রেললাইনের কিছু অংশ উড়িয়ে দেয় বিপ্লবীরা। কয়েকটি রেলস্টেশন এই সময় আক্রান্ত হয় ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১২ জানুয়ারি ১৯৩১ থেকে থারাওয়াডডির বিভিন্ন জায়গায় বিপ্লবীদের আক্রমণ জোরদার হতে থাকে। সরকার এই বিদ্রোহী বাহিনীকে ধ্বংস করার জন্য সবরকম চেষ্টা করতে থাকে। থারাওয়াডডির ওক্কান (Okkan) থানা আক্রমণ করে বিদ্রোহীরা ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে মেরে ফেলে (৬ এপ্রিল ১৯৩১)।

পেগু (Pegu) ও টুঙ্গুতে (Toungoo) সে-সমস্ত নাগরিক ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করছিল এই সময় তারা বিদ্রোহী বাহিনীর হাতে নাজেহাল হয়।

১৯৩১ সালের এপ্রিলের প্রথম ভাগে একজন বাঙালী যুবক ব্রিটিশ শাসন থেকে বর্মাকে মুক্ত করবার আহ্বান জানিয়ে প্রচার পত্র বিলি করার সময় ধরা পড়েন। তাঁর সাড়ে তিন বছর জেল হয়। এর বেশ-কিছু আগে এগারোজন বাঙালী বর্মার বিভিন্ন জায়গায় গ্রেপ্তার হন।

সরকার গ্রামের অনেক লোককে ধরে বিশেষ আদালতে (special tribunal) বিচার করে সাজা দিতে থাকে। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী বর্মায়, বিশেষ করে থারওয়াডডি, ইন্‌সিন (Insin) প্রভৃতি জায়গায় গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের কোনোরকম সতর্ক না করেই গুলি চালিয়ে অনেক লোক মেরে ফেলে এবং গ্রামের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। গ্রামে গ্রামে এক বিভীষিকার রাজত্ব চলতে থাকে। প্রোম-এর (Prom) যুদ্ধে সতেরো জন বিদ্রোহীকে মেরে ভীতি প্রদর্শনার্থে তাদের মাথা দেহ থেকে কেটে নিয়ে সদর রাস্তায় ঝুলিয়ে রাখা হয়। গ্রামে গ্রামে উঁচু হারে পাইকারী জরিমানা ধার্য করা হয়। বিদ্রোহীরাও বিভিন্ন জায়গায় রেল-স্টেশন, থানা প্রভৃতি লুঠ করতে থাকে, জেলখানা ভেঙে বন্দীদের বের করে আনে। বিদ্রোহীদের গুপ্তচর বিভাগও খবর সরবরাহে সদা তৎপর। শহরে সরকারের একেবারে খাসদপ্তর থেকে বিদ্রোহীরা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে সৈন্যভর্তি ট্রেন যাতায়াতের খবর পেতেন ও সেগুলি ধ্বংস করতেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকারের রসদভর্তি গাড়িগুলিও তাঁরা লুঠ করতেন। বিভিন্ন স্থানে গভীর জঙ্গলে বিপ্লবীদের অনেক আস্তানা সেনাবাহিনী আক্রমণ ক'রে তাঁদের বহু অস্ত্র ও রসদ আটক করে। চরম দমননীতি চালিয়েও বার্মার সরকার যখন কিছুতেই এই বিদ্রোহ দমন করতে পারে না, তখন ভারত থেকে ২নং ম্যাঞ্চেস্টার বাহিনীকে (2nd Manchester Regiment) বর্মায় নিয়ে যাওয়া হল।

বিভিন্ন শহরে, গ্রামে, সরকারী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহী বর্মী কৃষক বাহিনীর যুদ্ধ হতে থাকে, উভয়পক্ষে হতাহত হতে থাকে; তবে বিদ্রোহীপক্ষের হতাহতের সংখ্যাই বেশি। কত বিদ্রোহী যে ধরা পড়ল, আহত হল, মারা গেল তার সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন। বহু ব্রিটিশ সরকারী অফিসার, সৈন্য, পুলিস বিদ্রোহীদের হাতে মারা পড়ল। প্রচুর বন্দুক, গুলি, বারুদ, অস্ত্র বিদ্রোহীরা লুঠ করল।

ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ২৩ মে ১৯৩১-এ থায়েৎমাইওতে জঙ্গলের মধ্যে বিপ্লবী-দের এক শক্ত ঘাঁটি আক্রমণ করে। সেখানে যুদ্ধে চার জন মারা গেল। তার মধ্যে বর্মায় এই বিদ্রোহের সর্বোচ্চ নেতার দক্ষিণ হস্ত ব'লে দুজনকে শনাক্ত করা হয়। ১৯৩১ সালের মে মাসের শেষ ভাগে সরকার ঘোষণা করে যে থারাওয়াডডি ও তৎসংলগ্ন এলাকার অবস্থা ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। সেজন্য ভারত থেকে আরো সৈন্য আমদানী করা হল।

থারাওয়াডডি, ইনসিন হেঞ্জেদা (Henzeda), থায়েৎমাইয়ো, হান্থাওয়ডাডি (Hanthawaddy), পাইয়ুগন (Pyugon) প্রভৃতি জায়গায় বিদ্রোহীরা জোর আক্রমণ চালায়। এক সময় থারাওয়াডডি সাত দিনের জন্য ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হয়ে বিদ্রোহীদের দখলে থাকে।

সর্বত্রই বিদ্রোহীদের লক্ষ্য ছিল সরকারের অস্ত্রের দিকে। যেখানে যে অস্ত্র পেতেন, তাই তাঁরা লুঠ করতেন।

সরকার এই সময় অনেকগুলি বর্মী সংগঠনকে বেআইনী ঘোষণা করে।

৩১ মে ১৯৩১ সালে রেঙ্গুন থেকে ১৬৬ মাইল দূরে একটি সেতুর উপর রেঙ্গুন-মান্দালয় মেল ট্রেনটি বিদ্রোহীরা উড়িয়ে দেয়, অনেক জায়গায় রেললাইন উঠিয়ে ফেলে, রেল কোয়ার্টারগুলি পুড়িয়ে দেয়। পয়লা জুন ১৯৩১-এ বিদ্রোহীদের পাঁচশো লোকের একটি দল উয়িত্তিয়ুগন (Wittiugan) পুলিস থানা লুঠ করে। নিয়ায়ুঙ্গব্বিন (Nyaungbbin) জেলে আটক বিদ্রোহী বন্দীরা জেল ভেঙে অফিসারদের মেরে বহু অস্ত্র নিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। পুলিস তাদের পিছু নিলে দুপক্ষেই গুলি চলে— কিন্তু তাঁরা জঙ্গলে পালিয়ে যেতে সক্ষম হব।

পানকৌঙ্গ (Pankaung)-এর কাছে ওয়েত্তোতে (Wetto) এক ভীষণ যুদ্ধে বিদ্রোহীদের বাইশ জন মারা যায়— ১৩ জুন ১৯৩১-এ। এই মৃত বিদ্রোহীদের ষোলো জনের মাথা কেটে দীর্ঘ বাঁশের ডগায় ঝুলিয়ে পুলিস গ্রামে গ্রামে শোভা-যাত্রা করে দেখাতে থাকে। পরে ঐ মাথাগুলি প্রোম-এ নিয়ে এসে এক প্রকাশ্য স্থানে রেখে শহরবাসীকে দেখানো হত দিনের পর দিন। যদিও বিদ্রোহী পক্ষের মৃত্যুর হার বাড়ছিল তবু তাঁদের মনোবল অটুট ছিল। ২৭ জুন ১৯৩১-এ পুলিস পাহারায় হাসপাতালে বন্দী একদল আহত বিদ্রোহী পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

যে-সমস্ত গ্রাম বিদ্রোহীদের সাহায্য করছিল বলে সরকারের ধারণা হয়,

সেগুলি পুলিস দিয়ে ঘিরে রাখা হয়। সে-সব গ্রামের বহুলোককে বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করে আটক রাখা হয়। ১৯৩১-এর জুলাই-এর প্রথম থেকে যদিও বিদ্রোহে ভাঁটা পড়ে তবু বিদ্রোহীরা তাদের কার্যকলাপ অব্যাহত রাখে।

১৯৩১ সালের জুলাই মাসের মধ্যভাগে থায়েৎমাইয়ো-এর কাছে অনেকগুলি গ্রাম বিদ্রোহীরা লুঠ করে।

সান্ স্টেট্গুলিতেও এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে ও সৈন্যদলের সঙ্গে বিদ্রোহী-দের যুদ্ধ হতে থাকে। পয়লা জুলাই ১৯৩১-এ নর্দার্ন সান্ স্টেট সৈন্যবাহিনীর (Northen Shan State Battelion) সঙ্গে এক ভীষণ যুদ্ধে বহু বিদ্রোহীর মৃত্যু হয়। বেলুচ সৈন্যদলের সঙ্গে যুদ্ধেও কিছু বিদ্রোহী মারা পড়ে। ৬ জুলাই ১৯৩১-এ বিদ্রোহীরা উত্তর প্রদেশের সান্ নাওনখিয়োগ্যিতে (Nawnkhiogyi) একটি সৈন্যঅবস্থান আক্রমণ ক'রে খুবই ক্ষতি করে।

পয়লা আগস্ট ১৯৩১ সালে ভাইসরয় বর্মা অত্যাবশ্যক ক্ষমতা আইন-৫, (Burma Emergency Powers Ordinance V of 1931) জারী করেন।

অনেক শহরে ও জঙ্গলে বিদ্রোহীরা ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হতে থাকে। এই সময় বিভিন্ন জায়গায় বিদ্রোহীদের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন মারা যান। নেতা পো-হটাইক ও (Po-Htaik) মারা যান।

১৫ অক্টোবর ১৯৩১-এ বিদ্রোহীরা একসঙ্গে এগারোটি বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ চালায়। ২৪ অক্টোবর ১৯৩১ সালে সরকারী বাহিনী একটি বৌদ্ধ মঠ আক্রমণ করলে, সেখানে অবস্থিত বিদ্রোহী বাহিনীর সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে থারা-ওয়াডডি-র বিপ্লবী নায়ক ডো-পহটিন (Do Pohtin) ও প্রোম-এর নেতা বো-টা-ডুন (Bo Ta Dun) মারা যান। এই সময় ভারত থেকে আরো সৈন্য আনানো হয়।

১৯৩২-এর মাঝামাঝি সরকার অবস্থা আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়। বিদ্রোহে ভাঁটা পড়ে আসতে থাকে। অবশেষে বর্মা থেকে ইংরেজ শাসন হঠানোর উদ্দেশ্যে আয়োজিত কৃষক বিদ্রোহের অবসান হয়। নেতা সায়া-চের (Saya Cher) ও ইয়ান-গিৎ-আউঙ্ (Yan Gyt Aung) যুদ্ধে মারা যান। আর মারা যান দুর্ধর্ষ বিপ্লবী নেতা বোয়ে (Bowe)।

কিন্তু কে বর্মার এই মহা বিদ্রোহের মহানায়ক?

এই বিদ্রোহের অনেক নেতাই ছিলেন। কিন্তু সর্বোপরি ছিলেন বর্মার মুকুট-

হীন রাজা বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ ড. সায়া সান্‌ (Dr. Saya San)। তাঁর পিতৃদত্ত নাম সান-শা (San Sha)। উত্তর বার্মার (UpperBurma)-র স্যেদো (Shwedo) জেলার লোক তিনি। তাঁর জীবনের খানিকটা অংশ কেটেছে নিম্নবর্মা ও শ্যামে। এক-এক সময় এক-এক পেশা নিয়েছেন তিনি।

বর্মার রাজনৈতিক সংস্থা— জি. সি. বি. এ. (G. C. B. A.—General Council of Burmas Association)— সেই সময় নরমপন্থীদের দখলে ছিল। উদ্দেশ্য ছিল বর্মায় ব্রিটিশ শাসনভুক্ত থেকে স্বায়ত্ত শাসন (Home Rule) লাভ করা।

১৯২৮ সালে জি. সি. বি. এ.-র বাৎসরিক সম্মেলন হয় মান্দালয়ে। এই সম্মেলনে চরমপন্থীরা ড. সায়া-সান-এর নেতৃত্বে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়ে নিতে সমর্থ হলে নরমপন্থীরা দল ছেড়ে চলে যায়। ড. সায়া-সান জি. সি. বি. এ.-র সাধারণ সম্পাদক হন। তিনি একটি শক্তিশালী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরি করেন। এই সময় থেকে ড. সায়া-সান বর্মা থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করে স্বাধীন হবার চেষ্টা করতে থাকেন। দলের কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন। তিনি থারা-ওয়াডডি-র গভীর জঙ্গলে একটি সর্বোচ্চ বিপ্লবী গুপ্ত ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেন। গোপনে বিপ্লবী বাহিনীর সামরিক শিক্ষাদান ও বিপ্লবের প্রস্তুতি চলতে থাকে খুব দ্রুত। এই বিপ্লবী বাহিনী সারা বর্মায় ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন জঙ্গলে তাঁদের ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা হল। চারি দিকে গোপনে বিপ্লবী গেরিলা বাহিনী গঠিত হল। তাঁরা অস্ত্র জোগাড় করতে থাকলেন। বন্দুক তৈরি করার জন্য তিনি গভীর জঙ্গলে একটি বড়ো কারখানা স্থাপন করেন। সেখানে দেশী বন্দুক, টোটা ও অন্যান্য অস্ত্র তৈরি হতে থাকে প্রচুর পরিমাণে। তাঁদের গুপ্তচর বাহিনীও বেশ সফল ভাবে কাজ করতে থাকে। গ্রামের কৃষক জনসাধারণ ড. সায়া-সানকে তাদের মুক্তির প্রতীক মনে করত।

১৯৩০ সালে সারা ভারত আইন-অমান্য আন্দোলনে তোলপাড় হতে থাকে। বাংলা ও পাঞ্জাবের বিপ্লবীরা তাঁদের বৈপ্লবিক কার্যকলাপ জোরদার করতে থাকেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও অন্যান্য কার্যপলাপ শুরু হল। এই-সব ঘটনার ঢেউ বর্মাতেও এসে লাগে। আরম্ভ হয় সারা বর্মায় বিদ্রোহ ড. সায়া-সান-এর নেতৃত্বে। তাঁর মতো বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, পরিশ্রমী বিপ্লবী

নেতা খুব কমই দেখা গেছে। ড. সায়া সান বর্মায় বিভিন্ন জায়গায়, জঙ্গলে জঙ্গলে বিপ্লবী গুপ্ত ঘাঁটিগুলিতে অস্ত্র, রসদ, বিপ্লবী যোদ্ধা অবিরত পাঠিয়েছেন, নিজে অনেক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন, শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করেছেন; যখন বুঝেছেন যে আর জয়ের আশা নাই, তখন ধরা পড়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তিনি সঙ্গীদের নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন, একবার নয় বেশ কয়েক-বার। উল্কার মতো এক জায়গা থেকে বহুদূরে আর-এক জায়গায় গিয়ে তিনি হানা দিয়েছেন। তাঁর ক্লান্তি ছিল না। এই বিদ্যুৎ গতিসম্পন্ন বিপ্লবী নায়ককে ধরার জন্য ব্রিটিশ সরকার সব রকম চেষ্টা করেও বিফল হয়। তাঁর মাথার উপর দশ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেও কোনো ফল হয় নি। গ্রামে গ্রামে ঘোরার সময় তিনি অনবরত নতুন নতুন বিপ্লবী যোদ্ধা দলে টানতেন। জনসাধারণ তাঁর প্রতি এত শ্রদ্ধাশীল ছিল যে— তাঁর নাম পর্যন্ত কেউ উচ্চারণ করত না— পাছে সরকার তাঁর গতিবিধি সম্বন্ধে কিছু জানতে পারে। তাঁর এক-মাত্র স্বপ্ন ছিল বর্মা থেকে ইংরেজকে বিতাড়িত করা। গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য তিনি এক-এক সময় এক-এক নাম ব্যবহার করেছেন। সরকার হন্যে হয়ে তাঁকে খুঁজতে থাকে। তিনি কোনো সময়েই এক জায়গায় এক দিনের বেশি থাকতেন না। জানতেন সরকার তাঁকে ধরতে পারলে কী করবে।

অবশেষে ২ আগস্ট ১৯৩১-এ হ্‌সুমহ্‌সি (Hsumhsi) প্রদেশের হাসিপাণ্ড (Hasipand)-এ বেলা তিনটার সময় একজনের বিশ্বাসঘাতকতায় পাঁচ জন সঙ্গীসহ থারাওয়াডডি কৃষক-বিদ্রোহের মহান নেতা ড. সায়া-সান গ্রেপ্তার হন। অতি সাধারণ বেশে, অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায়। একটি বন্ধ রেল কামরায় প্রচুর প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় তাঁকে ১৯৩১ সালের ১৪ আগস্ট থারাওয়াডডিতে আনা হয়। ১৫ আগস্ট ১৯৩১-এ তাঁকে বিশেষ আদালতে বিচারের জন্য পাঠানো হয়। আদালতে তাঁর জন্য বিশেষভাবে আসামীর কাঠগড়া তৈরি হয়, যাতে তিনি না পালাতে পারেন। বিভিন্ন অভিযোগে তাঁর বিচার হয়। বিচারের প্রহসনে ৩০ আগস্ট ১৯৩১-এ তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়। বিচারে তিনি কোনো সহায়তা গ্রহণ করেন নি। শুধু বলেছিলেন যে তিনি নির্দোষ।

২৮ নভেম্বর ১৯৩১ শত যুদ্ধের নায়ক এই মহান বিপ্লবী ড. সায়া-সান-এর ফাঁসি হয়।

এই ঘটনার কিছুকাল পর বিদ্রোহ আস্তে আস্তে থেমে আসে।

বিশেষ আদালতে থারাওয়াডডি-বিদ্রোহে অভিযুক্তদের ফাঁসি, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, দ্বীপান্তর ও বিভিন্ন মেয়াদের জেল হয়।

"In connection with the Tharrawaddy Rebellion in Burma, the Home Member Burma Government stated on February 24, 1933, that 274 persons were sentenced to death of whom fifty one had already been executed and the number of persons undergoing Transportation for their taken part in the rebellion was 435."

—K. C. Ghosh, *The Roll of Honour*, p. 458

এই থারাওয়াডডি-বিপ্লবে যাঁদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল, তাঁদের মধ্যে অনেককেই আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠানো হয়। তিন মাস সেলুলার জেলে রাখার পর, তাঁদের বিভিন্ন দ্বীপের "টাপু" তে (জেল ব্যারাকে) স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে জঙ্গল পরিষ্কার ও অন্যান্য কাজে তাঁরা নিযুক্ত হন। তাঁদের সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছুই জানা যায় না। হয় তাঁরা ক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হন, নয়তো কালক্রমে সেখানেই আন্দামানবাসীদের সঙ্গে মিশে যান।

এ কথা উল্লেখ করা দরকার যে 'ভাত্থু' নামে পাঞ্জাবে এক দুর্ধর্ষ অপরাধপ্রবণ যাযাবর উপজাতি ছিল। তাদের সংখ্যা প্রায় ১৫০ জন। এত অপরাধপ্রবণ যে তারা যেখানে যেখানে যেত তাদের পুলিস দিয়ে ঘিরে রাখতে হত। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট শেষ পর্যন্ত ১৯২৬-২৭ সালে এই "ভাত্থু" সম্প্রদায়ের সব লোককে আন্দামানে নির্বাসিত করে। কালক্রমে তারা সেখানকার জনসাধারণের সঙ্গে মিশে যায়।

যদিও এই যাযাবর উপজাতির সঙ্গে বিপ্লব বা বিদ্রোহের কোনো সম্পর্ক ছিল না, তথাপি আন্দামান দণ্ডোপনিবেশের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে তাদের কথা উল্লেখের প্রাসঙ্গিকতা আছে। কারণ প্রায় ৬০ বছর পূর্ব হতেই তারা স্থায়ী বসবাসকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

সেলুলার জেল ও দুটি ঐতিহাসিক অনশন

১৯২৮ সাল থেকে ভারতে আবার রাজনৈতিক চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ভারতকে হেয় ও অপমানিত করার জন্য ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট 'সাইমন কমিশন' বসান। সেই পরিপ্রেক্ষিতে লালা লাজপৎ রায়ের মৃত্যুর (পুলিস-প্রহারই তাঁর মৃত্যুর কারণ) পর পাঞ্জাবে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ বাড়তে থাকে। তার পর ১৯৩০ সালে কংগ্রেসের আইন-অমান্য আন্দোলনকালে হাজার ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যান। সারা ভারতে ইংরেজের জেলখানাগুলি উপচে পড়তে লাগল। বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশে বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা বেড়ে গেল। কিছু বিপ্লবী বিনা বিচারে আটক হলেন। বাংলায় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হল। মাস্টারদার (সূর্য সেন) নেতৃত্বে বীর বিপ্লবীগণ সাত দিন চট্টগ্রাম ইংরেজ শাসনমুক্ত রাখতে সক্ষম হন। বাংলার বহু জায়গায় বিপ্লবীরা আবার মাথা তুলে দাঁড়ালেন। বহু বিপ্লবী গ্রেপ্তার হয়ে ব্রিটিশ জেলে বন্দী হলেন। অনেকের যাবজ্জীবন ও বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হল, বন্দীশিবিরগুলিতে বহু বিপ্লবী বিনাবিচারে আটক হলেন।

গোল টেবিল বৈঠক (Round Table Conference) থেকে বিফল হয়ে ফিরে এসে গান্ধীজী আবার দ্বিতীয় দফার আইন অমান্য আন্দোলন (Civil Disobedi-nce Movement) আরম্ভ করলেন। আবার জেলখানা ভর্তি হতে লাগল।

এমন অবস্থায় সরকার বন্দীদের নিয়ে বিশেষ অসুবিধায় পড়ল। অবশেষে দণ্ডিত বিপ্লবীদের আবার আন্দামান সেলুলার জেলে রাখায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হল।

এই পর্যায়ের রাজনৈতিক বন্দীদের প্রথম দলটি আন্দামান পৌছান ১৮ আগস্ট ১৯৩২ সালে। সংখ্যায় সেদিন তাঁরা ছিলেন তেইশ জন। তাঁরা হলেন— চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার আসামী— গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, লোকনাথ বল ও আরো নয় জন; মেছুয়াবাজার বোমার মামলার আসামী— মুকুল সেন ও নিশাকান্ত রায়চৌধুরী; বরিশাল পুলিস হত্যা মামলার আসামী রমেশ চ্যাটার্জি; সালদা ডাকাতি মামলার বন্দী প্রবোধ রায়; আশাহুল্লা-হত্যা মামলার আসামী

হরিপদ ভট্টাচার্য; চাঁদপুর পুলিস হত্যা মামলার আসামী কালীপদ চক্রবর্তী; ময়মনসিংহ অস্ত্র-মামলার বন্দী প্রবীর গোস্বামী; পুঁটিয়া মেল ডাকাতি মামলার আসামী সুশীল দাসগুপ্ত, কলকাতায় হত্যা মামলার আসামী সুরেশ দাস, কলকাতা অস্ত্র-মামলায় অভিযুক্ত বন্দী মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, ভিলিয়াস হত্যাপ্রচেষ্টা ও পেডী হত্যা মামলার আসামী বিমল দাসগুপ্ত।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে হাতে হাতকড়া ও পায়ে ডাণ্ডা বেড়ি দেওয়া অবস্থায় প্রহরীবেষ্টিত হয়ে পুলিসের আচ্ছাদিত গাড়িতে তাঁদের কলকাতা বন্দরে এনে 'এস. এস. মহারাজা' জাহাজে আন্দামানে পাঠানো হয়।

এই প্রথম বন্দীদলটি সেলুলার জেলের অবস্থা দেখে হতাশ হলেন। যে সামান্য সংখ্যক আন্দামান বন্দী ২য় শ্রেণী (Division-ii) পেয়ে সেখানে গেলেন, তাঁদের অবস্থা একটু ভালো। যেমন তাঁদের আলাদা করে রাখা হত, তাঁদের সেলে হারিকেন লণ্ঠন দেওয়া হত, একটিকরে লোহার খাট, তোষক, বালিশ ও একটি করে জলের কুঁজো দেওয়া হল। আর খাবারের মান সামান্য একটু ভালো ছিল। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দী, যাঁদের সংখ্যাই বেশি, তাঁদের সেলে আলো নেই, বিছানা নেই, পড়বার বই নেই, ওষুধপত্রের বিশেষ ব্যবস্থা নেই; আছে শুধু কঠিন পরিশ্রমের কাজ (অবশ্য এই পর্যায়ে তাঁদের ঘানিতে ঘোরাতে হত না)। এমন অবস্থায় বাঁচা অসম্ভব। প্রথমদিন থেকেই তাঁরা বুঝতে পারলেন যদি অবস্থার উন্নতি না করা যায় তবে এই অবস্থা থেকে তাঁদের কাউকে আর বেঁচে দেশে ফিরে যেতে হবে না। কিন্তু কী করা যায়? জেলখানায় বন্দীর একটি মাত্র অস্ত্রই আছে। আর তা হল অনশন করা। কিন্তু এখনই এই অল্প সংখ্যক বন্দী (মাত্র তেইশ জন) অনশন করলে সরকারের উপরে বিশেষ চাপও পড়বে না আর দেশেও তাঁদের জন্য আন্দোলন জোরদার হবে না। এটা বুঝতে পেরে তাঁরা অপেক্ষা করতে লাগলেন, বন্দী সংখ্যা বৃদ্ধির আশায় ক্রমে ক্রমে বাংলা ও ভারতের অন্য সব প্রদেশ থেকে অনেক রাজনৈতিক বন্দী আন্দামান সেলুলার জেলে এসে পৌঁছলেন। এখন তাঁরা সংখ্যায় অনেক বেশি। সেলুলার জেলে তাঁদের থাকার ব্যবস্থার উন্নতি ও অন্যান্য দাবির জন্য বন্দীগণ— প্রায় একশো জন আমরণ অনশন শুরু করলেন ১২ মে ১৯৩৩ এই ঐতিহাসিক অনশনে, জীবনমৃত্যুর সংগ্রামে অংশ-গ্রহণকারী একজন বিপ্লবী বন্দীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা :

"...প্রতিদিন খাবার খাওয়ার সময় মনে হতো বন্দীরা বিষ পান করছে।

অনেকেরই রক্ত আমাশা ও জর হতে শুরু করল। এই অবস্থায় কারো পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব। দিনের পর দিন বন্দীদের অবস্থা চরমে উঠতে শুরু করল।...

"দিনের বেলায় পাঁচটার সময় আলোহীন সেলে বন্ধ। ভোর পাঁচটায় খোলা। পত্রপত্রিকা বই বা লেখাপড়ায় কোন ব্যবস্থা নেই। সমস্ত দিন কাজ। আর রাত্রে দুর্গন্ধময় অন্ধকার কুঠুরিতে বারো ঘণ্টা বন্ধ।

"রাজনৈতিক বন্দীদের বুঝতে এতটুকু বাকী রইলো না যে, তাঁদের তিলে তিলে হত্যা করা হচ্ছে। এই অবস্থায় বাঁচা অসম্ভব। মানুষের মত মরেই বাঁচার চেষ্টা করতে হবে— একমাত্র এই পথই বাঁচার পথ।

"করিডরের মধ্যে কাজের সময় বন্ধুদের সাথে দেখা হতো এবং কিছু কথাবার্তা বলে অনশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

বন্ধুরা পরামর্শ করে আন্দামান নিকোবরের চিফ কমিশনারের কাছে চরমপত্র হিসাবে দরখাস্ত পাঠালো। জেল কোড অর্থাৎ জেল আইনের ভিতর সীমাবদ্ধ রেখেই তিনটি দাবি করা হলো। এই সুযোগগুলো ভারতীয় জেলের বন্দীরাও পেয়ে থাকে—(১) ভাল খাদ্য, (২) আলো, (৩) পত্রিকা ও লেখাপড়ায় সুযোগ। চিফ কমিশনারের উত্তর এল। লাল কালিতে বড় হরফে লেখা 'No'—বন্দীরা কিছু পাবে না।

"বিপ্লবী বন্দীরা বেপরোয়া হয়ে উঠল। চরম সিদ্ধান্ত নিল, ১৯৩৩ সালের মে মাসের মধ্যে বন্দীদের দাবী না মানলে তিনদিন পরপর ব্যাচ করে বন্দীরা আমরণ অনশন শুরু করবে। এই সিদ্ধান্ত চিফ কমিশনারকে জানিয়ে দেওয়া হলো। সাত দিনের ভিতর রাজনৈতিক বন্দীরা একে একে অনশনে যোগ দিল।

"চিফ কমিশনার দরখাস্তের উপর জানিয়ে দিলেন—"I shall not budge an each"—আমি সামান্যতম দাবীও মানব না। অধিকাংশ বড় অফিসার ছিল বিলেত থেকে আসা সাহেব। এর মাঝে একমাত্র জেলার একটু উদার ছিল। জানালেন চীফ কমিশনার তাঁকে বলেছে—'Let their dead body be floating on the ocean'—'বন্দীদের মৃতদেহ সমুদ্রে ভাসতে দাও'।

"বাঙ্গলাদেশ থেকে টাকা পয়সা যা কিছু গোপনে সংগ্রহ করে আনা হয়েছিল তা দিয়ে ভারতে সংবাদ পাঠান শুরু হলো। তখন বাঙ্গলাদেশে এগুারসনী শ্বেত সন্ত্রাসের যুগ। কংগ্রেসী আন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলনে তখন ভাঁটার টান

পড়েছে। তা সত্ত্বেও মানুষ হিসাবে বাঁচতে হলে তখন অনশন করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না।

"আমরণ অনশন শুরু হলো। প্রথম দিকে সকালে ও বিকালে সেলগুলো খুলে দিতো। স্নান করার সময় সেলের বাইরে যেতে দিতো। অনশনের প্রথম দিনই জামা কাপড় এমন কি ডিভিশন টু'র টুথব্রাস ও টুথপাউডার সব সুযোগ সুবিধা কেড়ে নেওয়া হলো। সকলকেই জাঙ্গিয়া ও কোর্তা পরিয়ে দেওয়া হলো।...

"পাঁচ ছয় দিন পরেই শরীরের চরম দুর্বলতা দেখা দিতে শুরু করল। ছ' দিনের দিন বিকাল হতেই জোর করে নাকের ভিতর পাইপ ঢুকিয়ে খাওয়াবার চেষ্টা শুরু হলো। রাজনৈতিক বন্দীরা কিছুতে খাবেন না কিন্তু সরকারের নির্দেশে জোর করে খাবার পেটে ঢুকিয়ে বন্দীদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

"সে এক পৈশাচিক কাণ্ড। যমদূতের মত পাঠান, পাঞ্জাব ও বিভিন্ন প্রদেশের কয়েক জোয়ান কয়েদী কালো পোষাক পরে প্রত্যেক সেলের সম্মুখে এসে উপস্থিত। তখনও বাঙলা, রেঙ্গুন আর মাদ্রাজ থেকে ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডার এসে পৌঁছায় নি। জেলের ছোট ডাক্তার সঙ্গত রায় এবং কম্পাউণ্ডার সকর-কান্দী একমাত্র সম্বল। শোনা যায় ডাক্তার সঙ্গত রায় আন্দামানের এক কয়েদীর ছেলে। ম্যাট্রিক পাস করার পর সরকারই তাকে কোন রকমে সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরি দিয়ে দিয়েছে। কম্পাউণ্ডার সকরকান্দী এই জেলেই যাবজ্জীবন সাজা খেটেছে এবং বন্দী অবস্থায় হাসপাতালে কাজ ক'রে কম্পাউণ্ডারী শিখেছে মুক্তির পর সে সেলুলার জেল হাসপাতালে কম্পাউণ্ডার। এই ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডার জোর জবরদস্তি করে রাজবন্দীদের নাকে ছিদ্রনালীর ভিতর দিয়ে পাইপ ঢুকিয়ে দিয়ে দুধ খাওয়াবার ব্যবস্থা করল। যমদূত জোয়ানরা বন্দীদের চিৎ করে হাত, পা, মাথা চেপে বসে থাকে, খাটের সঙ্গে হাত পা বেঁধে দেওয়া হয়; তখন ডাক্তার নাকে নল ঢুকিয়ে দুধ পেটে দেবার ব্যবস্থা করে। খাওয়ানো শেষ হলেই দুর্বল, পরিশ্রান্ত বন্দীকে রেখে চলে যাওয়া হয়। এ-এক পৈশাচিক ব্যবস্থা।· সন্ধ্যার সময় প্রথমে সেল হতে সেলে কিছু কানাঘুষা, তার পর সেল থেকে সেলে চিৎকার করে সংবাদ আদান-প্রদান চলল। তিন জনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে—(১) মহাবীর সিং (লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা), (২) মোহিত মৈত্র (অস্ত্র-আইন মামলা), (৩) মোহন কৃষ্ণ নমোদাস (ময়মনসিংহ ডাকাতি মামলা)। তিন জনের দুধ ফুসফুসে গিয়েছে। এর অর্থ যে মৃত্যু তা বন্দীদের

জানা আছে। সেলে আবদ্ধ বন্দীদের মনের অবস্থা কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। ছ-দিনের দিন। জোর করে খাওয়ানোর ঠিক প্রথম দিনেই মহাবীরের মৃত্যু হয়। কিন্তু মৃত্যুর খবর বন্দীরা জানে না।

"পনেরো দিনের দিন মারা গেল মোহন। সতেরো দিনের দিন সকালে মারা গেছে মোহিত। হাসপাতালের কয়েদী, ফালতুরা এবং একজন সিপাহী গোপনে এই সংবাদ দিয়েছে। ওরা আরও বলেছে, মৃতদেহগুলোকে পাথর দিয়ে বেঁধে সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। সতেরো দিনের দিন এই সংবাদ বন্দীদের নিকট পৌঁছায়, সাথে সাথেই বন্দীরা সব ক্ষোভে আগুন হয়ে উঠল। চিৎকার শুরু হয়ে গেলো : কত মৃত্যু চায় পশু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ— তা দেখে নিতে হবে। শ্লোগান শুরু হবার সাথে সাথে বড় জমাদার ও সিপাহী কেউ বন্দীর নিকট আসে না। স্নান করার জন্য করিডরে আনা হয়েছিল বন্দীদের, বন্দীরা ঘোষণা করল— সঠিক সংবাদ পাওয়ার পুর্বে সেলে বন্ধ হব না ; লক-আপ রিফিউজ করা হলো। জেল কোডে একে বলে জেল বিদ্রোহ (Jail Mutiny)। খবর চাই সঠিক খবর— মহাবীর, মোহন, মোহিত জিন্দাবাদ,— ইনক্লাব জিন্দাবাদ,— স্বাধীন ভারত কি জয়। বিরাট ও বলিষ্ঠ চেহারার পাঠান, পাঞ্জাবী বাঙালী, বালুচ বাইরে থেকে সংগ্রহ করে আনা হয়েছে, রেগুলেশন-লাঠি হাতে চার পাঁচজন করে প্রত্যেক সেলের নিকট এনে দাঁড় করান হয়েছে।

"হুকুম হলো—যাও সেলে যাও। বন্দীদের দৃঢ় জবাব : না যাবো না,— সংবাদ,— সঠিক সংবাদ চাই। বীর বন্দীরা ধরে নিয়েছে এই তাদের শেষ দিন, শেষ মুহূর্ত, রাত্রি বাড়তে লাগল। বন্দীরা এতটুকু বিচলিত নয়, রাত দশটায় জেলার সাহেব এলেন। জেলার সাহেব নারায়ণদা ও নিরঞ্জনদাকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে বললে— 'দুঃখের বিষয় মোহন, মোহিত মহাবীর তিন জনই মারা গেছে।'

"সন্দেহ সত্যি বলে প্রমাণিত হল। ওয়ার্ড হতে এক নম্বর ওয়ার্ডের সেলের দোতলায় সকলকে নিয়ে যাওয়া হল। বন্দীদের মুখে কোন কথা নেই। নীরব প্রতিজ্ঞার মাঝে শুধু অশ্রু ঝরছে। এর পর হতে অনশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর সেল খোলে নি। চব্বিশ ঘণ্টা সেল বন্ধ। আবদ্ধ অবস্থায় সেল হতে সেলে চিৎকার করে জানিয়ে দেওয়া হলো—বেশি দিন টিকে থাকতে হবে।...

"দিন এগিয়ে চলল। কারাগারে অনশন এক কষ্টদায়ক সংগ্রাম। রাত্রে ঘুম নেই। কেবল খাবারের স্বপ্ন। খাবার না পেয়ে পেট, মাংস ও হাড় চিবিয়ে

খাচ্ছে। এক এক করে চল্লিশ দিন হয়ে গেল। সবাই অসুস্থ, সবাই শয্যা নিয়েছে, একদম দুর্বল হয়ে পড়েছে। সকলেই মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

"চল্লিশ দিনের দিন এলেন কর্নেল বেকার, পাঞ্জাবের জেলসমূহের ইনস্‌পেক্টর জেনারেল। অনশন বিশেষজ্ঞ বলে সরকার পাঠিয়েছে। দাবী তিনটি যথা—আলো, ভালখাদ্য আর পত্র পত্রিকা। এই তিনটি দাবী পূর্ণ না হলে কোন কথা নেই। বিহারের শের যোগেন স্থকুল বেকার সাহেবকে বলল, তিনটি দাবী—'শালা দেগা কি নেহি, ইয়ে বাতাও।'

"ইতিমধ্যে কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া গেল, শ্বেত সন্ত্রাসের মাঝেও বাঙলা-দেশে কিছু কিছু আন্দোলন শুরু হয়েছে। পত্র পত্রিকার চাপে গবর্নমেণ্ট বাধ্য হয়ে বন্দীদের মৃত্যু-সংবাদ স্বীকার করেছে। অসুখে মরেছে বলে গবর্নমেণ্ট ঘোষণা করেছে। তা সত্ত্বেও ছাত্ররা কিছু কিছু আন্দোলন শুরু করেছে।

"শোনা গেল ভারত থেকে অসংখ্য টেলিগ্রাম এসেছে—রবীন্দ্রনাথ বন্দীদের টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন: 'বাংলাদেশ বাংলার ফুলগুলোকে শুকিয়ে যেতে দিতে পারে না। অনুরোধ অনশন ভঙ্গ কর।' ঝুনো আমলা বেকার সাহেবের কথা হলো, 'তোমরা বিনাশর্তে অনশন ভঙ্গ কর। তোমাদের দাবী গবর্নমেণ্ট বিবেচনা করবেন।'

"বন্দীদের দাবী হল, সর্ব প্রথম বন্দীদের এক সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ দিতে হবে। চীফ কমিশনার এই দাবী মানতে রাজী নয়।

"বর্বর বেকার সাহেব মাথা নত করার জন্য খেলা শুরু করল। তেতাল্লিশ দিন তখন পার হয়ে গেছে। সেলে জল রাখার কলসীর ভিতর দুধ রেখে দেওয়া হলো। জলের তৃষ্ণায় বন্দীরা দুধ খেতে বাধ্য হবে। অনেক বন্দী কলসী ভেঙ্গে প্রস্রাব করে রাখল। এরপর বাটিতে দুধ রাখত এবং সকালে নিয়ে যেতো।

"জলের অভাবে সকল বন্দী অসম্ভব দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল। জল খাওয়া অনশনের নিয়মের ভিতরই রয়েছে। একটু জল চাই— জল। চারিদিক সমুদ্রের জল। সেলে বসে যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় সে দিকেই জলের সমুদ্র। অঝোরে ঝরছে বৃষ্টির জল। কিন্তু সেলে এক ফোঁটাও জল নেই। ইংরেজ কবির সেই স্মরণীয় উক্তি— 'water water every where, not a drop to drink'. মৃত্যুর পূর্বাবস্থা সকলের এসেছে। মৃত্যুর বিভীষিকা চারদিক হতে সকলকে গ্রাস করতে উদ্যত।

"নিঝুম গভীর রাত্রি। নিরন্ধ্র অন্ধকার। জিহ্বা শুকিয়ে গেছে। স্বপ্নে জল খাচ্ছে অনশন বন্দীরা। চারি দিক থেকে মৃত্যুর শীতল স্পর্শ ঘনিয়ে এসেছে। হঠাৎ চিৎকার উঠল, 'নিরঞ্জনদা সেলে নেই।' সব বন্দী জেগে উঠল। 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' রণধ্বনিতে সেলুলার জেল কাঁপতে লাগল। ভীষণ গোলমাল। বন্দীদের দাবী— "জেলারকে বোলাও, আমরা জানতে চাই— কোথায় নিরঞ্জনদা।" রাত দুটোয় জেলার সাহেব এলো। নারায়ণদাকে বললো— 'Do not worry' —চিন্তা করো না। তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। কোলাপস্ হয়ে যাচ্ছিল।' অনেকের অবস্থাই সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। বুঝতে কষ্ট হয় না সকলেই মৃত্যুর দ্বারে।

"জলবন্ধের তৃতীয় দিনে প্রধান মেডিকেল অফিসার (C. M. O.) এলো। একটানা ৪৩ দিন অনশনের পর জলের অভাবে ক্ষুধায় জ্বালার বন্দীরা একদম মৃত্যুর দ্বারে এসে গেছে। ক্রোধ, ঘৃণা ও মরুভূমির সীমাহীন তৃষ্ণা সকলকে আরো দুঃসাহসিক করে তুলেছে।

কালীদার (কালী চক্রবর্তী, চট্টগ্রাম) সেলের নিকট মেডিকেল অফিসার আসার সাথে সাথে চিৎকার করে উঠল— "জল দেবে কিনা শুনতে চাই।" অফিসার কোন কথা না বলে পিশাচের মত ঠোঁট দিয়ে ফুঁক করে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। কালীদা দুধের পাত্রটা তুলে তার দিকে ছুঁড়ে মারে। জামা প্যাণ্টে দুধ ছড়িয়ে যায়। সাহেব ক্রোধান্বিত হয়ে হুকুম দেয়— "অবিলম্বে হাতকড়া লাগাও।" যমদূত সাথেই ছিল। হাতকড়া লাগাবার সাথে সাথে চিৎ করে ফেলে— জোর করে খাওয়াবার ব্যবস্থা করা হল। পাইপ দিয়ে জোর করে পেটে ঢুকিয়ে দিল— দুধ নয়, জোলাপ (ক্যাষ্টর অয়েল)···

"জলবিহীন চতুর্থ দিনে দেহের ওজন নিতে এলো জেল হাসপাতালের লোকেরা। অনশনব্রতীদের দেহের ওজন অস্বাভাবিক ভাবে কমে গেছে। জেল কর্তৃপক্ষ এবার একটু চিন্তিত হলো।

"হুকুম হলো, বন্দীদের দু আউন্স করে খাবার জল দাও। মৃত্যুভয়হীন বিপ্লবীদের মাথা নত করতে না পেরে অনশনভঙ্গকারী বিশেষজ্ঞ বেকার সাহেবের কাজ শেষ হলো। সে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করলো। বেকার সাহেবের প্রস্থানের সাথে সাথে হুকুম হলো, অনশনব্রতীদের ইচ্ছামত জল খেতে দাও।

"আবার নতুন অবস্থার সম্মুখীন হলো রাজনৈতিক বন্দীরা। পঁয়তাল্লিশ দিন

অনশন হয়ে গেছে। জেলার সাহেব এসে নারায়ণদার কানে কানে বলল, "চিন্তা করো না। চীফ কমিশনার বলেছে, সে নিজেই মীমাংসা করবে, সেই মীমাংসার সমস্ত প্রশংসা পেতে চায়। বেকার সাহেবকে এই প্রশংসার সুযোগ দেবে না। ভারত ও বাঙ্গলা গবর্নমেণ্ট চাইছে— অবিলম্বে মীমাংসা। তোমরা অনশন ভঙ্গ কর, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তোমরা সব পাবে।"

"রাত্রিতে মেডিকেল অফিসার এলো— বিজ্ঞ কমিশনারের দূত হিসাবে বলল. তোমরা যা চেয়েছ তার চেয়েও বেশী পাবে। তবে একটা কাজ করতে হবে— আগে অনশন তুলে নিতে হবে। এইটাই ভারত সরকার চায়।

"পরের দিন আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। একজন একজন করে বন্দীদের স্ট্রেচারে করে সেল থেকে আনা হলো। যে-সমস্ত বন্দীকে অনশনের সময় বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল তাঁদের নিয়ে আসা হল।

"জেলার, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, এম, ও, এ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার— চার সাহেব। বড় বড় অফিসার সকলের প্রতিশ্রুতি,— তোমরা সব পাবে। অনশন ভঙ্গের জন্য সরবত তৈরী হচ্ছে, অনেকের হাতে গ্লাস দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ এ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার চিৎকার করে উঠল, "মনে রেখো এটা বিনা সর্তে আত্মসমর্পণ— (Remember it is unconditional surrender)।" আবার নতুন অবস্থা। পরে বন্দীরা সরবতের গ্লাস ছুঁড়ে ফেলে দিল। এম, ও, এ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনারকে টেনে নিয়ে গেলো। পরে বন্দীদের বললো— 'তোমরা চিন্তা করো না, সব পাবে। জেলার ও জেল সুপারিন্‌টেনডেণ্ট তাতে সমর্থন জানাল।...

"ইতিমধ্যে বাংলার এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে শ্বেত-সন্ত্রাসের মাঝেও বন্দীদের সমর্থনে কিছুটা গণ-আন্দোলন, বিভিন্ন মহল থেকে বাংলা ও ভারত গবর্নমেন্টের উপর চাপ, তিন তিন জন বীর দেশপ্রেমিকের অনশনে জীবনাবসান, এবং অনশনব্রতীদের দৃঢ়তা শেষ পর্যন্ত অনশনে জয় এনে দিল।

"তিন বন্ধুকে হারিয়ে আন্দামান রাজনৈতিক বন্দীরা এই অনশনের পর হতেই একটি একটি করে সুযোগ পেতে শুরু করল।"— নলিনী দাস, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে দ্বীপান্তরের বন্দী' ও 'মুক্তিতীর্থ আন্দামান'— মার্চ-এপ্রিল ১৯৭২ সংখ্যা।

২৬ জুন ১৯৩৩ ছেচল্লিশ দিনের দিন এই জীবন মৃত্যুর অনশন সংগ্রাম শেষ হল।

আন্দামান সেলুলার জেলের বন্দীজীবনের দৈনন্দিন ক্লেশ, ক্লান্তির কিছুটা

সুরাহা হল এবার। বন্দীরা পেলেন এবার খুব হাল্কা ধরনের কাজ, প্রতি সেলে আলো। ছোটো নিচু কাঠের চৌকি, বিছানার চাদর, বালিশ দেওয়া হল। খাদ্যবস্তুর উন্নতি হল। বন্দীদের রান্নাঘর পরিচালনা করতে দেওয়া হল। ২য় শ্রেণী এবং ৩য় শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীদের রান্না একসঙ্গেই করা শুরু হল। বন্দীরা জেলের মধ্যে বিভিন্ন ইয়ার্ডে যেতে পারায় মেলামেশা করার সুযোগ পেলেন। সকলেই তাঁদের দরকারে জেল অফিসে যেতে পারতেন। বন্দীদের খেলাধুলার সুযোগ দেওয়া হল। ক্যারমবোর্ড, তাস, দাবা, টেবিল-টেনিস, ফুটবল, ভলিবল খেলার সুযোগ দেওয়া হল। গান, বাজনা এমন-কি থিয়েটার প্রভৃতি করার সুযোগও দেওয়া হল তাঁদের। বই, খবরের কাগজ, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি বন্দীরা নিজেদের খরচে কিনতে পারতেন—সরকারও দিত। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে পড়াশুনা, আলাপ-আলোচনা ও বিতর্ক সভারও ব্যবস্থা হল। জেল-কর্তৃপক্ষ বন্দীদের প্রতি তাদের আচরণ পাল্টে ফেলে উদার ভাব ধারণ করল। ক্রমে ক্রমে রাত্রে সেলে লক-আপ-এর সময় পিছিয়ে গেল। বিভিন্ন কারণে ও স্বাস্থ্যের কারণে অনেককে রাত্রে বন্ধ ইয়ার্ডে চৌকি নিয়ে শুতে দেওয়া হল। সেলুলার জেলে মোটামুটি একটা সহনীয় জেল-ব্যবস্থা চালু হল।

"বন্দীরা এবার নিজেদের তৈরি করতে আরম্ভ করলেন। শুরু করলেন কঠিন পড়াশুনা, বিভিন্ন বিষয়ে জানা ও জানতে চাওয়ার আগ্রহে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন তাঁরা। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা-যাঁরা ভালো জানেন তাঁরা অন্যকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। সারা দিনই কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলে নানা জিজ্ঞাসা— জবাব। শত শত বন্দীর ত্রস্ত পদক্ষেপে, উন্মুখ আকাঙ্ক্ষায়, অফুরন্ত জিজ্ঞাসায় বন্দী নিবাস-এর এদিক ওদিক— সকাল সন্ধ্যায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।"— "মহাবিদ্যালয়", 'মুক্তিতীর্থ আন্দামান'— এপ্রিল ১৯৭২ সংখ্যা।

আন্দামান সেলুলার জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের দিন এইভাবে কাটতে লাগল। ধীরে ধীরে ১৯৩৬ সাল শেষ হয়ে গেল। ১৯৩৭ সালের প্রায় মাঝামাঝি এসে গেল। সেই সময় পর্যন্ত আন্দামান সেলুলার জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের সর্বোচ্চ সংখ্যা ৩৮১ জনে ওঠে। অবশ্য এর মধ্যে ১৬৫ জন তাঁদের দণ্ড শেষ হওয়ায় দেশে ফিরে আসেন। সর্বমোট— ৩৩৯ জন বন্দী ছিলেন বাংলার; বিহারের ১৯ জন, উত্তর প্রদেশের ১১ জন, আসামের ৫ জন, পাঞ্জাবের ৩ জন, দিল্লীর ২ জন, মাদ্রাজের ২ জন।

আন্দামান সেলুলার জেলে প্রথম পর্যায় (১৯০৯-১৯২১) ও দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৯৩২-১৯৩৮ সাল)— উভয় পর্যায়েই বন্দী ছিলেন দুজন।— তাঁরা হলেন— নিখিলরঞ্জন গুহরায় ও সর্দার গুরমুখ সিং।

সর্দার গুরমুখ সিং সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে। তিনি ১৯৩৬ সালের শেষ দিকে গ্রেপ্তার হয়ে আগের অবশিষ্ট দণ্ড ভোগ করার জন্য সেলুলার জেলে প্রেরিত হন। সর্দার গুরমুখ সিং-এর বিপুল অভিজ্ঞতা ও বিশেষ বৈপ্লবিক ঐতিহ্য তাঁকে সেলুলার জেলের সকল রাজনৈতিক বন্দীরাই শ্রদ্ধাভাজন করে তোলে। ১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি তিনি সকলের কাছেই একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখেন। প্রস্তাবটি এই রকম— ১৯৩৫ সালের নতুন শাসন সংস্কার আইন অনুসারে ভারতের প্রাদেশিক বিধানসভাগুলির নির্বাচন হয়েছে, তাতে কংগ্রেস সাতটি রাজ্যের বিধান সভায় জয়ী হয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করেছে। এই সুযোগের সুবিধা যদি তাঁরা এখনই না নিতে পারেন তবে আর বন্দীরা দেশে ফিরতে পারবে না। কাজেই মুক্তির দাবিতে এখনই অনশন আরম্ভ করা উচিত। তাতে যে-সমস্ত রাজ্য কংগ্রেস মন্ত্রীসভা আছে সেখানে তাঁদের সমর্থন পাওয়া যাবে প্রচুর— এমন-কি সে-সব রাজ্যে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে, সে-সব রাজ্যের মন্ত্রীসভাও জনসাধারণের দাবি ও আন্দোলনকে উপেক্ষা করতে পারবে না। কাজেই এই সুবর্ণ সুযোগ উপেক্ষা না করে মুক্তির দাবিতে বন্দীদের অবিলম্বে অনশন আরম্ভ করাই শ্রেয়।

প্রস্তাবটি নিয়ে সেলুলার জেলের সমস্ত রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী ও ব্যক্তির মধ্যে আলোচনা চলতে থাকে। সর্দার গুরমুখ সিং-এর যুক্তিগুলি খুবই জোরালো। অবশেষে অনেক আলাপ-আলোচনা করে, চারি দিক অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে সকলেই তখনই অনশন আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

দেশের বিভিন্ন জেলে, বিশেষ করে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে চিকিৎসার জন্য আন্দামান সেলুলার জেল থেকে প্রেরিত, জেলের মেয়াদ শেষে মুক্ত হবার জন্য দেশে প্রেরিত বন্দীদের মারফত ও আরো বিভিন্ন রকম উপায়ে বন্দীরা তাঁদের আসন্ন অনশনের সিদ্ধান্ত দেশের কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে ও খবরের কাগজে জানিয়ে দেন।

ভারত সরকারের কাছে স্মারকলিপি পাঠানো হল তিনটি মাত্র দাবি দিয়ে— (১) অবিলম্বে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর (দণ্ডিত ও বিনাবিচারে আটক) মুক্তি,

(২) আন্দামান সেলুলার জেলের বন্দীদের মুক্তি সাপেক্ষে অবিলম্বে দেশের নিজ নিজ প্রদেশে ফিরিয়ে নেওয়া (Repatriation) ও (৩) অবিলম্বে সমস্ত দণ্ডপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দীদের শ্রেণীভুক্ত করা। তাতে উল্লেখ থাকল এই দাবিগুলি পূরণ না হলে আন্দামান সেলুলার জেলের রাজনৈতিক বন্দীগণ আমরণ অনশন করবেন।

অনশন আরম্ভ হবার পনেরো দিন আগে এই নোটিশ দেওয়া হয় ভারত সরকারকে। সরকারের নেতিবাচক উত্তর এল। অতঃপর অনশন আরম্ভ হবার চব্বিশ ঘণ্টা আগে চীফ কমিশনারকে উল্লিখিত মর্মে নোটিশ দেওয়া হল।

ইতিমধ্যে সেলুলার জেলের সমস্ত রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের নিয়ে অনশন পরিচালনা করার জন্য ও খবরাখবর দেওয়ার-নেওয়া জন্য একটি ক্ষুদ্র কমিটি গঠিত হল। সমস্ত বন্দীদের নিয়ে অনশনের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে সভা হল; দেশের জেলের ও সেলুলার জেলের পূর্বেকার দীর্ঘ অনশনে যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা সকলকে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করলেন— দীর্ঘ দিন অনশনে টিকে থাকায়, জোর করে খাওয়ানোতে বাধা দেবার কৌশল প্রভৃতি বুঝিয়ে বললেন। প্রাণহানির আশঙ্কা কৌশল করে যথাসম্ভব এড়ানো যায় তার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হল।

শুরু হল আন্দামান সেলুলার জেলের দ্বিতীয় পর্যায়ের ঐতিহাসিক আমরণ অনশন। মোট ২১৪ জন বন্দীর মধ্যে ১৮৩ জন বন্দী আমরণ অনশন আরম্ভ করলেন তাঁদের পূর্বে উল্লেখিত দাবিগুলি আদায়ের জন্য ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসের চতুর্থ সপ্তাহে।

অনশনব্রতী এই বন্দীদের সেলুলার জেলের দুই নম্বর ও তিন নম্বর ওয়ার্ডের দোতলা ও তেতলায় রাখা হল। যাঁরা অনশন করেন নি তাঁদের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে রাখা হল।

অনশন চলতে লাগল। সাত দিন কেটে যাবার পর অনেকেই দুর্বল হয়ে পড়লেন। ডাক্তারী পরীক্ষায় যাঁরা খুবই দুর্বল তাঁদের জেলের কয়েদী দিয়ে সেলের মধ্যে চেপে ধরে জোর করে ডাক্তার খানিকটা করে দুধ খাইয়ে দিয়ে চলে গেলেন। ডাক্তারী নির্দেশে বন্দীদের সেলে না রেখে সেলের সামনের ইয়ার্ডে রাখা হয়।

দিন-দশেকের মধ্যে ভারত গবর্নমেণ্ট সেনা বিভাগের প্রাক্তন কয়েকজন ডাক্তার বেশির ভাগই পাঞ্জাবী, গুঁড়া দুধ, জোর করে খাওয়াবার নল প্রভৃতি

আন্দামানে সেলুলার জেলে পাঠায়। সেই-সব ডাক্তার খুবই ভদ্র। পরিবর্তিত পরিস্থিতির জন্য জেল-কর্তৃপক্ষ ও ডাক্তার প্রভৃতি সকলেই অনশনব্রতীদের সঙ্গে খুবই ভালো ব্যবহার করতে থাকে। ফলে এই পর্যায়ে অনশনে যদিও সকলের অবস্থা খারাপ হয়েছিল তবুও একটিও মৃত্যু ঘটে নি।

অনশন আরম্ভ হবার দুই-তিন দিনের মধ্যেই সারা ভারতের বেশির ভাগ খবরের কাগজে এ খবর প্রকাশিত হয়। পনেরো দিনের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন বন্দী শিবিরে ও জেলখানায় বিনা বিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দীগণ ও দণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দীগণ আন্দামান বন্দীদের অনশনের সমর্থনে সহানুভূতিসূচক অনশন শুরু করেন, সারাদেশে ছাত্র যুবকরা মিছিল এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন আন্দামান বন্দীদের মুক্তির দাবিতে। কংগ্রেস এ ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে ওঠে। দেশ জুড়ে মিটিং, মিছিল চলতে থাকে। বাংলার আন্দোলন তুমুল আকার ধারণ করে। কলকাতা ও মফঃস্বল শহরে শহরে জনসভায় মিছিলে আন্দামান বন্দীদের মুক্তির দাবি উঠতে থাকে। খবরের কাগজগুলিও আন্দামান বন্দীদের মুক্তির জন্য জোর প্রচার করতে থাকে।

দিন কেটে যায়, অনশন চলতে থাকে। "দিনগুলি আগের তুলনায় যেন তাড়াতাড়ি কেটে যায়। কিন্তু শরীর যে এক-একসময় বিদ্রোহ করতে চায়। ততদিনে সকলকেই জোর করে খাওয়ানোর পালা শুরু হয়ে গেছে। সকাল দশটা থেকে বেলা একটার মধ্যে ডাক্তাররা এসে নলের সাহায্যে পাকস্থলীতে কয়েক আউন্স দুধ ঢেলে দিয়ে যায়। ক্ষুধার্ত শরীর অল্পক্ষণের মধ্যেই তা শুষে নেয়। তার পর চলে দেহের সেই জৈব আকুতি। সন্ধ্যার সময় পেটের ভিতরটা এক-এক দিন মোচড় দিয়ে ওঠে। কারো কারো "হাঙ্গার পেইন" ওঠে— ক্ষুধার যন্ত্রণা। যে নেহাৎ আক্ষরিক নয়, কাব্যিকও নয়। শরীর যন্ত্রের অনিবার্য প্রক্রিয়া সে কথা মর্মে মর্মে অনুভব করি। তবু তো প্রথম বারের অনশনের তুলনায় অনেক ভালো আছি।" —সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, 'মৌন মুখর সেলুলার জেল', পৃ. ৮৬

রবীন্দ্রনাথ, জওহরলাল নেহরু সহ সমস্ত কংগ্রেস প্রধান মন্ত্রীরা, দেশের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, তখনকার বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক, মুজফ্‌ফর আহম্মদ, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, বঙ্কিম মুখার্জি এম. এল. এ., সকলেই আন্দামান-বন্দীদের অনশন ভঙ্গ করার অনুরোধ করে টেলিগ্রাম করেন, বন্দীদের কাছে। ভারতের কয়েকজন সর্বোচ্চ বিপ্লবীনেতাও যাঁদের তিন আইনে আটকে রাখা হয়েছিল, অনশন ভঙ্গ

করার জন্য আন্দামান বন্দীদের টেলিগ্রাম করেন। গান্ধীজী টেলিগ্রাম করে বলেন — "I shall try to secure full relief for you।" সমস্ত অনশনব্রতী— জেল-কর্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারে দুই নম্বর ওয়ার্ডের রান্নাঘরের বড়ো ঘরটিতে একত্রিত হলেন ইতিকর্তব্য স্থির করার জন্য। মহাত্মা গান্ধীর বার্তার কী উত্তর দেওয়া হবে। অনশন ভঙ্গ করা হবে কিনা— এই নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হল। অবশেষে বেশির ভাগ বন্দীর বিবেচনায় অনশন ভঙ্গ করাই সাব্যস্ত হল। অল্পকয়েকজন বন্দীর মতে গান্ধীজীর 'Relief' কথাটির অর্থে 'Release' বোঝায় কিনা তা স্পষ্ট করে জানবার জন্য গান্ধীজীর কাছে টেলিগ্রাম পাঠানো হল। স্থির হল: সবাই অনশন ভঙ্গ করবে। আর গান্ধীজীর দ্বিতীয় বার্তা না আসা পর্যন্ত— সর্দার গুরমুখ সিং, হাজরা সিং, রাধাবল্লভ গোপ, প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী ও বিজন সেন, ডাঃ নারায়ণ রায়, অমলেন্দু বাগচী— এই সাতজন অনশন চালিয়ে যাবেন। সাঁইত্রিশ দিন অনশন করার পর ঐ সাত জন বাদে সকলেই অনশন ভঙ্গ করলেন। আর সাত দিন পর গান্ধীজীর দ্বিতীয় টেলিগ্রাম এল। তাতে "Release" কথাটি ব্যবহার করা হয়েছিল। এর পর ঐ সাত জনও অনশন ভঙ্গ করেন।

শেষ হল আন্দামান সেলুলার জেলের রাজনৈতিক বন্দীদের দ্বিতীয় পর্বের অনশন যুদ্ধ।

অবিলম্বে সরকার বন্দীদের ফেরত পাঠাবার কাজ শুরু করল। ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি আন্দামান-বন্দীদের প্রথম দলটিকে ভারতে পাঠানো (Repatriated) হল। সে দলে ছিলেন— পাঞ্জাব, ইউ. পি., বিহার ও মাদ্রাজের সকলে আর বাংলার প্রায় পঞ্চাশ জন।

এই সময়ে জেলের একজন জমাদারকে প্রহারের অভিযোগে বন্দী প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীকে সুপারের হুকুমে পনেরো ঘা বেত মারা হয়।

বন্দীদের দ্বিতীয় দলটি ১৯৩৭ সালের নভেম্বরে দেশে রওনা হন। আর তৃতীয় এবং শেষ দলটি আন্দামান সেলুলার জেল ছেড়ে দেশে রওনা হন ১৮ জানুয়ারি ১৯৩৮।

এই সময় বন্দীমুক্তির দাবিতে দেশবাসী, বিশেষ করে ছাত্রসমাজ প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখান। কলকাতার রাজপথে সদ্য-নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি সুভাষ-চন্দ্র ছাত্রদের মিছিলে নেতৃত্ব দেন।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের বন্দী যোদ্ধাদের রক্তে, শেষ নিশ্বাসে, অনশনে, কারাগারের দৈনন্দিন যন্ত্রণা, কষ্টে, আন্দামান হয়ে উঠল ভারতের "শহীদ তীর্থ— "মুক্তি তীর্থ"।

আন্দামান-বন্দী যাঁদের শাস্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেল তাঁদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকই ছাড়া পেলেন। আর অনেকেই ভারত-রক্ষা আইনে সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তা বন্দী (Defence of India Act) হলেন। কারণ তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। বাকী সকলেই তাঁদের মেয়াদ খাটতে লাগলেন নিজ নিজ প্রদেশের জেলে। অবশেষে কেউ কেউ ১৯৪৫ সালে, আর বাকী সকলেই ১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি মুক্ত হলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও সুভাষচন্দ্রের মহানিষ্ক্রমণ

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯, ব্রিটিশ যুদ্ধ ঘোষণা করে জার্মানীর বিরুদ্ধে। শুরু হল ভারতে ইংরেজের সতর্কতামূলক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। বহু বিপ্লবী আবার ইংরেজের কারাগারে বিনা বিচারে আটক হয়ে রইলেন।

কলকাতায় হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ আন্দোলনে সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হন ২ জুলাই ১৯৪০ সালে। ২৯ নভেম্বর তিনি বন্দী অবস্থায় প্রায়োপবেশন আরম্ভ করেন, অসুস্থতার জন্য তাঁকে জেল থেকে তাঁদের এলগিন রোডের বাড়িতে অন্তরীণ করে রাখা হল— পুলিস ও আই. বি. পাহারায় ১৯৪০ সালের ৫ ডিসেম্বর। সুভাষচন্দ্র নিজেকে তাঁর ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রাখেন ; কারো সঙ্গে দেখাও করতেন না। এমন-কি তাঁর খাবারও বাইরে রেখে দেওয়া হত। এই অবস্থায় তিনি দিন কাটাতে লাগলেন।

অবশেষে সুভাষচন্দ্র তাঁর কলকাতার বাসভবন থেকে ছদ্মবেশে ভারত ছেড়ে গোপনে বিদেশে চলে যাবার জন্য বেরিয়ে যেতে সক্ষম হন ১৯৪১ সালের ১৭ জানুয়ারি গভীর রাত্রে। সঙ্গে নিলেন ভ্রাতুষ্পুত্র শিশিরকুমার বোসকে, গোমো পর্যন্ত এ ঘটনা কেবলমাত্র কয়েকজন জানতেন। খুবই গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছিল। কয়েক দিন পর এ খবর প্রকাশিত হয়। কিন্তু ততদিনে তিনি ভারত সীমান্ত পার হয়ে যেতে পেরেছেন বিনা বাধায়। এই মহান বিপ্লবী নায়কের মহানিষ্ক্রমণ আর-এক রোমাঞ্চকর বৈপ্লবিক ইতিহাস!

তেতাল্লিশ দিন কাবুলে গোপনে থাকার পর সুভাষচন্দ্র ১৯৪১ সালের ১৮ মার্চ কাবুল ত্যাগ করে ইটালীয় পাসপোর্ট নিয়ে মোটরে করে হিন্দুকুশ পর্বতমালা অতিক্রম করেন এবং সমরখন্দ রুশ সীমান্তে পৌঁছান সেই দিন রাত্রে। ২০ মার্চ ১৯৪১-এ সমরখন্দ থেকে ট্রেনে সুভাষচন্দ্র মস্কো পৌঁছান। সেখানে তাঁর সঙ্গে



আন্দামান সেলুলার জেলে স্মৃতিভারাক্রান্ত নেতাজী

দ্র. পৃ ১২২

জার্মান রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ হয়। ২৮ মার্চ ১৯৪১-এ সুভাষচন্দ্র প্লেনে রোম হয়ে বার্লিনে পৌঁছান।

বার্লিনের আজাদ-হিন্দ রেডিও থেকে সুভাষচন্দ্র প্রথম বক্তৃতা দেন ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে। সারা বিশ্ব সেদিন জানতে পারে যে সুভাষচন্দ্র বার্লিনে আছেন।

১৯৪২ সালের ৯ আগস্ট থেকে ভারতে আগস্ট বিপ্লব শুরু হয়। সারা ভারত ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে উদ্‌বেলিত হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক বন্দীতে ভরে যায় ভারতের জেলগুলি।

সুভাষচন্দ্র জার্মানীতে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করতে থাকেন। ইতিমধ্যে জাপানে অবস্থিত বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর আহ্বানে ও অন্যান্য প্রতিকূল কারণে তিনি জার্মানী থেকে জাপানে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। জার্মান গবর্নমেণ্টের ব্যবস্থায় তিনি আবিদ হাসানকে সঙ্গী করে একটি সাবমেরিনে জার্মানীর কিয়েল থেকে জাপানের উদ্দেশে যাত্রা করেন ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩-এ। মাদাগাস্কারের কাছে পৌঁছান ২৮ এপ্রিল ১৯৪৩। পূর্বনির্ধারিত নিখুঁত পরিকল্পনা মতো সেখানে তাঁকে নেওয়ার জন্য একটি জাপানী ডুবোজাহাজ অপেক্ষা করছিল। তাঁদের তুলে নিয়ে এই জাপানী ডুবোজাহাজটি ভারত মহাসাগর হয়ে পেনাং-এ পৌঁছায় ২ জুন ১৯৪৩। শেষ হয় মৃত্যু হাতে করে এই দুঃসাহসিক বিপজ্জনক যাত্রা! সেখান থেকে সুভাষচন্দ্র বিমানে টোকিও যান ১৩ জুন ১৯৪৩।

জাপানী দখলে আন্দামান

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রতিকূল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আন্দামানে যে-সমস্ত ইংরেজ ছিল তাদের ধীরে ধীরে মূল ভূখণ্ডে সরিয়ে নেওয়া হয়। অল্প-সংখ্যক ইংরেজ ও ক্ষুদ্র এক শাসক চক্র পড়ে রইল সেখানে। রইলেন— চীফ কমিশনারের সেক্রেটারি মিঃ বার্ড, হার্বার মাস্টার— কমাণ্ডার আর. এন. ওয়াটার্স, ডেপুটি কমিশনার রেডি, ট্রেজারি অফিসার অতুল চট্টোপাধ্যায়।

২২ মার্চ ১৯৪২ আন্দামান সমুদ্রে এল তিনটি জাপানী যুদ্ধ জাহাজ। ২৩ মার্চ ১৯৪২-এ জাপানীরা আন্দামানে নামল— জাপানী সৈন্যে ছেয়ে গেল। ইংরেজ সামরিক পুলিস বিনাযুদ্ধে হাতিয়ার সমর্পণ করল। আন্দামান-শাসকরা বন্দী হলেন। সেলুলার জেলে ঢুকে জাপানীরা দরজা খুলে দিল। কয়েদীরা মুক্ত

হলেন। কোনো রাজনৈতিক বন্দী সেখানে ছিলেন না তখন। দশ-বারো ঘণ্টার মধ্যে বিনা অস্ত্রে আন্দামানে জাপানী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় ২৫ হাজার জাপানী সৈন্য আন্দামানে ছড়িয়ে পড়ে।

আন্দামান প্রশাসনে স্থানীয় ব্যক্তিদের সাহায্য নেবার জন্য জাপানীরা পোর্ট ব্লেয়ার ক্লাবে এক সভার আয়োজন করে। সভাস্থ সকলে একমত হয়ে স্থানীয় সুপরিচিত নাগরিক গোপালকৃষ্ণকে কমিশনার ও রামকৃষ্ণকে সহকারী কমিশনার রূপে নিযুক্ত করেন। পুলিস সুপার হলেন— নারায়ণ রাও। সহকারী পুলিস সুপার— আত্তর সিং। নৌ-গুপ্তচরের প্রধান হলেন বাগচি। মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হলেন— দেওয়ান সিং, সহ-সভাপতি— সুরেন্দ্রনাথ নাগ, সরবরাহ অধিকর্তা— দুর্গা প্রসাদ, সহকারী কমিশনারের হেডক্লার্ক— শ্রীরত্নম, তহশীলদার— এল. সি. সাংকাওয়া ও আব্দুল আহম্মদ, রেজিস্ট্রার অব কোর্টস-এর পদ পেলেন ব্রিজলাল। (দ্র. স্বদেশরঞ্জন চক্রবর্তী, 'গতি')

নাগরিক শাসন প্রকৃতপক্ষে শুধু মাত্র পোর্ট ব্লেয়ারেই হয়। বিশাল আন্দামানে তার কোনো কাজকর্ম হয় নি। জাপানী আমলে আন্দামানে গুপ্তচরবৃত্তি সংক্রান্ত মামলা সাজানো হয় তিনটি। প্রথম মামলায় বহুলোককে গুলি করে হত্যা করা হয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মামলায় অনেক লোক গ্রেপ্তার হন ; অত্যাচারে অনেকের জীবনাবসান ঘটে। সেলুলার জেলের এক অংশে এই-সব বন্দীদের আটক রেখে অমানুষিক অত্যাচার করা হয়।

অতঃপর নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আন্দামানে পদার্পণের পরবর্তী অধ্যায়ে স্বাভাবিক ভাবে নৈরাজ্যের অবসান ও সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন।

আন্দামানে নেতাজী

১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় অস্থায়ী আজাদ-হিন্দ সরকার। আর ৭ নভেম্বর ১৯৪৩-এ আন্দামান আজাদ-হিন্দ সরকারের ভূখণ্ড বলে স্বীকৃত হল।

নেতাজী আন্দামান পরিদর্শনে এলেন ২৯ ডিসেম্বর ১৯৪৩। জাপানী সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়কের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হল। ১৯৪৩-এর ৩০ ডিসেম্বর গেলেন আন্দামান সেলুলার জেল পরিদর্শনে। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের অনেক দুঃখকষ্টে এখানে বন্দী জীবনযাপন, শহীদের শেষ নিশ্বাসে ও সংগ্রামীদের

অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বন্দী অবস্থাতেও যুদ্ধ করার মহান স্মৃতি-ভারাক্রান্ত মনে নেতাজী তাকিয়ে রইলেন— সেলুলার জেলের দিকে।

৩০ ডিসেম্বর ১৯৪৩ সালে পোর্টব্লেয়ারের জিমখানা ময়দানে এক বিরাট জনসভায় নেতাজী নব্বই মিনিট ভাষণ দেন ও স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করেন। "রস" দ্বীপে আন্দামানের চীফ কমিশনারের বাংলোতেও স্বাধীন ভারতের পতাকা উড়তে থাকে। নেতাজী আন্দামানের "শহীদ দ্বীপ" ও নিকোবরের "স্বরাজ দ্বীপ" নামকরণ করেন।—

১৯৪৪ সালের গোড়ার দিকে এক সাংবাদিক সম্মেলনে নেতাজী আন্দামান সম্বন্ধে বলেন— **"By the acquisition of this territory, the provisional Government has now become a national entity in fact as well as in name. The liberation of the Andamans has symbolic significance because the Andamans was always under the British as a prison for political prisoners... like the Bastille in Paris, which, was liberated first in the French Revolution, setting free political prisoners ; the Andamans where our patriots suffered is the first to be liberated in India's fight for Independence. Part by part, Indian territory will be liberated but it is always the first plot of land that holds the most significance."**

—দ্রষ্টব্য K. C. Ghosh, *The Roll of Honour,* p. 596 ; আন্দামান বন্দী মৈত্রী-চক্র প্রকাশিত *Muktitirtha Andaman* স্মারক পত্রিকা, ১৯৭৬।

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪-এ আনুষ্ঠানিক ভাবে আজাদ-হিন্দ সরকারের হাতে আন্দামান-নিকোবরের শাসনভার আসে। চীফ কমিশনার হন— কর্নেল লোগনাথন, পুলিস প্রধান— লেঃ ইকবাল। আর এলেন মেজর আলভি, লেঃ সুচ্চা সিং ও শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার।

আবার ব্রিটিশ অধিকারে আন্দামান ও স্বাধীনতা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গতি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং মিত্র শক্তি জয়লাভ করতে থাকে। আন্দামানে জাপানীরা ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে ১৯৪৫ সালের অক্টোবর ১০টা ১৫ মিনিটে। জাপানী বাহিনীর পক্ষ থেকে অ্যাডমিরাল তেইসো হোরা (Admiral Teisso Horra) ও মেজর জেনারেল তামেনোরি (Major General Tamenori), ইংরেজ বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জে. এ. সলোমন (Brigadier J. A. Soloman)-এর নিকট অস্ত্র সমর্পণ করে। ১৮,৮৪৬ জন জাপানী সৈন্য আন্দামানে ইংরেজ বাহিনীর হাতে বন্দী হয়।

এই পুনর্দখলের পর আন্দামান ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর শাসনে থাকে। অবশেষে ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬-এ আন্দামানে বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। মিঃ এন. কে. প্যাটারসন (N. K. Paterson) চীফ কমিশনার হন।

এর আগেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে। এসে গেল ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে উড়তে থাকল স্বাধীনভারতের পতাকা, শতশত শহীদের স্মৃতি-বিজড়িত, শত শত স্বাধীনতা-সংগ্রামীর রক্তে রঞ্জিত, মুক্তিতীর্থ তথা ভারত-তীর্থ আন্দামানে।

আন্দামানে বন্দী স্বাধীনতা-সংগ্রামী : দ্বিতীয় পর্যায়

১৯৩২-৩৮

পাঞ্জাব

১ হাজরা সিং
২ খুসীরাম মেটা

দিল্লী

৩ ধন্বন্তরী
৪ হরবন্ধু সমাজদার

উত্তর প্রদেশ

৫ বেচুলাল
৬ বটুকেশ্বর দত্ত
৭ বিজয়কুমার সিং
৮ গয়াপ্রসাদ
৯ জয়দেব কাপুর
১০ কুন্দনলাল গুপ্তা
১১ মহাবীর সিং
১২ প্রেম প্রকাশ
১৩ রামসিং ডোগ্‌রা
১৪ শম্ভুনাথ আজাদ
১৫ সিউ বর্মা

বিহার

১৬ বিশ্বনাথ মাথুর
১৭ চন্দ্রিকা সিং
১৮ গৌরীশঙ্কর দুবে
১৯ গুলাবসিং গুপ্তা
২০ যোগেন্দ্র স্কুল
২১ কমলনাথ তেওয়ারী
২২ কান্‌হাইয়া লাল মিশির
২৩ কেদারমণি স্কুল
২৪ কেশো প্রসাদ
২৫ মহাবীর মিশির
২৬ মলয় ব্রহ্মচারী
২৭ মোহিত অধিকারী
২৮ নান্‌কু সিং
২৯ প্রমথনাথ ঘোষ
৩০ রামপ্রতাপ সিং
৩১ শ্যামকৃষ্ণ আগরওয়াল
৩২ শ্যামাচরণ ভারাতাওয়ার
৩৩ শ্যামদেব নারায়ণ ওরফে রাম সিং
৩৪ সুরজনাথ চোরী

বাংলা

৩৫ অবনীরঞ্জন ঘোষ
৩৬ অবনী মুখার্জি
৩৭ আব্দুল কাদের চৌধুরী

৩৮ অভয়পদ মুখার্জি
৩৯ অচ্যুত ঘটক
৪০ অধীররঞ্জন নাগ
৪১ অজয় সিন্‌হা
৪২ অজিতকুমার মিত্র
৪৩ অমলেন্দু বাগচি
৪৪ অমর মুখার্জি
৪৫ অমর সূত্রধর
৪৬ অমৃতেন্দু মুখার্জি
৪৭ অমূল্যকুমার মিত্র
৪৮ অমূল্য রায়
৪৯ অমূল্যচন্দ্র সেনগুপ্ত
৫০ অনন্ত ভট্টাচার্য
৫১ অনন্ত (ভোলা)
৫২ আনন্দপ্রসাদ গুপ্ত
৫৩ অনন্তকুমার চক্রবর্তী
৫৪ অনন্ত দে
৫৫ অনন্ত মুখার্জি
৫৬ অনন্তলাল সিং
৫৭ অনাথবন্ধু সাহা
৫৮ অনিল মুখার্জি
৫৯ অন্নদাচরণ পাল
৬০ অনুকূল চ্যাটার্জি
৬১ অরবিন্দ দে
৬২ অতুলচন্দ্র দত্ত
৬৩ বঙ্গেশ্বর রায়
৬৪ বঙ্কিম চক্রবর্তী
৬৫ বারীন্দ্রকুমার ঘোষ
৬৬ বিনয়কুমার বসু
৬৭ বিনয়ভূষণ রায়
৬৮ বিনয় তরফদার
৬৯ ভবরঞ্জন পুততুণ্ডি
৭০ ভবতোষ কর্মকার
৭১ ভবেশ তালুকদার
৭২ ভগবানচন্দ্র বিশ্বাস
৭৩ ভারত শর্মারায়
৭৪ ভোলানাথ রায়
৭৫ ভুবনমোহন চন্দ
৭৬ ভূপালচন্দ্র বসু
৭৭ ভূপালচন্দ্র পাণ্ডা
৭৮ ভূপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য
৭৯ ভূপেশচন্দ্র ব্যানার্জি
৮০ ভূপেশচন্দ্র গুহ
৮১ ভূপেশচন্দ্র সাহা
৮২ বিভূতিভূষণ ব্যানার্জি
৮৩ বিধুভূষণ গুহ বিশ্বাস
৮৪ বিধুভূষণ সেন
৮৫ বিদ্যাধর সাহা
৮৬ বিজনকুমার সেন
৮৭ বিজয়কুমার ঘোষ
৮৮ বিজয়কৃষ্ণ ব্যানার্জি
৮৯ বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯০ বিমল ভৌমিক
৯১ বিমল দাসগুপ্ত
৯২ বিমলকুমার সরকার
৯৩ বিমলেন্দু চক্রবর্তী
৯৪ বিরাজ দেব
৯৫ বীরেন চৌধুরী

৯৬ বীরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী
৯৭ বীরেন রায়
৯৮ বীরুভূষণ চক্রবর্তী
৯৯ চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য
১০০ চিত্ত বিশ্বাস
১০১ চিত্তরঞ্জন দত্ত
১০২ চিন্তাহরণ দাস
১০৩ চুনীলাল দেব
১০৪ দেবকুমার দাস
১০৫ দেবেন্দ্র তালুকদার
১০৬ ধরণী বণিক
১০৭ ধরণী বিশ্বাস
১০৮ ধরণী চক্রবর্তী
১০৯ ধরণীধর রায়
১১০ ধীরেন্দ্রকুমার বিশ্বাস
১১১ ধীরেন চৌধুরী
১১২ ধীরেন দত্ত
১১৩ ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
১১৪ ধীরেন্দ্র চক্রবর্তী (কুমিল্লা)
১১৫ ধীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী (ময়মনসিংহ)
১১৬ ধীরেন্দ্রচন্দ্র দাস
১১৭ ধ্রুবেশ চ্যাটার্জি
১১৮ দীনেশ বণিক
১১৯ দীনেশচন্দ্র দাস (ময়মনসিংহ)
১২০ দীনেশচন্দ্র দাস ওরফে
টেগরা (দিনাজপুর)
১২১ দীনেশ দাসগুপ্ত
১২২ দীনেশ ধর
১২৩ দীনেশচন্দ্র সাহা
১২৪ দুর্গাশঙ্কর দাস
১২৫ দীনেন্দ্রনাথ লাহা
১২৬ দ্বিজেন্দ্রনাথ তলাপাত্র
১২৭ ফকিরচন্দ্র সেনগুপ্ত
১২৮ গঙ্গাচন্দ্র দে
১২৯ গণেশচন্দ্র ঘোষ
১৩০ গোবিন্দ কর
১৩১ গোবিন্দপ্রসাদ বেরা
১৩২ গমিরুদ্দিন সরকার
১৩৩ গোপাল আচার্য
১৩৪ গোপালচন্দ্র দেব
১৩৫ গোপীমোহন সাহা
১৩৬ গৌরগোপাল দত্ত
১৩৭ হারানচন্দ্র কোঙার
১৩৮ হরেকৃষ্ণ কোঙার
১৩৯ হরেন্দ্রচন্দ্র দাস (মণ্ডল)
১৪০ হরিবল চক্রবর্তী
১৪১ হরিদাস সাহা
১৪২ হরিহর দত্ত
১৪৩ হরিপদ ব্যানার্জি
১৪৪ হরিপদ বসু
১৪৫ হরিপদ ভট্টাচার্য
১৪৬ হরিপদ চৌধুরী
১৪৭ হরিপদ দে
১৪৮ হেমচন্দ্র বক্সী
১৪৯ হেমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
১৫০ হেমচন্দ্র দত্ত
১৫১ হিমাংশু ভৌমিক
১৫২ হীরামোহন চ্যাটার্জি

১৫৩ হৃদয় দাস (ফরিদপুর)
১৫৪ হৃদয় দাস (চট্টগ্রাম)
১৫৫ হৃষীকেশ বসু
১৫৬ হৃষীকেশ ভট্টাচার্য
১৫৭ হৃষীকেশ দত্ত
১৫৮ ইন্দুভূষণ দাস
১৫৯ জগদানন্দ মুখার্জি
১৬০ জগৎ বসু
১৬১ জগৎ রায়
১৬২ যামিনীকুমার রায়
১৬৩ জ্ঞানেশ্বর দাস
১৬৪ জানকীনাথ দাস
১৬৫ যতীন্দ্র দে
১৬৬ জয়েশচন্দ্র ভট্টাচার্য
১৬৭ জীবন গুহঠাকুরতা
১৬৮ জীবন মোল্লা
১৬৯ জীবেন্দ্রকুমার দাস
১৭০ জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
১৭১ জিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত
১৭২ জিতেন্দ্র মজুমদার
১৭৩ জ্ঞানদাগোবিন্দ গুপ্ত
১৭৪ যোগেন্দ্র চক্রবর্তী
১৭৫ যোগেন্দ্রমোহন গুহ
১৭৬ যোগেশচন্দ্র দাস
১৭৭ জ্যোতির্ময় রায়
১৭৮ জ্যোতিশ মজুমদার
১৭৯ কালাচাঁদ চক্রবর্তী
১৮০ কালীমোহন ব্যানার্জি
১৮১ কালীপদ ভট্টাচার্য
১৮২ কালীকিঙ্কর দে
১৮৩ কালীপদ চক্রবর্তী
১৮৪ কালীপদ রায়
১৮৫ কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী
১৮৬ কামাখ্যাচরণ ঘোষ
১৮৭ কমল শ্রীমানী
১৮৮ কামিনী দে
১৮৯ কার্তিক (পরেশ)চন্দ্র দে
১৯০ কার্তিক সরকার
১৯১ কৌমুদীকান্ত ভট্টাচার্য
১৯২ কেশবলাল চ্যাটার্জি
১৯৩ কেশব সমাজদার
১৯৪ খোকা (সুধীরকুমার) রায়
১৯৫ কৃপানাথ দে
১৯৬ কৃষ্ণ বিশ্বাস
১৯৭ কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী
১৯৮ ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী
১৯৯ ক্ষিতীশচন্দ্র রায়
২০০ কুমুদ মুখার্জি
২০১ কুমুদিনী ঘোষ
২০২ লোকনাথ বল
২০৩ ললিত চক্রবর্তী
২০৪ ললিতচন্দ্র রাহা
২০৫ ললিত সিংহ
২০৬ লালমোহন সেন
২০৭ মদন রায়চৌধুরী
২০৮ মধু ব্যানার্জি
২০৯ মধুসূদন দত্ত
২১০ মহম্মদ ইব্রাহিম ওরফে তারাপদ

২১১ মহেন্দ্র ভৌমিক
২১২ মহেশ বরুয়া
২১৩ মাখন দে
২১৪ মণিলাল দত্ত
২১৫ মণি (রমণী) গাঙ্গুলী
২১৬ মণীন্দ্র দে
২১৭ মণীন্দ্রচন্দ্র সেন
২১৮ মন্মথ দত্ত
২১৯ মনমোহন সাহা
২২০ মনোরঞ্জন ব্যানার্জি
২২১ মনোরঞ্জন চৌধুরী
২২২ মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা
২২৩ মথুরানাথ দত্ত
২২৪ মোহনলাল নাগ
২২৫ মোহনকিশোর নমদাস
২২৬ মোহিতমোহন মৈত্র
২২৭ মোক্ষদারঞ্জন চক্রবর্তী
২২৮ মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জি
২২৯ মুকুলরঞ্জন সেন
২৩০ মুরারি গোস্বামী
২৩১ নগেন দাসগুপ্ত
২৩২ নগেন্দ্র দেব
২৩৩ নগেন্দ্রনাথ রায়
২৩৪ নগেন্দ্রনাথ গুহ
২৩৫ নগেন মোদক
২৩৬ নগেন্দ্রমোহন মুস্তাফী
২৩৭ নলিনী দাস
২৩৮ নলিনী সেনগুপ্ত
২৩৯ নন্দলাল দাসগুপ্ত
২৪০ নন্দদুলাল সিং
২৪১ ননীগোপাল দাস
২৪২ ননী দাসগুপ্ত
২৪৩ নারায়ণচন্দ্র রায়
২৪৪ নরেন্দ্রনাথ দাস
২৪৫ নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
২৪৬ নরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
২৪৭ নেপাল সরকার
২৪৮ নিবারণ চক্রবর্তী
২৪৯ নিরঞ্জন সেন
২৫০ নীরেন্দ্র বরুয়া
২৫১ নির্মলেন্দু গুহ
২৫২ নিশাকান্ত রায়চৌধুরী
২৫৩ নিত্যরঞ্জন চৌধুরী
২৫৪ নৃপেন্দ্র দত্তরায়
২৫৫ পরেশচন্দ্র চৌধুরী
২৫৬ পরেশচন্দ্র গুহ
২৫৭ পরিমলচন্দ্র ঘোষ
২৫৮ ফণীভূষণ দাসগুপ্ত
২৫৯ ফণি নন্দী
২৬০ প্রবীরকুমার গোস্বামী
২৬১ প্রফুল্লকুমার বিশ্বাস
২৬২ প্রফুল্ল ভৌমিক
২৬৩ প্রফুল্লকুমার মজুমদার
২৬৪ প্রফুল্লনারায়ণ সান্যাল
২৬৫ প্রকাশচন্দ্র শেঠ
২৬৬ প্রাণগোপাল মুখার্জি
২৬৭ প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী
২৬৮ প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী

২৬৯ প্রশান্তকুমার সেনগুপ্ত
২৭০ প্রভাসকুমার রায়
২৭১ প্রিয়দারঞ্জন চক্রবর্তী
২৭২ প্রবোধকুমার রায়
২৭৩ প্রদ্যোৎ রায়চৌধুরী
২৭৪ প্রমোদরঞ্জন বসু
২৭৫ প্রভাকর ঝিরুণী
২৭৬ প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্তী
২৭৭ প্রভাতকুমার ঘোষ
২৭৮ প্রভাত মিত্র
২৭৯ পূর্ণ গোস্বামী
২৮০ পূর্ণেন্দুশেখর গুহ
২৮১ রবীন্দ্র ব্যানার্জি
২৮২ রবীন্দ্রনাথ গুহরায়
২৮৩ রবীন্দ্রনাথ নিয়োগী
২৮৪ রাধাবল্লভ গোপ
২৮৫ রাধিকা দে (দাস)
২৮৬ রজনীকান্ত সরকার
২৮৭ রজতভূষণ দত্ত
২৮৮ রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
২৮৯ রাজমোহন করঞ্জাই
২৯০ রাখালচন্দ্র দে
২৯১ রাখালদাস মল্লিক
২৯২ রামচন্দ্র দাস
২৯৩ রমেন্দ্রনাথ সমাজদার
২৯৪ রমেশচন্দ্র রায় (দাস)
২৯৫ রমেশ চ্যাটার্জি
২৯৬ রামকৃষ্ণ (মণ্ডল) সরকার
২৯৭ রণধীর দাসগুপ্ত
২৯৮ শচীন্দ্রচন্দ্র হোম
২৯৯ শচীন্দ্রলাল করগুপ্ত
৩০০ শচীন্দ্রনাথ মিত্র
৩০১ শচীন্দ্র নন্দী
৩০২ শৈলেন্দ্র দত্ত
৩০৩ শৈলেশচন্দ্র রায়
৩০৪ সমরেন্দ্র ঘোষ
৩০৫ সনাতন রায়
৩০৬ শান্তিপদ চক্রবর্তী
৩০৭ শান্তিগোপাল সেন
৩০৮ সন্তোষকুমার দত্ত
৩০৯ শারদাপ্রসন্ন বসু
৩১০ শরদিন্দু ভট্টাচার্য
৩১১ শরৎধূপী দাস
৩১২ সরোজকুমার বসু
৩১৩ সরোজ রায়
৩১৪ সরসীমোহন মৈত্র
৩১৫ শশীমোহন ভট্টাচার্য
৩১৬ সতীশচন্দ্র বসু
৩১৭ সতীশচন্দ্র পাকড়াশী
৩১৮ সত্যব্রত চক্রবর্তী
৩১৯ সত্যরঞ্জন ঘোষ
৩২০ সত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩২১ সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার
৩২২ সিরাজুল হক
৩২৩ সহায়রাম দাস
৩২৪ শচীন চক্রবর্তী
৩২৫ সীতাংশু দত্তরায়
৩২৬

৩২৭ সুবলচন্দ্র রায়
৩২৮ সুবোধ চৌধুরী
৩২৯ সুবোধ রায়
৩৩০ সুধাংশু দাসগুপ্ত (বাবু)
৩৩১ সুধাংশু দাসগুপ্ত (মানু)
৩৩২ সুধাংশু দাসগুপ্ত (বাঁকুড়া)
৩৩৩ সুধাংশু লাহিড়ী
৩৩৪ সুধাংশু সেনগুপ্ত
৩৩৫ সুখেন্দুচন্দ্র দাস
৩৩৬ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
৩৩৭ সুধীন্দ্র রায়
৩৩৮ সুধীর ভট্টাচার্য
৩৩৯ সুধীকুমার রায়
৩৪০ সুধীর চৌধুরী
৩৪১ সুধীরকুমার সমাজদার
৩৪২ সুখেন্দুবিকাশ দাসগুপ্ত
৩৪৩ সুকুমার ঘোষ
৩৪৪ সুকুমার সেনগুপ্ত
৩৪৫ সুনীলকুমার ভট্টাচার্য
৩৪৬ সুনির্মল সেন
৩৪৭ সুরেন আচার্য
৩৪৮ সুরেন বণিক
৩৪৯ সুরেন্দ্রনাথ দত্ত
৩৫০ সুরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত
৩৫১ সুরেন্দ্র ধরচৌধুরী
৩৫২ সুরেন্দ্রমোহন কর রায়
৩৫৩ সুরেন সরখেল
৩৫৪ সুরেশচন্দ্র দাস
৩৫৫ সুশীলকুমার ব্যানার্জি
৩৫৬ সুশীলকুমার চক্রবর্তী
৩৫৭ সুশীলকুমার গুপ্ত
৩৫৮ সুশীলকুমার দে
৩৫৯ উমাশঙ্কর কোঙার
৩৬০ উমেশ (ক্ষুদিরাম) ভট্টাচার্য
৩৬১ উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল
৩৬২ উপেন সাহা
৩৬৩ উষারঞ্জন দে

আসাম

৩৬৪ বিনয় নস্কর
৩৬৫ গোপেন রায়
৩৬৬ গৌরাঙ্গমোহন দাস
৩৬৭ মতিলাল রায়
৩৬৮ সত্যেন্দ্র রায়

মাদ্রাজ

৩৬৯ প্রতীবাদী ভয়ঙ্কর ভেঙ্কটাচার্য
৩৭০ টি. সচ্চিদানন্দ শিবম্

ফরাসী বিপ্লবে বাস্তিল দুর্গ পতনের অব্যবহিত ছ'দিন পর (১৬ জুলাই ১৭৮৯) নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বাস্তিল দুর্গ ধ্বংস করে ধূল্যবলুণ্ঠিত করতে হবে। এবং ধ্বংসস্তূপের পাথর দিয়ে অতিক্ষুদ্র প্রতিকৃতি (মডেল) তৈরি করে প্রত্যেক পৌরসভায় পাঠানো হোক। কিন্তু ব্রিটিশ-ভারতের বাস্তিল— 'আন্দামান সেলুলার জেল' ? তার কী গতি হবে ? স্বাধীন ভারতে অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে তাকেও নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু আন্দামান 'সেলুলার জেল' জাতীয় স্মৃতিসৌধের অন্তর্ভূত, নির্বাসিত প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দীদের প্রবল প্রতিরোধে তা নিশ্চিহ্ন করণের গুপ্ত প্রচেষ্টা স্তব্ধ হয়ে যায়। সপ্তবাহুযুক্ত 'সেলুলার জেল'-এর তিনটি বাহু লুপ্ত হওয়ার পর বর্তমানে— একটিতে হাসপাতাল, অপরটিতে সরকারী কর্মচারীদের আবাসস্থল, তৃতীয়টিতে স্থানীয় কয়েদখানা এবং চতুর্থটি উন্মুক্ত আছে দর্শনার্থীদের জন্য। নীচের তলায় 'সেলুলার জেল'-এর সুদীর্ঘ ইতিহাসের কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও ব্যক্তিত্বের প্রতিকৃতি (মডেল) সন্নিবেশিত আছে— যা অবশ্যই দর্শনার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এই-সব দর্শনে অতীতের দুঃখবহ স্মৃতি স্মরণ ক'রে বেদনায় ঘৃণায় শিহরণে মন স্বভাবতই ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

অর্ধশতাব্দীব্যাপী এক অজ্ঞাত তথ্য

১৯৩২ সালে বাংলার গভর্নর স্যার স্ট্যান্‌লি জ্যাক্‌সনকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে হত্যা করার চেষ্টার অপরাধে তেজস্বিনী বিপ্লবী বীণা দাস কারাদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত হন। সরকারের এক ভারতীয় সভাসদ বীণা দাসের পরিবারকে অতি সঙ্গোপনে খবর পৌঁছে দেন যে জঘন্য আন্দামান সেলুলার জেলে যাদের নির্বাসিত করা হবে তাদের মধ্যে বীণা দাসের নামও তালিকাভুক্ত। বীণা দাসের ঋষিতুল্য পিতা বেণীমাধব দাস (যাঁর সম্বন্ধে আত্মজীবনীতে উল্লেখ করতে গিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলেছেন— "শিক্ষকদের মধ্যে একজনই মাত্র আমার মনে স্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন। তিনি হলেন আমাদের প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাস।... মনে মনে ভাবতাম মানুষের মত মানুষ হতে হলে ওঁর আদর্শেই নিজেকে গড়তে হবে।" —'ভারতপথিক'— নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আত্মজীবনী, পৃ. ৩৭) স্বনামধন্য চিন্তাবিদ ও গ্রন্থকার শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠালেন এই অনুরোধ করে—যেন কর্তৃপক্ষের কারো সঙ্গে যোগাযোগ করে এই অপচেষ্টা রোধ করা সম্ভব হয়। বীণা দাসের জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী কল্যাণী ভট্টাচার্য (দাস)-কে সঙ্গে নিয়ে বিনয়েন্দ্রনাথ কবিগুরুর 'উত্তরায়ণ' বাসভবনে সাক্ষাৎ করে যখন আবেদন রাখলেন স্বভাবতই তাঁকে ভীষণ বিচলিত দেখা গেল। ঘণ্টাখানেকের ব্যবধানে গুরুদেব দুটো টেলিগ্রাম লিখে দিলেন। কলকাতায় এসে বিশ্বভারতী অফিস থেকে তিনি উক্ত টেলিগ্রাম দুটি প্রেরণের ব্যবস্থা করলেন।

১৩. ১০. ১৯৩২ তারিখে প্রেরিত টেলিগ্রাম দুটি :

(i) *To C. F. Andrews :*

"Please exert utmost influence in trying immediately to save Miss Bina Das from brutal punishment of transportation to Andamans. Andaman Commission definitely reported

against deportment of women prisoners. Have cabled personally to Lady Jackson.

(*ii*) *To Lady Jackson :*

"May I request Your Excellency to immediately intervene and save Miss Bina Das from being transported to the demoralising and brutal atmosphere of the Andamans. Your generous help will win enduring gratitude and admiration of our countrymen."

এই টেলিগ্রামের অভীপ্সিত ফল পাওয়া গেল। লেডি জ্যাকসন তাঁর পল্লীর বাসস্থান থেকে দ্রুত ছুটে গেলেন লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসে এবং এই দুষ্ট প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করলেন।

—দ্রষ্টব্য : Benoyendranath Banerjea, *MEN AND EVENTS*, pp. 13, 14, 38.

অতি সম্প্রতি বীণা দাস (ভৌমিক) সুদূর হিমালয়ের পাদদেশে নিভৃতে নীরবে পরলোকগমন করেন।

উপসংহার

সর্বশেষে নির্বাসিত অবস্থায় যাঁরা স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি দিলেন, 'যেখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হয় বিজয়ী প্রাণের জয়বার্তা'— যাঁদের অশেষ ক্লেশ ও অত্যাচার সহনের ফল এই স্বাধীনতা— তাঁদের উদ্দেশে রেখে যাই 'ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত জীবনের প্রণতি'। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মদিন উপলক্ষে রাজবন্দীদের প্রেরিত অভিনন্দনের উত্তরে তাঁর আশীর্বচন দিয়ে উপসংহার করি যা সর্বকালের সর্বদেশের বিপ্লবীদের প্রেরণাস্বরূপ :

বক্সাদুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি

নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সংগীত না মানিল বন্ধন।
ফোয়ারার রন্ধ্র হতে
উন্মুখর ঊর্ধ্বস্রোতে
বন্দীবারি উচ্চারিল আলোকের কি অভিনন্দন।

মৃত্তিকার ভিত্তি ভেদি অঙ্কুর আকাশে দিল আনি
স্বসমুথ শক্তিবলে গভীর মুক্তির মন্ত্রবাণী।
মহাক্ষণে রুদ্রাণীর
কী বর লভিল বীর,
মৃত্যু দিয়ে বিরচিল অমর্ত্য নরের রাজধানী।

'অমৃতের পুত্র মোরা'— কাহারা শুনাল বিশ্বময়।
আত্মবিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়।
ভৈরবের আনন্দরে
দুঃখেতে জিনিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮
দার্জিলিং

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর